# বিশ্বসাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ কিশোর-গল্প সংগ্রহ

অনুবাদক- অনিন্দ্যেন্দু চক্রবর্তী

It isn't cover

banglabooks.in

# বিশ্বসাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ কিশোর-গল্প সংগ্রহ

অনুবাদক- অনিলেন্দু চক্রবর্তী

If you want to download
a lot of ebook,
click the below link
Get More
Free
eBook
VISIT
WEBSITE
www.banglabooks.in
Click here

প্রথম প্রকাশ :
কলিকাতা বইমেলা, ১৯৪৭

প্রকাশক :
সত্যেন্দু চ্যাটার্জী

প্রচ্ছদপট :
খালেদ চৌধুরী

মুদ্রক :
মুকুল চক্রবর্তী
দি প্রিণ্টকো
৭।৮ নারিকেলডাঙা মেন রোড
কলিকাতা-১১

বাঁধিয়েছেন :
ফেন্সী বাইণ্ডার্স
১৪৭, কেশব চন্দ্র সেন ষ্ট্রীট্
কলিকাতা-৭০০০০৯

## উৎসর্গ-পত্র

স্থিতধী-গ্রন্থকার ও সুচরিত-অধ্যাপক
শ্রী প্রণবরঞ্জন ঘোষ ডি. লিট.
ভ্রাতৃপ্রতিমেষু

একদিন আমরা তো সকলেই কিশোর কি কিশোরী ছিলাম—
বাস্তবের ঘের আর দিগন্তপারের মায়া পেত ঠিক-দাম ;
বয়ে যেত তরঙ্গিত স্রোত মাঝখানে,
বলে যেত কত কথা বহিরঙ্গ কলরোলে অন্তরঙ্গ গানে ;
এপার ওপার তার
ক্রম-অগ্রসর এক দিব্যসেতু মুক্ত কভু কভু রুদ্ধদ্বার।
সবুজের যাত্রী সব : একহাতে অশ্রুহাসি গুচ্ছগুচ্ছ ফুল
কিছু-বা কণ্টক কিছু ভুল,
অন্যহাতে অশ্রুহাসি উচ্চশিখা ব্যাকুল-সুন্দর—
সে আলোকে মুছে যায় ভেদ আত্ম-পর,
উদ্ভাসিত হয় কত অজানা জীবন
অসীম গগন আর অতল গহন।
বিচিত্র ভাষায় সেথা এ বিশ্বের আত্মীয় আহ্বান
টানে প্রাণে প্রাণ—
কত অনুভব আর কত না চেতনা
কত না উন্মুখ প্রশ্ন যন্ত্রণা বেদনা
রৌদ্র ছায়া মেঘমায়া ঝঞ্ঝাঘাত নীরব-বর্ষণ
অদেখা জীবন সাথে মিলায় জীবন।
সাহিত্যের তন্ময় সভায় এক হয়ে যায় দেশান্তর,
সহৃদয় ভাষান্তরে ঘুচে যায় কে-বা আত্ম-পর ;
সেইখানে উত্তর-তৃষিত যত জীবন-জিজ্ঞাসা
শ্রদ্ধাপ্রীতি স্নেহ-ভালোবাসা
মেলি ধরে জীবনের অন্তর-জীবন—
কৈশোরই তো হয়ে ওঠে অনন্ত যৌবন।

যৌবন-সীমান্তে আজ এলে, ভাই, নামি',
প্রৌঢ়জন আমি—
দুই মন তবু পাশাপাশি
কৈশোরসাহিত্য-লোকে কিছুক্ষণ দাঁড়াক না আসি'।

## লেখক-অনুবাদকের আর কয়েকটি কিশোর-গ্রন্থ

আকাশ যেখানে মাটির কাছে

বাংলা সাহিত্যে নতুন জাতের কিশোর-উপন্যাস

শেক্সপিয়ার কিশোর-ওমনিবাস

প্রথম খণ্ড : ট্র্যাজিডি : মূলনাটকের অনুসরণে নাট্যধর্মী গল্পরূপ

বিশ্বসাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ কিশোর-গল্প সংগ্রহ

দ্বিতীয় খণ্ড : প্রকাশের প্রতীক্ষায়

সাহিত্য-শ্রী

অলঙ্কার ছন্দ ও বাংলাসাহিত্যের ইতিহাস

পূর্ণাঙ্গ আলোচনায় সহজবোধ্য : সম্মানিক স্নাতক ছাত্রছাত্রীদের জন্য অনন্য গ্রন্থ

## বারোজন লেখক : বত্রিশটি গল্প


উৎসর্গ-পত্র

গল্প-সংগ্রহের ভূমিকা

* আইভান ক্রিলভ ১-১৫

রাজপুত্রের শিক্ষা ; পশুদের প্রায়শ্চিত্ত ; বিড়াল ও বুলবুল ; দয়াবতার শেয়াল ; সে এক মহাবল পিপীলিকা ; পাতা ও শিকড় ; গর্দভচন্দ্র ও তার গলঘণ্টা ; শুয়োর

* আলেকজান্দ্‌র পুশ্‌কিন ১৬-৩০

পোস্টমাষ্টার ও তার মেয়ে

* নিকোলাই গোগোল ৩১-৭২

ভুতুড়ে জমি ; জুড়িগাড়ী ; সেইণ্ট-জন সন্ধ্যা

* আইভান তুর্গেনেভ ৭৩-৯১

প্রবেশ-দ্বার ; পাখী ; ভিখারী ; দেশগাঁয়ে ; আকুলিনা ও একগুচ্ছ ফুল

* ফিয়দর্‌ দস্তয়েভ্‌স্কি ৯২-৯৮

উৎসবের দিনে এক ভিখারী-ছেলে

* সাল্‌তিকভ-শ্চেদ্রিন ৯৯-১০৮

বিবেকবান খরগোশ

* লেভ্‌ তলস্তয় ১০৯-১৪৭

যেখানে ভালোবাসা ; ছোটরা বড়দের চেয়েও বড় ; শৈশব-স্মৃতি ; এক ভ্রমণ-প্রসঙ্গ ; ভালুক-শিকার

* মামিন-সিবিরিয়াক ১৪৮-১৫৯

উরালের প্রত্যন্ত অঞ্চলে পিম্‌কা

* আন্তন চেখভ : ১৬০-১৮৮

এই হ্যাচ্চো ; একটি ঘটনা ; দুঃস্বপ্ন

* ফিয়দর সোলোগুব ১৮৯-২১০

তুরান্দিনা : রূপকথা ; ধ্বংস হও, দস্যুদল-!

* শ্রীমতী এস্তাফিয়েভা ২১১-২২৪

সৎমায়ের সৎ-ছেলে ভানিয়া

* আলেকজান্দ্‌র কুপ্রিন ২২৫-২৪৫

হাতী ; এবার তা হ'লে নাচো

বিশুদ্ধ সংশোধনী

## বিষয়-প্রসঙ্গ : গ্রন্থমালা ও প্রথম খণ্ড

'বিশ্বসাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ কিশোর-গল্প সংগ্রহ'—এটি পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষা-সাহিত্য থেকে নির্বাচিত কিশোর-কিশোরীদের যোগ্য এক-একটি গল্পসংগ্রহের গ্রন্থমালা, সমাপ্ত হবে আটখণ্ডে। নানাদেশের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকদের সঙ্গে স্থানকাল-পাত্রযোগে পরিচয় ঘটানোটা অসম্ভব ব্যাপার ; তাই সশ্রদ্ধ ঘনিষ্ঠতায় মুখোমুখী সাক্ষাতের ব্যবস্থাটা করে দেয় অনুবাদ-সাহিত্য, তার স্বচ্ছ পর্দার পিছনে অবশ্যই থাকেন এক সহৃদয় অনুবাদক। বাংলাভাষাভাষী কিশোর-কিশোরীদের কাছে এই অনুবাদকের দায়িত্ব গ্রহণ করে সত্যিই আনন্দিত, এবং বিদেশী সাহিত্যের মূলানুসারী বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্য যথাসম্ভব রক্ষা করার দিকে বিশেষভাবেই সচেতন। লক্ষ্য রেখেছি. শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকদের শ্রেষ্ঠত্বের স্বরূপটি নির্বাচনে ও অনুবাদ-কর্মে যেন বজায় থাকে—শ্রেষ্ঠত্বের নমুনা কেবলমাত্র বাজার-চল্‌তি 'শ্রেষ্ঠ-মার্কা'র ধাপ্পা না হয়, ভগ্নাংশে ভ্রষ্টও না হয়, কিংবা শাঁসের চেয়ে ছিব্‌ড়ে বড় না হয়ে ওঠে, যদৃচ্ছা পরিবর্তনে খোদার উপর খোদগিরিও নয়। মূলানুযায়ী বিষয় ও প্রকাশরীতির ক্ষেত্রে অবিকৃত সততাই অনুবাদকের শ্রেষ্ঠধর্ম। কিন্তু নির্বাচকের দায়িত্বও এখানে মোটেই ছোট নয় : যে জাতির যাদের জন্যে পরিবেশন, তাদের অনুভব ও চেতনাকে রূপদান করার ও অগ্রসর করে দেবার মতো সাহিত্যই তো অনুবাদ-মাধ্যমে পরিবেশন-যোগ্য। এই নির্বাচক ও অনুবাদকের দ্বৈত-ভূমিকা ছাড়া সম্পাদক-রূপে যোগ করেছি সাহিত্যিকদের জীবন ও সাহিত্য সম্পর্কে ( সাহিত্যিকদের ছবিসহ ) এক-একটি সংক্ষিপ্ত অগ্রভূমিকা, আর এই ভূমিকা-প্রসঙ্গ।

কিশোর-সাহিত্যের স্বকীয় বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্য লক্ষ্য করবার মতো :

কিশোর-কিশোরীদের ক্রম-অগ্রসর জীবন [ মনে করা যেতে পারে ১২-১৩ থেকে ১৮-১৯ বয়স পর্যন্ত ] বিশেষরূপেই ক্রম-উন্মীলিত। এই বয়সটাই শারীরিক-মানসিক-আত্মিক—এই তিন-সম্পর্কের মধ্যে সামঞ্জস্য রচনার সময়, তাদের ব্যক্তিত্বের গঠন ও স্ফুরণের বিশেষ ধাপ। কিশোর-কিশোরীদের একান্ত স্বকীয় জীবন ও জগৎ, পরিবেশ ও পরিষঙ্গ—তাদের মূল্যবোধ, বিচার-পদ্ধতি, চেতনা ও প্রয়োগ-কৌশল, আশা-আদর্শ ও ব্যাঘাত-বিরূপতা কি

মধ্যেই বিশেষ স্থান গ্রহণ করে শ্রদ্ধা ও স্নেহ-ভালোবাসার সম্পর্ক এবং তার বিপরীত দিকটাও; স্থান গ্রহণ করে সুকুমার অনুভব ও কল্পনা, বাস্তবের মুখোমুখী আলোড়ন ও উত্তেজনা, প্রবৃত্তির প্রেরণা ও বিবেকের শাসন, এবং পাপবোধের দংশন-যন্ত্রণাও; আরো আছে স্বপ্নময়তা ও রহস্যময়তার দিকে শিশুসুলভ আকর্ষণ, এবং বহিঃপ্রকৃতি প্রসঙ্গে বিস্ময়-ভয়-রূপমুগ্ধতায় প্রাকৃতিক ও মানবিক সম্পর্ক। কিশোর-কিশোরীর বিকাশোন্মুখ বহুমুখী জীবন ও জগৎ বড়ই বিবর্তনশীলরূপে বিস্ময়কর এবং রহস্যময়ও—সেখানে যেমন সম্ভাবনার বিদ্যুৎ-ঝলক বা অগ্রসর দিগন্তের আলোছায়াময় আহ্বান, তেমনি প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার নিয়ন্ত্রণ ও প্রবৃত্তির দুর্দম অভিপ্রকাশ—সমাজ ও পরিবেশের সঙ্গে ব্যক্তি ও ব্যক্তিত্বের মিল মেলাবার কত না প্রয়াস। কিশোর-কিশোরীদের তাই মনে হয় কখনো কল্যাণ-সচেতন ও বুদ্ধি-সজাগ; কখনো-বা ভুলভ্রান্তি-ঘেরা: কখনো যেন বড়সড়, কখনো যেন ছোটটিই! এই বয়সের বিচিত্র বহুমুখিতা এবং দুরন্ত পরিবর্তন-শীলতার বৈশিষ্ট্যটি ধরতে না পারলে—কোনো স্থিতিবন্দী মাপকাঠি দিয়ে বিচার করলে অনেককিছুই মনে হবে জ্যাঠামো বা পাকামো, কিছুকিছু মনে হবে ছেলেমানুষি বা ছ্যাবলামো, এমনকি ন্যাকামো! এই সংগ্রহেও এমন কিছু-কিছু থাকতে পারে—যেহেতু থাকাটাই জীবনসঙ্গত—ক্ষেত্রানুসারে বিধেয়: ক্ষেত্রে বিধীয়তে।

এই সংগ্রহে অর্থাৎ এই প্রথম খণ্ডেও 'আকুলিনা ও একগুচ্ছ ফুল' নির্বিচারে মনে হতে পারে পাকামো; কিন্তু ভেবে দেখলে মনে হবে গল্পটির আবেদনে আছে একটি কিশোরীর অগ্রসর দেহে-মনে ভালোবাসার আন্তঃ-সম্পর্ক এবং তার দায়বোধের ও বিচারবোধের অভাবে করুণ পরিণাম। অন্যদিকে, 'খুকীর অসুখ' সম্পর্কে জিজ্ঞাসাও স্বাভাবিক—'এটা তো বাচ্চাদের গল্প!' হ্যাঁ, শিশুরাই তো হয়ে উঠছে কিশোর-কিশোরী। আবার, এই সংগ্রহের কোনো কোনো গল্প মনে হতে পারে ভাষায় একটু কঠিন কিংবা বিশেষ অধিকার-সাপেক্ষ। হ্যাঁ তাই, 'বিড়াল ও বুলবুল' 'প্রবেশ দ্বার' বা 'এবার তা'হলে নাচো', 'বিবেকবান খরগোশ' বা 'ধ্বংস হও দস্যুদল', এমনকি 'একটি ভ্রমণ-প্রসঙ্গ'-এর শেষ অংশ—এসব কিশোর-কিশোরীদের মধ্যে অগ্রসরদের জন্যে হ'লই বা।

স্মরণ-যোগ্য: কিশোর-সাহিত্যের একটা বিশেষ দিক হ'ল—কেবল সবটা বোঝাই নয়, না-বোঝা বিষয়ের দিকেও সহজ ও সহৃদয় আগ্রহ সৃষ্টি করা—অনুভব ও ধারণা-শক্তি অর্থাৎ মননকেও নাড়া দিয়ে কিছুটা [illegible] এগিয়ে

দেওয়া—দুর্জ্ঞেয়ের দিকেও অঙ্গুলি-নির্দেশে ঔৎসুক্য সৃষ্টি করা। তলিয়ে থাকা বোধশক্তিকেও জাগিয়ে তোলাটাই শ্রেষ্ঠ কিশোর-সাহিত্যের উচ্চ অধিকার।

এজন্যেও কিছুকিছু বিশেষ ধরণের ভাব-ও-রূপের গল্প বাদ দেওয়া হয়নি—এমনকি অংশবিশেষও নয়। তবে, ভালো-লাগাটা যেন আগাগোড়া বজায় থাকে সেটা নিশ্চিতই দেখবার বিষয় যে কোনো সংসাহিত্যের উদাহরণে, আরো বিশেষত কিশোর-সাহিত্যে। মনে রাখা ভালো, যে-কোনো ভালো শিশু-সাহিত্য বা কিশোর-সাহিত্য বড়দের পক্ষেও নিশ্চয়ই ভালো, কিন্তু বড়দের পক্ষে যা ভালো সাহিত্য তা-ই শিশু বা কিশোর-কিশোরীদের জন্যে ভালো না হতেও পারে॥

এই গল্পসংগ্রহে কিশোর-কিশোরী-সম্মত যে সব ভাবকেন্দ্র বা বিষয়াশ্রয় গল্প-মাধ্যমে পরিবেশন করা হয়েছে তা এখানে উল্লেখযোগ্য : ১॥ আদর্শ-বোধ, দায়িত্ব-জ্ঞান ও জীবন-জিজ্ঞাসা ; ২॥ ব্যঙ্গসমালোচনা ও হাস্যরস ; ৩॥ স্নেহমায়া ও প্রণয়-ভালোবাসা ; ৪॥ ধর্মচেতনা ও নীতিবোধ ; ৫॥ সুকুমার অনুভব ও স্বপ্ন-কল্পনা ; ৬॥ রহস্যময়তা ও অলৌকিকতা ; ৭॥ প্রাকৃতিক ও মানবিক সম্পর্ক।

* মোটামুটি কাল-সীমায় বলা চলে এইপ্রথম খণ্ডটির নির্বাচিত গল্পমালা গ্রহণ করা হ'ল প্রাক্-বিপ্লব রুশ সাহিত্যের ছোটগল্প থেকে এবং তার পরিধি ক্রিলভ থেকে কুপ্রিন : সর্বমোট বারোজন সর্বশ্রেষ্ঠ রুশলেখকের সুকুমার অনুভব ও তীক্ষ্ণ জীবন-চেতনার বৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ বত্রিশটি শ্রেষ্ঠগল্প ; কালসীমা উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দশক থেকে বিংশ-শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক। বলাই বাহুল্য, তৃতীয় কি চতুর্থ দশক পর্যন্ত সোলোগুব কি কুপ্রিন জীবিত থাকলেও তাঁদের রচনাশক্তির যা-কিছু শ্রেষ্ঠ পরিচয় প্রাকবিপ্লব-কালীন। তবে, মাক্সিম গোর্কি প্রাক-বিপ্লব কালেরও একজন শ্রেষ্ঠ লেখক,—তিনি প্রাক-বিপ্লব ও বিপ্লবোত্তর রুশ-সাহিত্যের দৃঢ়সেতু-স্বরূপ—যুগসন্ধি ও যুগোত্তরের মহান সাহিত্য-স্থপতি বিশেষ। তাই গোর্কি থেকেই সুরু হবে এই কিশোর গল্পমালার দ্বিতীয় খণ্ড : সোভিয়েত সাহিত্যের কিশোর-গল্প।

সঙ্গত প্রশ্ন স্বাভাবিক, কারো কারো আরো-কিছু ভালো গল্প কিংবা কোনো কারো গল্প এখানেই নেই কেন ? পৃষ্ঠাসংখ্যার ও মূল্যমানের আনুপাতিক হার-রক্ষার রীতিমতো বাধার কথা বাদ দিয়েই জবাবটা হ'ল :

১॥ যাঁর ভালোগল্প অনেকটাই নিয়েছি, তাঁর আরো অনেকটা নেওয়া

সম্ভব নয় ; ২॥ কারো কারো একাধিক কিশোর-সাহিত্য-যোগ্য গল্পই দুর্লভ। —যেমন পুশ্‌কিন-এর লেখা 'তুষার-ঝঞ্ঝা', 'ইশকাবনের বিবি' বা 'পিস্তলের গুলি' ভালো গল্প হ'লেও ঠিক কিশোর-গল্প নয়। ৩॥ যে গল্প ভালো হ'লেও আকারে বড় বা বড়গল্প তা এই সংগ্রহে স্থান দেওয়া সম্ভব হয়নি—সীমিত পৃষ্ঠাসংখ্যার মধ্যে গল্পসংখ্যা এবং লেখকসংখ্যাকেই বেশী স্থান দিয়েছি।

এই স্ব-নির্বাচিত গল্পগ্রন্থের বারোজন রুশলেখকের মধ্যে পাঁচজনকে [ দ্র. এক-তৃতীয়াংশেরও বেশী—প্রায় অর্ধেক ] এদেশে প্রায়-নতুন কিংবা একেবারেই নতুন লেখকরূপে এগিয়ে দিলাম। এঁদেরও অনেককেই বাংলা অনুবাদ-সাহিত্যে সর্বপ্রথম স্থান দিয়েছিলাম বহুপূর্বে—মাসিক পত্রিকায় বা গ্রন্থেও। এদেশে এমনকি রুশ সাহিত্য-প্রেমিক বড়দের অনেকের কাছেও এখনো অপরিচিত আইভান ক্রিলভ-এর মতো উচ্চাঙ্গের সমাজ-সচেতন জীবন-শিল্পী কবি-গল্পকার, মিখাইল সাল্‌তিকভ-শ্চেদ্রিন ও দিমিত্রাই মামিন-সিবিরিয়াক-এর মতো ব্যঙ্গ গল্প-লেখক ও উপন্যাসিক, ফিয়দর সোলোগুব-এর মতো গল্পস্রষ্টা ও কবি ; শ্রীমতী এস্তাফিয়েভা তো একেবারেই অপরিচিতা। আমার অনুবাদে ওঁর এখানকার গল্পটি প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল 'ধরিত্রী' নামক মাসিক পত্রিকায় দ্র. ভাদ্র, ১৩৫৪ সাল, পৃ. ২৬২—২৬৯ ( ১৯৪৭ খ্রী. ) ; মামিন-সিবিরিয়াক-কেও আমি এদেশে পরিচিত করেছিলাম একটি অপূর্ব গল্পের ( বর্তমান গ্রন্থ দ্রষ্টব্য ) অনুবাদ মাধ্যমে বহুকাল আগে (দ্র. শিশুসাথী পত্রিকা, অগ্রহায়ণ, ১৩৬১ সাল)। সম্প্রতি 'মস্কৌ প্রগতি প্রকাশনী' এই লেখককে তাঁর একটি সুন্দর রূপকথার বাংলা-অনুবাদ মাধ্যমে পরিচিত করায় আনন্দিত হয়েছি, তেমনি আনন্দিত হয়েছি কুপ্রিন-এর 'হাতী' গল্পটিকেও ছোটদের বইরূপে দেখে। উল্লেখ করাটা অসঙ্গত হবে না যে ঐ অতুলনীয় গল্পটি আমি প্রথম বাংলা অনুবাদে পরিবেশন করেছিলাম বহুকাল আগে ( দ্র. শিশুসাথী, মাঘ, ১৩৬০, ইং ১৯৫৪ ) ; গল্পটিকে সাদরে স্থান দিয়েছি—নাম দিয়েছি 'খুকীর অসুখ'।

ফিয়দর সোলোগুব-এর লেখা কয়েকটি চমৎকার বুদ্ধিতীক্ষ্ণ গল্প আমি বহুপূর্বেই প্রকাশ করেছিলাম। এখানে নিয়েছি 'রাজকন্যা তুরান্দিনা' ; 'ধ্বংস হও, দস্যুদল !' [ দ্র. আমার অনুবাদে প্রথম প্রকাশ ; ধরিত্রী পত্রিকা, আষাঢ়, ১৩৫৫ সাল। ] গল্পকার ইভান ক্রিলভও এদেশে খুবি অপরিচিত,—এমন কি এঁর কোনো বই পড়তে পাওয়াটাও অসম্ভব ব্যাপার। ১৯৬৪তে একালে গ্রন্থাকারে সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয়েছিল আমার প্রণীত 'গল্পের রাজা ক্রিলভের গল্প'—৪০টি

-গল্প নিয়ে, বর্তমানে পঁচাত্তরটি গল্প প্রকাশের অপেক্ষায়।

—উল্লিখিত পাঁচজন রুশ সাহিত্যিকের সঙ্গে এবং বহু নতুন-নতুন অর্থাৎ অপরিচিত ভালো গল্পের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়াটা এই সংগ্রহ-গ্রন্থের একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য মনে হ'তে পারে।

ত্রিশ বৎসর পূর্বে চারখণ্ডে প্রকাশিত হয়েছিল আমার 'পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ গল্প'—প্রায় ছয়শত পৃষ্ঠাব্যাপী প্রথম দুইখণ্ডে সাতাশটি গল্প নির্বাচিত ও অনুবাদিত হয়েছিল রুশ গল্প-সাহিত্য থেকে, তবে তা কিশোর-কিশোরীদের জন্যেই নয়—বড়দের জন্যে।

* আমার অনুবাদে বিভিন্ন গল্পের বাংলার বাক্‌রীতিতে, শব্দপ্রয়োগে ও বাক্যগঠনে যে বৈচিত্র্য তথা বিভিন্নতা লক্ষণীয় তা স্বেচ্ছাকৃত নয়, মূল-লেখকের স্বকীয়তা বা বিশিষ্টতা-ব্যঞ্জক মনে হতে পারে। তাই ভাষা কখনো হয়েছে অতিমার্জিত, কখনো একেবারে ঘরোয়া এমনকি গেঁয়ো, কখনো মধ্যপন্থী। তবে সর্বত্রই ভাষাকে রাখতে হয়েছে চলতি, যুগোপযোগী আবেদনের অনুকূলে; একমাত্র বিশেষ উদ্দেশ্যেই সাধুভাষায় রাখা হয়েছে কোনো-কোনো কথা বা উদ্ধৃতি।

বাল্য ও কৈশোর থেকে ইংরেজী কবিতা ও গল্প অনুবাদ করার অভ্যাস থাকায় এবং বিশেষত পঁয়ত্রিশ বৎসরাধিক কাল অনুবাদ-সাহিত্যে একব্রতী থাকায়, আমার কাজে ঐকান্তিকতা স্বাভাবিক। তবু, অসাবধানতা ও অলক্ষ্য অজ্ঞতায় যে ছোটখাট ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকেছে তা নিশ্চয়ই নতুন সংস্করণে সংশোধন ও সংস্কার-সম্পাদন যোগ্য। যেমন: 'ছেনালী' শব্দটির জায়গায় (পৃঃ ১৯) যথাযথ শব্দটি হওয়া উচিত ছিল: 'ঢলানী'; পৃঃ ৫৯, হবে: নাইটিঙ্গেলের স্বরে কথা বলবার জন্যেই। দু'একটি রুশ উচ্চারণেও বিভ্রান্তি ঘটেছে, বিশেষত নামক্ষেত্রে—আইভান না হয়ে হবে ইভান; আইভাস নয়, হবে ইভাস।

অনুবাদক-ভূমিকায় আমার প্রধান দুর্বলতা হ'ল মূল রুশভাষা না জানা; এবং এই দুর্বলতার দায় গ্রহণ করেই মূল লেখকের তথা গ্রন্থের যতরকম অনুবাদ-সংস্করণ লভ্য মোটামুটি তাদের তুলনামূলক পাঠ লক্ষ্য করেছি; এবং আরো বিশেষত মূললেখকের এবং গ্রন্থের প্রকৃতি তথা ভাষা ও ভাষারীতির বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে প্রাক্‌-প্রস্তুতি গ্রহণ করেছি—যতটা পারি।

যেসব গ্রন্থ-প্রকাশনী মাধ্যমে ইংরেজী অনুবাদ-গ্রন্থের সাহায্য পেয়েছি তা এখানে উল্লেখ করছি: প্রগ্রেস পাবলিশার্স, এবং ফরেন ল্যাঙ্গুয়েজ পাবলিশিং

হাউস, মস্কো, কর্তৃক প্রকাশিত প্রাসঙ্গিক রুশ সাহিত্যের কিছু ইংরেজী অনুবাদ-গ্রন্থ; মিসেস কনষ্টান্স গার্নেট কর্তৃক ইংরেজীতে অনূদিত বিভিন্ন রুশগ্রন্থমালা (প্রধানত চেখভ); জে. হ্যামার্টন সম্পাদিত ষ্ট্যাণ্ডার্ড লিটেরেচার, কলিকাতা, প্রকাশিত 'মাষ্টারপিস লাইব্রেরী অব শর্ট ষ্টরিজ' গ্রন্থমালার রুশখণ্ড, এবং আরো কিছু গ্রন্থাশ্রয়।

বর্তমান সংগ্রহের নির্বাচন, অনুবাদ, লেখক-পরিচিতি, সম্পাদনা ও লেখক-চিত্র যোজনার সবটাই আমি একক দায়িত্বে করেছি। প্রসঙ্গ-সূত্রে সহায়ক ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের নাম এখানে সকৃতজ্ঞভাবে উল্লেখ করছি: কবি অধ্যাপক তরুণ সান্যাল, ('ইস্কাস্'); অধিকর্তা ডক্টর রবীন্দ্রকুমার দাসগুপ্ত, কবি নচিকেতা ভরদ্বাজ, কলিকাতা জাতীয় গ্রন্থাগার; গ্রন্থাগারিক শ্রীশিবশঙ্কর মিত্র, শ্রীরাখল দত্তরায়, (গোর্কি সদন); সুদেব চট্টোপাধ্যায় (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার); সত্য সেন ও রবীন্দ্র মজুমদার (সোভিয়েত তথ্যদপ্তর, কলিকাতা); ডক্টর পঞ্চানন সাহা (ইণ্ডো জি. ডি. আর. মৈত্রী, কলিকাতা)। লেখক পরিচিতি-সূত্র: প্রধানত 'ধরিত্রী' পত্রিকায় প্রকাশিত (অগ্রহায়ণ ১৩৫৪—জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৫) আমার লেখা 'বিখ্যাত রুশ লেখকদের জীবন-ভূমিকা'; আমার অনুবাদিত ও ভূমিকা-সম্বলিত 'গল্পের রাজা ক্রিলভের গল্প', প্রকাশকাল ১৯৬৪; রুশ সাহিত্যের বৃহৎ অভিধান; সোভিয়েত লেখক অভিধান; সোভিয়েত ক্যালেণ্ডার (১৯১৭-১৯৪৭); প্রিন্স ডি. মারস্কি কর্তৃক সম্পাদিত রুশ সাহিত্য (এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা); এবং প্রগ্রেস পাব্লিশার্স প্রকাশিত গ্রন্থাশ্রিত কিছু লেখক-ভূমিকা।

সবশেষে সানন্দে উল্লেখ করছি: যে দুজনের প্রেরণায় ও উৎসাহে এই গ্রন্থমালার শুভারম্ভ সম্ভব হ'ল তাঁরা আমার ভ্রাতৃ-প্রতিম: শ্রীযুক্ত প্রণবরঞ্জন ঘোষ (রীডার, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলা বিভাগ), এবং কৃতকর্মা তরুণ দুলালেন্দু চট্টোপাধ্যায়, বি. কম., এল এল. বি.।

—এই গ্রন্থের যা নিষ্ঠাগুণে যথাযথ তা সকলের, বিশেষত কিশোর-কিশোরীদের; যেটুকু অযোগ্যতা বা অসাবধানতা তাই একমাত্র আমার।

ফাল্গুনী পূর্ণিমা —অনিলেন্দু চক্রবর্তী

## * আইভান ক্রিলভ *

১৭৬৮-১৮৪৪ খ্রী.

'ফেব্‌ল' বা নীতিগল্প-মূলক বিশিষ্ট সাহিত্যের ইতিহাসে ক্রিলভ ধাতে ও জাতে—দৃষ্টিভঙ্গী ও বিষয়বস্তুতে একটু অনন্য-অসাধারণ;

বিষ্ণুশর্মা, ঈশপ, ড্রাইডেন, লা ফতেঁ—বিশ্বসাহিত্যের প্রখ্যাত এইসব পূর্বগামী নীতি-গল্পকারদের পরেই ক্রিলভের আবির্ভাব, কিন্তু সাহিত্যগুণে অভিনব; গল্পের সহৃদয় আবেদন দেশকালের গণ্ডী ছাড়িয়ে। সামাজিক ও রাজনৈতিক বিষয়প্রসঙ্গই লেখকের আশ্রয়-বস্তু, এবং বাস্তব-সচেতন এই কবি-গল্পকার তাঁর সমকালীন শহর ও গাঁয়ের জীবন অর্থাৎ খাঁটি স্বদেশীয় জীবনকে তুলে ধরেছেন নীতিগল্পের মাধ্যমে—চলতি কথার ভঙ্গীতে, ব্যঙ্গ-সমালোচনার মিঠেকড়ায়। ২০৫টি গল্পের মধ্যে প্রায় সব গল্পই লেখকের স্বকীয় সৃষ্টি: পশুপাখী, গাছপালা, নদী, ডোবা বা কৃষকদের আশ্রয় নিয়েই প্রধানত লেখা। অন্যদেশের নীতিগল্প থেকে গৃহীত গল্পকেও লেখক শেষটায় ঘুরিয়ে দিয়েছেন নতুনরূপে।

আইভান ক্রিলভ পুশ্‌কিনের চেয়ে জ্যেষ্ঠ; এঁর গল্পগ্রন্থ প্রথম প্রকাশিত হয় চল্লিশ বছর বয়সে ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে, এবং ক্রিলভও শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক-গোষ্ঠীতে আসন পান—ঊনবিংশ শতাব্দীর রুশ সাহিত্যের আধুনিক ইতিহাসের প্রথমেই। বস্তুত, অষ্টাদশ শতাব্দীর রক্ষণশীল

ও প্রাচীনধর্মী সাহিত্যিক গোষ্ঠীর পরে উনবিংশ শতাব্দীতেই দেখা দেয় নবীনধর্মী সাহিত্যিক গোষ্ঠী : রোমান্টিক সৌন্দর্য-দৃষ্টির সঙ্গেই বাস্তব চেতনার অপূর্ব সমন্বয় ঘটে এঁদের রচনায়—প্রগতিবোধের সঙ্গে প্রাণযোগের। বস্তুত, ফরাসী প্রভাব দ্বারা পরিচালিত না হয়ে রাশিয়ার স্বকীয় জীবন ও জগৎকে দেখে সাহিত্যের এক নতুন বনিয়াদ রচনা করেছেন ক্রিলভ। তাই বলা যায়, ১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দে ক্রিলভ প্রকাশিত গল্পগ্রন্থ থেকেই সুরু হয়েছে রুশ-সাহিত্যের নবযুগ।

নিজের দেশের জীবন সম্পর্কে জ্ঞান এবং সেইসঙ্গে সচেতন শুভবুদ্ধি থাকার জন্যে ক্রিলভ সুকৌশলে ও শিল্পী-জনোচিতরূপে সামাজিক ও রাজনৈতিক বিষয়-বস্তুগুলিকেই সার্থক রূপ দিয়েছেন নানারকমের নীতি-গল্পের আশ্রয়ে। রাজশাসনের কিছু ব্যঙ্গ-সমালোচনার কারণে তাঁর লেখা গল্প ছাপানোটা নিষিদ্ধ করা হয়—রাজকীয় অনুমতি তথা ছাড়পত্র পেলেই তবে প্রকাশ চলবে। শিল্পী ক্রিলভ এই বিশেষ বিষয়টির উপরেই লেখেন তাঁর বিখ্যাত ব্যঙ্গগল্প 'বিড়াল ও বুলবুল'। এখানে এই সংগ্রহ-গ্রন্থে তুলে ধরা হয়েছে ক্রিলভের লেখা বহুগল্পের মধ্যে সাতটি মাত্র। বহুপূর্বে আমার 'ক্রিলভের গল্প' বইতে কিছু গল্প পরিবেশন করেছিলাম বাংলায় একালে সর্বপ্রথম; শ্রেষ্ঠ সত্তরটি গল্প প্রকাশের অপেক্ষায়। উল্লেখ্য, রাজধানী পিটার্সবুর্গের সাধারণ গ্রন্থাগারে ক্রিলভ বহুকাল উচ্চপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

নিজের দেশের পথে-প্রান্তরে শহরে-বন্দরে-গাঁয়ে ঘুরে ঘুরে ক্রিলভ আয়ত্ত করেছিলেন খাঁটি দেশীভাষা—সে ভাষা যেমন অকৃত্রিম, তেমনি তাজা, তেমনিই আবার সহজ ভাবভঙ্গী-পুষ্ট। [ক্রিলভের মূলগল্প লেখা কবিতায়, এখানে পরিবেশন করে দিলাম মূলনিষ্ঠ গদ্যে] ক্রিলভের ভাষা এত সহজ হয়েও অভিজ্ঞতা-পুষ্ট যে তার বহুকথাই প্রবাদবাক্যের আসন পেয়েছে রুশ দেশে।

ক্রিলভের নীতিগল্প নিছক নীতিঘেঁষা গল্প নয়—বাস্তব জীবন-চেতনা ও তীক্ষ্ণ শুভ-বুদ্ধিজাত। তাই এসব কিশোর-কিশোরীদের অবশ্য-পাঠ্য; তবে ক্রিলভের গল্প শুধু পড়ার নয়, পড়ার পরে ভাবার।

# ॥ রাজপুত্রের শিক্ষা ॥

পশুরাজ সিংহ মহাশয় বড়ই চিন্তিত হয়ে পড়েছেন। রাজপুত্রের বয়স বছর খানেক হ'ল, হাতে পায়ে দিব্যি নখ গজিয়েছে, দাঁতও উঠেছে,—কিন্তু লেখাপড়ার ব্যবস্থাটা হয়নি এখনো। মানুষের এক বছরের বাচ্চা দোলনায় দোলে বটে, এক বছরের সিংহশিশু তো নেহাৎ খোকন নয়!

এবার তাই যথাযোগ্য একজন শিক্ষক চাই রাজপুত্রের—যোগ্য শিক্ষক, যার শিক্ষাগুণে ছেলে হবে যোগ্য নৃপতি, পূর্ণ হবে বৃদ্ধ পিতার মনের কামনা।

কিন্তু কার উপরে দেওয়া যায় শিক্ষার এই গুরুভার—ছেলেটাকে রাজকীয় সমস্ত গুণেই শিক্ষিত করে তুলবে এহেন শিক্ষকই বা কে আছে তাঁর বনরাজ্যে?

আচ্ছা, শেয়াল পণ্ডিতকে এই ভারটা দিলে কেমন হয়? পণ্ডিত বলে তো তার খুবি নামডাক, খুব বুদ্ধিমানও। কিন্তু, তার বুদ্ধি তো ধূর্তের বুদ্ধি দুর্বুদ্ধি—মহাধূর্ত সে। আর যা মিথ্যেবাদী—নাকে মুখে কেবল মিথ্যেকথা। তা, রাজপুত্র যা শিখবে নিশ্চয়ই তা ধূর্ততা নয়, মিথ্যেকথাও নয়। না, শেয়াল পণ্ডিতকে দিয়ে হবে না।

তা, প্রাণীদের মধ্যে পিপীলিকার অর্থাৎ কিনা পিঁপড়ের মতো গুণীজন আছে ক'জন? এদের জীবনটা হ'ল শিক্ষার আদর্শ ক্ষেত্র। কী সততা, কী শ্রমশক্তি, কী অধ্যবসায়, কী নিষ্ঠা! এদের আর জুড়ি নেই কোথাও। পিঁপড়ের বাসায় যাও, দেখবে কী আশ্চর্য শৃঙ্খলা, কী সুন্দর নিয়মকানুন, কী পরিচ্ছন্নতা! একটি ছোট্ট বাসায় ধরে রেখেছে তারা কী মহান কৃতিত্বের পরিচয়!

কিন্তু,—সিংহমহাশয় এবারে কিন্তু-র ভাবনায় পড়েছেন। কিন্তু, পিঁপড়ের রাজত্ব আর পশুরাজের রাজত্ব নিশ্চয়ই এক নয়, এবং পিঁপড়ে যতই ভালো হ'ক, পশুরাজের সঙ্গে কিনা ক্ষুদে পিঁপড়ের তুলনা! না, না, তা হয় না। তা ছাড়া, রাজা হতে চাই দূরদৃষ্টি, চাই উদার চরিত্র। সে কি আর ক্ষুদে পিঁপড়েদের আছে? চোখ দুটি অবশ্যি ওর খুবি বড়—কিন্তু দূরদৃষ্টি সে আলাদা কথা। না, রাজপুত্রের শিক্ষাদানের ব্যাপারে পিঁপড়েরা মোটেই যোগ্য নয়।

হ্যাঁ, ভালো মনে পড়েছে, নেকড়েকে কি এই ভার দেওয়া যায় না? খুবি

শক্তিমান সে, সাহসী যোদ্ধাও বটে—যুদ্ধের কলাকৌশলটা ভালোই শেখাতে পারবে। কিন্তু, গায়ের জোরেই তো রাজার শিক্ষা হয় না। রাজনীতির বা রাজ্যশাসনের কী বোঝে ও? তাছাড়া, ভারী হিংস্র, আর যা বদরাগী! মনে উদারতা নেই মোটেই, নেই ধৈর্যগুণও। রাজা হ'তে হ'লে যেমনটা চাই গায়ের জোর, তেমনি তার চেয়েও বেশীটা চাই মনের জোর এবং বিচার-শক্তি। জোর যার মুলুক তার—এটা তো আর রাজধর্ম নয়। না না, সিংহের বাচ্চাদের শিক্ষা দেবার ক্ষমতাটা নেকড়ে পাবে কোত্থেকে?

এমনি করে একে-একে মনে-মনে যাচাই করে দেখা হ'ল সমস্ত প্রাণীদের যথা-যোগ্যতা, এমন কি হাতীও বাদ গেল না। তা, হাতীর গায়ে বল যতই থাকুক না, কী বিদঘুটে চেহারা! আর কী ছোট্ট ল্যাজটা, দেখলেই হাসি পায়। বুদ্ধি আছে মনে হয় বটে, তবে ও কোনো কম্মের নয়।

এক কথায় বনরাজ্যের সমস্ত প্রাণীই বরবাদ—সিংহের বাচ্চার শিক্ষকরূপে কেউই যোগ্য বলে বিবেচিত হ'ল না। ঠিক বলতে কি, রাজপুত্রকে শিক্ষা দেবার মতো যথেষ্ট বুদ্ধিমানও মনে হ'ল না কাউকেই!

তার পর ঘটনাক্রমে বা দুর্ঘটনাক্রমে, যে ভাবেই হ'ক না পশুরাজ সিংহের সঙ্গে একদিন দেখাসাক্ষাৎ করতে এলেন পক্ষীরাজ ঈগল। কথায় কথায় সিংহরাজের ভাব-ভাবনার কথা শুনে, পক্ষীরাজ নিজেই বললেন—'আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, সিংহ-শিশুর সমস্ত শিক্ষাভার সানন্দেই আমি গ্রহণ করলাম।' এক রাজপুত্রের শিক্ষার ভার গ্রহণ করেছেন আর একজন রাজা স্বয়ং, এর চেয়ে সৌভাগ্যের কথা আর কী হতে পারে? সিংহ মহাশয় আহ্লাদে আটখানা হয়ে শত সহস্র ধন্যবাদ জানালেন ঈগলরাজকে। হ্যাঁ, এতদিন পরে যথাযোগ্য লোকের কাছে ছেলেকে পড়তে দিয়ে স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন পশুরাজ সিংহ।

সিংহ-শিশু জামা-জুতো কোট-পাৎলুন পরে রাজপুত্রের মতোই সেজেগুজে চলে গেল ঈগলের সঙ্গে—পক্ষীরাজ ঈগলের সঙ্গে সঙ্গে থেকে হাতে নাতে এবং চোখে-মুখে শিক্ষা সমাপ্ত করে তবেই ফিরে আসবে।

এক বছর যায়, দু'বছর যায়। বন্ধুরাজার কাছ থেকে খবর আসে নিয়মিত—খবর আসে রাজপুত্রের শিক্ষাদীক্ষায় যত না সাফল্যের কথা: দিনেদিনে সে আয়ত্ত করছে কত না রকমারি জ্ঞান-বিজ্ঞান। এবং পক্ষীরাজ্যের সকলেই একবাক্যে বলছে—এতটা তাড়াতাড়ি এবং এতখানি কাউকেই তারা শিখতে দেখেনি কখনোই।

তারপর শেষ-বছরের পড়াশোনা এবং পরীক্ষা শেষ করে পক্ষীরাজ্য থেকে পশুরাজের কাছে ফিরে এল পশুরাজপুত্র স্বয়ং। সিংহ মহাশয় বনরাজ্যে ঘোষণা করে দিলেন সেই শুভ সংবাদ। ডাকা হ'ল মহাসভা।

সিংহ মহাশয় সেদিন সিংহাসনে বসে ছেলেকে কাছে ডেকে আনলেন, এবং সমস্ত প্রাণীদের দিকে তাকিয়ে বলতে লাগলেন—'আমি বৃদ্ধ হয়েছি, এবার রাজ্যভার থেকে মুক্তি নেব। আমার পুত্র বিদেশ থেকে শিক্ষিত হয়ে ফিরে এসেছে, মনে করেছি আমার স্থলে সে-ই এখন রাজা হবে। এবার ছেলের দিকে একবার তাকিয়ে বললেন—'যুবরাজ, তুমি এবার সমবেত প্রাণীদের কাছে তোমার নিজের কথা কিছু বলো। ওরা শুনে বুঝুক যে তুমি শিক্ষাগুণে যথার্থই অর্জন করেছ রাজা হবার যোগ্যতা।'

রাজপুত্র এবার বেশ ভদ্র-কায়দায় উঠে দাঁড়াল, উঠে দাঁড়িয়ে পিতাকে অভিবাদন করল, তারপর মাথাটা ঘুরিয়ে সমস্ত প্রাণীদের দেখে নিয়ে বলতে লাগল—'আমি আমার পিতার ইচ্ছায় এবং চেষ্টায়, বহু বিষয়েই শিক্ষালাভ করে এসেছি। এখানে এই বনের পশুদের মধ্যে কেউই কিচ্ছুটি জানে না—এমন সব নতুন নতুন বিষয় আমি বহুদিনের সাধনায় আয়ত্ত করেছি: ঈগল থেকে দোয়েল অবধি ছোট এবং বড় সমস্ত প্রাণীদের সবরকম হালচাল-চরিত্র, বিচিত্র খাদ্যব্যবস্থা ও তার গুনাগুণ, ডিম্ব থেকে শাবক এবং শাবক থেকে ধাড়ী অবস্থা পর্যন্ত পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে স্বচক্ষে দেখে শিখেছি। এমনকি কী-জাতীয় প্রাকৃতিক পরিবেশ এবং সংগঠন-ব্যবস্থাটা প্রত্যেকের জন্যেই প্রয়োজন সেটাও আমি যথাযথভাবে যথানির্দিষ্ট রূপেই শিখেছি। শিখেছি শুধু নয়, খাতার পর খাতায় টুকে এনেছি। পক্ষী-জগৎটা আমার যোগ্যতা সম্পর্কে কী কী ভাবে তা আমার এই যে সব প্রশস্তি-পত্র দেখছেন—এ দেখলেই আপনারা বুঝতে পারবেন। তা, বক্তৃতা আর বাড়িয়ে লাভ নেই—

'বক্তৃতা বাড়িয়ে আর লাভ নেই, আমার পিতৃদেব পশুরাজ স্বয়ং যখন আমার উপর রাজ্যভার অর্পণ করেছেন, আমার মনে হয় আমাদের এবার কাজে হাত দিতে হবে—একেবারেই নতুনভাবে। নতুন এক জীবনাদর্শ স্থাপন করাটাই হবে আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য।' এই বলেই রাজপুত্র একটু থামল, পিতার দিকে এবং সমবেত পশুদের দিকে সগর্বে মাথাটা ঘুরিয়ে বলল—'এই এখন থেকে নতুনভাবে বসবাস করবার জন্যে আমাদের প্রথম কাজটা হবে পাখীদের মতোই বাসা তৈরী করা!'

রাজপুত্রের এই কথা শুনে পশুরাজ লজ্জায় আর অপমানে সেই যে মাথা নিচু করে রইলেন, সে মাথা আর তুলতেই পারলেন না। বিদেশে শিক্ষা পেয়ে ছেলেটা বলে কি! পাখীর বাসা তৈরী করে, নতুন জীবন যাপন করতে হবে কিনা পশুদের! হায় হায়, নিজের দেশ ছেড়ে বিদেশে পাঠিয়ে কী শিক্ষাই দিলাম!

## ॥ পশুদের প্রায়শ্চিত্ত ॥

সেবার বনবনান্তর জুড়ে পশুরাজ্যে সুরু হ'ল ভয়াবহ মড়ক—বিধাতার সবচেয়ে নিষ্ঠুর অভিশাপ, প্রকৃতিলোকের সবচেয়ে বড় দুর্দৈব! খুলে গেল যেন নরকের দ্বার, আর দলে দলে কাতারে কাতারে পশুরা ছুটে চলল সেই দ্বারপথে। মৃত্যুদানব হা করে ঘুরে বেড়াতে লাগল বনে বনান্তরে, পাহাড়ে জঙ্গলে, মাঠে প্রান্তরে, আর দু'হাতে আছড়ে মারতে লাগল যাকেই সামনে পায়।

ভীত-ত্রস্ত পশুদের অনেকেই তখনো প্রাণে মরেনি, সম্মুখেই মৃত্যুর পদধ্বনি শুনছে—মরবার অপেক্ষা মাত্র। এই বিপদ থেকে উদ্ধার পাবার কারোই আর কোনো আশা-ভরসা নেই। খরগোশগুলি এখন আর ভয় করে না নেকড়েদের, কারণ এখন ওরা অহিংস তপস্বীর মতোই চুপচাপ। মোরগ মুরগীরা এখন নিরাপদ,—শেয়ালগুলি তো পড়ে আছে গর্তের মধ্যেই আধমরা।

বনরাজ্যের এহেন বিপদে বিব্রত পশুরাজ এক সভা ডাকলেন। আধমরা পশুদল গোঙাতে গোঙাতে আর খোঁড়াতে খোঁড়াতে হাজির হ'ল এসে সিংহের চারপাশে; কোনোকথা নিবেদন করবার মতো ক্ষমতা আজ আর নেই কারোই। সবাই নিভু-নিভু চোখ মেলে তাকিয়ে আছে তাদের রাজার দিকে, কান খাড়া করে আছে মহারাজ কী বলেন শুনবার জন্যে।

মহারাজ সিংহ বললেন—'বন্ধুগণ, তোমাদের মধ্যে নিশ্চয়ই কেউ এমন কোনো পাপ করেছে যার ক্ষমা নেই, এবং সেজন্যেই মড়কের বেশে নেমে এসেছে বিধাতার এই নিদারুণ অভিশাপ। কাজেই, আমাদের মধ্যে যে সবচেয়ে মারাত্মক, অর্থাৎ কিনা সর্ব্বাপেক্ষা জঘন্য

অপরাধী—স্বেচ্ছায় সে তার স্বীকারোক্তি করে নিজেকে বলি দিক, ভগবান হয়ত তাতে প্রসন্নই হবেন। কারণ, তোমরা সবাই জানো, অপরাধী স্বেচ্ছায় মৃত্যু বরণ করলে ন্যায়দণ্ডের বিধাতা যে তাতে খুশিই হন—ইতিহাসেও এমন দৃষ্টান্ত রয়েছে অসংখ্য। কাজেই, দীনতা-বোধ থেকেই এসো আমরা সবাই আজ একে একে যে-যার অপরাধের কথা স্বীকার করি—কায়েন মনসা বাচা অর্থাৎ দেহ-বলে, মনে-মনে বা কথায় যে যা-ই অপরাধ করে থাকি, এসো তার স্বীকারোক্তি দ্বারাই প্রায়শ্চিত্ত করি, ক্ষমা ভিক্ষা করি।

'হায় হায় আমি কী বলব, বলো! বলতেই আমার কণ্ঠরোধ হয়ে আসছে—তা, আমিও তো অপরাধী। নিরীহ মেষদের—কেন, ওরা তো কখনোই আমার কোনো ক্ষতি করেনি—ওদেরো আমি ভূপাতিত করেছি। কখনো বা ওদের—তা, আমাদের মধ্যে কেই বা অহিংস তপস্বী,—ওদের পালককেও খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করেছি। কাজেই এসব আমি স্বীকার করছি। কিন্তু তার আগে আমাদের সকলেরি খোলামনে নিজ নিজ গর্হিত ক্রিয়াকর্মের বিষয় স্বীকার করা দরকার। তারপর সকলের বিচার-মতে যার অপরাধ সবচেয়ে গুরুতর হবে, তাকেই আজ আমরা উৎসর্গ করব ক্রুদ্ধ দেবতার উদ্দেশে।'

এবার খেঁকশিয়াল দাঁড়িয়ে উঠে বলল—'আমাদের মহামান্য মহৎ-হৃদয় মহারাজ! আপনি মহানুভব, এবং মহানুভব বলেই আজ সকলেরি সামনে আপনি আপনার করুণার কথা প্রকাশ করলেন। তা, খাদ্যের উপরে অধিকারটা ত্যাগ করলে তো সমস্ত প্রাণীকেই না খেয়ে মরতে হয়,—কিন্তু সেটা তো আর বিধাতার ইচ্ছা নয়। তাছাড়া, আপনি যে মেষদের জীবন স্বহস্তে গ্রহণ করে থাকেন সেটা তো ওদেরি সৌভাগ্য। মেষদের সঙ্গে সঙ্গেই ওদের পালকদের সঙ্গেও আপনি সবসময়ে যাতে অনুরূপ ব্যবহার করেন সেই উদ্দেশ্যেও আমাদের সবিশেষ প্রার্থনা। ওদের সংশিক্ষা দান করাটা আপনার মতো মহারাজেরই কর্তব্য। ওই ল্যাজ-কাটা জাত কেমন বুক ফুলিয়ে বেড়ায়, আর ভাবে জন্ম হয়েছে যেন আমাদের উপরে জোর-জবরদস্তি করবার জন্যেই?'

—এই বলেই খেঁকশিয়াল থামলে ঐ একই সুরে সুর মিলিয়ে নিবেদন শুরু করল অন্যান্য অনেক প্রাণীই। সকলেরই এক বক্তব্য:

মহারাজের পবিত্র ও পরোপকারী জীবনের পক্ষে অপরাধ স্বীকৃতির প্রশ্নই ওঠে না।

একে একে উঠে দাঁড়াল ব্যাঘ্র ভল্লুক ও নেকড়ে। এবং সকলেই বলল—কিছু-না-কিছু অপরাধ তারা হয়ত করে থাকবে বা, তবে তা উল্লেখ করবার মতো কিছু নয়। ভয়াবহ যত অন্যায় যত অত্যাচার যে যা করেছে তার কোনোকিছুই বলল না কেউই। যে জীবেরা দাঁত আর নখের জোরেই ভয়ঙ্কর—তারা সকলেই এই ন্যায়-বিচারের দিনে বেকসুর খালাস পেল। শুধু যে খালাস পেল তাই নয়, তারা ন্যায়ধর্মের খাতিরেই বরাবর সব কাজই করে আসছে—এহেন স্বীকৃতিও লাভ করল।

তখন শান্তভাবে উঠে দাঁড়াল এক ষাঁড়। সে ধীরে ধীরে নিবেদন করতে লাগল—'আমরাও আমাদের পাপের কথা স্বীকার করছি। শীতকালে সেবার আমার যা খাদ্য মজুত ছিল খালি হয়ে গেল। সারাটা দিন খালি পেটে পড়ে আছি। তখন শয়তান আমাকে বারবার খোঁচাতে লাগল পাপের পথে। ধর্মগুরুর বাড়ীর পিছনটায়ই ছিল মস্ত এক খড়ের গাদা, আমি কিনা গিয়েই খেয়ে ফেললাম এক গ্রাস। সে আজ পাঁচ বছর আগেকার কথা—'

—এই বলতে বলতেই কিনা কোলাহল করে উঠল বড় বড় যত সব পশু, গর্জন করে উঠল ক্রোধে। ব্যাঘ্র ভল্লুক ও নেকড়ের দল চিৎকার করতে লাগল—

'এই যে, এবারে ধরা পড়েছে শয়তান! অন্যের খড়ে মুখ দেওয়া? এহেন পাপের জন্যে বিধাতা যে আমাদের এখন পর্যন্তও বাঁচিয়ে রেখেছেন, এটাই যথেষ্ট। এই বদমাসকে—এই ধর্মখেঁকোকে—শিংওয়ালা এই আস্ত শয়তানকে তার মহাপাপের জন্যে আজ বলি দিলে তবেই আমরা প্রাণে বাঁচব। হ্যাঁ, এর জন্যেই তো পশুকুলের অধিকাংশই আজ সাফ হয়ে গেছে।'

অন্যান্য পশুরাও বলে উঠল—'ঠিক বলেছেন, একেবারে ঠিক কথা।'

—বধ্যভূমিতে নিয়ে যাওয়া হ'ল সেই ধর্মের ষাঁড়কে।

## ।। বিড়াল ও বুলবুল ।।

একবার এক বেড়াল ধরে ফেলল এক বুলবুলকে, থাবার মধ্যে ধরে রেখে তার কানে কানে ফিসফিস ক'রে বলতে লাগল—'বুলবুল ভাই, লক্ষ্মী মানিক আমার, তোমার গানের প্রশংসায় সকলেই পঞ্চমুখ! তোমার গান শুনে সকলেই বলে—এমনটি আর হয় না। শেয়াল পণ্ডিতের কথা তো আর মিথ্যে হ'তে পারে না; তিনি বলেন—তোমার গলার অমন মধুর অমন অনিন্দ্য স্বর যে-ই যেখান থেকেই একটিবার শোনে তো একেবারে পাগল হয়ে ওঠে। আমারো ভাই, অমন গানই শুধু পছন্দ।

'ওকি, কাঁপছ কেন ভাই, এখন তো তুমি আমার প্রাণের বন্ধু! এখন আর আমার উপর রাগ করো না। ও, তুমি বুঝি ভেবেছ আমি তোমাকে খেয়ে ফেলব? না, না, তা নয়! একটিবার শুধু গান শোনাও, ব্যস্ তাহ'লেই হ'ল! আমি তো তোমাকে ছেড়েই দিতে চাই—বনে বনে কেমন ঘুরঘুর ঘুরে বেড়াবে গাছ থেকে গাছে। তুমি তো জানো, তোমার মতোই আমিও গান কত না ভালোবাসি! গান শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়তে সে কী আরাম!'

কিন্তু না, হচ্ছে না তো! বেচারা বুলবুলকে এবার সে তাই চাপ দিয়ে ধরে এমনভাবে ঝাঁকুনি মারছে যে, থাবার মধ্যে দম আটকে মারা যায় আর কি!

বেড়াল বলছে তখনো—'বেশ, অপেক্ষা করছি। বাঃ রে, আটকালোটা কিসে? গাও—একখানা গান গাও, শুনি। শুধু ছোট্ট একখানি গান!'

কিন্তু বুলবুল গাইবে-টা কী করে? কেবল চেঁচাচ্ছে ভয়ে। 'ও, এই বুঝি তোমার গান? এই গান শুনিয়েই তুমি বন-বনান্ত মাতিয়েছ!'—বেড়াল ব্যঙ্গ করে বলতে থাকে—'সমস্ত বনদেশ চিরদিন তোমার গান থেকে যে মধুর প্রেরণা পায়, এখন তা গেল কোথায়? তবে, আমার খোকাখুকুরাও যদি অমন চেঁচানি ছাড়ত,—হ্যাঁ, আমিও তবে ছেড়ে দিতাম না। হায় হায়, গানের সব প্রত্যাশাই —স্পষ্টই বুঝতে পারছি এখন, ভুল জায়গায়ই রেখেছিলাম। এবার তবে দেখাই যাক, এই মুখের মধ্যেই অন্য আস্বাদটা আমার এরচেয়ে মধুর লাগে কিনা!'— এবং সেই মুহূর্তেই বেড়ালের দুই চোয়ালের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল বেচারা বুলবুল।

: এখন আরো কাছে ঘনিয়ে এসো তোমরা, গল্পের উপদেশটা বলব থাবার আওতায় ক্ষীণ হয়ে আসে বুলবুলদের গান।

## ॥ দয়াবতার শেয়াল ॥

একদিন এক শিকারীর বেপরোয়া গুলিতে মারা গেল এক বুলবুল—তিন-তিনটি কাচ্চাবাচ্চার মা। তা, মা-বুলবুলই শুধু মরল না, সেই নিদারুণ আঘাতে মরতে বসল তিন-তিনটি কাচ্চাবাচ্চাও। বুকের তলায় তা দিতে দিতে ডিম ফুটিয়ে মা সবে তাদের বার করে এনেছে বাইরে,—এখনো কত ছোট কত বোকা, আর কতটুকুই বা জোর!

দুপুরবেলায় মুখে খাবার তুলে দেবার নেই কেউই, ঠাণ্ডায় হিমে কাঁপছে হিহি ক'রে, করুণ আর্তনাদে ডাকছে তাদের মা-মণিকে।

'বাছাদের এই দুর্দশা দেখে কার না বুক ফেটে যায়, কার না হৃদয় গলে যায় মায়ায়?'—কথাগুলি বলছিল এক শেয়াল, বলছিল একখানা পাথরে উঁচু হয়ে দাঁড়িয়ে, উপরের বাসাটির দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে। বলেই চলছিল আরো—

'বন্ধুগণ, এই বিপদের সময় এমন কচিকচি শিশুদের ত্যাগ ক'রো না তোমরা। প্রত্যেকেই কিছু-না-কিছু এনে দাও এই অভাগাদের,—যে যা পারো। এমন করেই ওদের বাঁচিয়ে রাখো। দয়ামায়ার চেয়ে ভালো কাজ আর কী বা হতে পারে?

'এসো কোকিলভাই, একটুখানি বুদ্ধিশুদ্ধি দেখাও এবার! তোমার সপ্তম স্বরে চতুর্দিক দশদিগন্ত তুমি জাগিয়ে তোলো, তা তো জানিই আমরা। এবার একটু কাজের কথায় এসো; তোমার কিছু পালক খসিয়ে বাহারে একখানি পালকের গদি বানিয়ে দাও,—অবশ্যি ও থেকে ব্যক্তিগতভাবে তোমার কোনো লাভ হবে না তা ঠিকই।

'এই যে পায়রা ভায়া, আকাশটা তো খুব চক্কর মেরে বেড়াও। এখন ওসব একটু রাখো না ভায়া, মাঠে ময়দানে ঘুরে ফিরে কিছু খাবার নিয়ে এসো, তা থেকে বাছাদেরও খাবার ভাগ দাও।

'তুমি ঘুঘুগিন্নি, তোমার বাচ্চারা তো এবারে ডানা মেলেছে, ওদের খাবারটা নিশ্চয়ই ওরা যোগাড় করে নিতে পারবে। ওদেরকে এখন ওই বাসা ছেড়ে দিয়েই এসো না; এসে এদেরি মা হও। তোমার ওই বাচ্চাদের ভগবানই দেখবেন।

'হ্যারে, এই তো চাতকদিদি ! ওদের খাবার মতো কিছু পোকামাকড় ধরে আনো না। আহা, মা-হারা শিশু সব, ওদেরও তো একটুখানি আদর করে খাওয়ানোটা চাই।

'এই তো দোয়েলদাদা, তুমি তো জানো তুমি কাছে এলে সবাই কী খুশি! যখন মলয় এসে দোল দিতে থাকবে ছোট্ট বাসাটিতে, তখন তুমি বাছাদের ঘুম পাড়িয়ে দাও তোমার ঐ মিষ্টি স্বরের গানে গানে।

'সবার এমন আদর-যত্ন পেলে আমি হলফ করে বলতে পারি—ওরা ভুলে যাবে ওদের যত দুঃখ! আমি যা যা বলছি করো তোমরা। এই বনে বাদাড়েও আছে কত দয়ামায়া আছে কত প্রাণ—দেখাও একটিবার দেখিয়ে দাও তোমরা, দেখিয়ে দাও যে—'

—এতটা যখন কেবল বলেই চলেছে, ওদিকে বাচ্চারা বাসায় তখন ক্ষিদের জ্বালা আর সহ্য করতে পারছে না; চিঁচি করতে করতে আর ঠোঁট ফাঁক করতে করতে বাসাটার কিনারায় উঠে আসতেই, টুপটুপ করে পড়ে গেল নিচে—শেয়ালের একেবারে কোলের কাছে। আর শেয়ালও অমনি মধুর যত বাণী বন্ধ করে সব কয়টিকেই খেয়ে ফেলল টপাটপ।

—গল্পটা শুনে দুঃখিত হ'লে তো? তা, সত্যিই যে দয়ালু সে কিন্তু কেবল বক্তৃতা দিয়েই সময় নষ্ট করে না, নীরবে কাজ করেই দেখায় তার দয়ামায়া। অন্যের উপর ভার দিয়ে দয়ালু সাজা যায়, দয়ালু হওয়া যায় না।

## ॥ সে এক মহাবল পিপীলিকা ॥

এক সময় ছিল এক মহাবল পিঁপড়ে, সৃষ্টির প্রথম দিন থেকে শুরু করে আজো পর্যন্ত তাঁর সমকক্ষ কেউ জন্মায়নি কখনো। সে কিনা [ প্রাচীন পুরাণ-কাহিনী থেকেই জানতে পেরেছি ] অনায়াসেই তুলে ধরে দু-দুটো মটর-দানা! আর, যদি সাহসের কথা বলো তো, কোনো পোকামাকড়ের দিকে দু-দুবার চেয়ে দেখবার তার দরকার হয় না—পলক ফেলতে না ফেলতেই সাবাড়! একটা মাকড়কে সে ঘায়েল করবে কিনা একাই!

দেখতে দেখতে এত তার নামডাক হ'ল যে উঁইচিপির জগতে রাতদিন সবার মুখেই কেবল তারি কথা।

তা, অতি-প্রশংসা হল বিষতুল্য। অথচ, আমাদের এই পিঁপড়ের চরিত্রটি সেকথাটি বুঝবার মতো নয়, প্রশংসা শুনে শুনে সে বরং মহাখুশি। আত্মগরিমা তার এতটা বেশী হ'ল যে প্রত্যেকটিপ্রশংসাবাক্যই সে মনে করত অভ্রান্ত সত্য। শেষপর্যন্ত সম্মানের বোঝায় তার বুদ্ধিশুদ্ধি এতটা চাপা পড়ল যে, এবার সে স্থির করল শহরে গিয়েই নিজেকে জাহির করবে—সেখানে নিজের শক্তির দৌলতেই প্রতিষ্ঠা করবে নিজেকে।

একদিন সে প্রকাণ্ড এক খড়ের গাড়ীতে চড়ে, উঠে বসল খড়ের গাদার একেবারে মাথাটিতে,—শহরে চলল ঠিক যেন এক মহামান্য রাজবাহাদুর! কিন্তু একি, তার সাধের গুড়ে এমন বালি! সে ভেবেছিল নানাদিক থেকে ছুটে আসবে কত না লোকজন—সারাটা শহরেই বেধে যাবে সে এক হৈ হৈ রৈ রৈ কাণ্ড! কিন্তু কেউই তাকে তো চেয়ে চেয়ে দেখছেও না—যে যার কাজে ব্যস্ত!

আমাদের এই পিঁপড়ে বাহাদুর এবার মাটিতে একটা পাতা দেখতে পেয়েই নেমে পড়ল একলাফে, পাতাটাকে ধরে টেনে নিয়ে চলল স্বুড়স্বুড় ক'রে। লাফটি হ'ল ঠিক দেখবার মতোই,—কিন্তু কেউই চেয়ে দেখল না, কারোই নজর নেই এদিকে! তার জানা সবরকম কসরৎ দেখানোই শেষ হয়ে গেলে একান্ত বিরক্তিভরে সে গাড়ীর পেছনের চাকর-ছোকরাটাকে ডেকে বলল—'এই শহরের লোকগুলো হ'ল বোকা আর কানা—হঁ্যা, একথা বললে অন্যায়-কিছু বলা হয় না। সেকি কথা! এতসব কসরৎ দেখালাম, সেজন্যে তো সবারি কর্তব্য ছিল আমাকে একটু উঁচু নজরে দেখা। তা, আমাদের সেই ঢিঁপির জগতে কিন্তু সক্কলেই আমাকে চেনে একডাকে!'

## ॥ পাতা ও শিকড় ॥

এক গ্রীষ্মের দিনে প্রান্তরের উপরে পড়েছে ছায়া। একটা গাছের পাতারা হাওয়ার কাছে মৃদু মর্মর-ধ্বনি তুলে বলাবলি করছিল তাদের নিজেদেরি গর্বের কথা, বলছিল—কী গাঢ় সবুজ তাদের রং, স্তবকে স্তবকে সঘন পল্লবে কেমন সাজগোজ। যেসব কথা তারা বলাবলি করছিল তা এইরূপ:

সারাটা প্রান্তরে আমাদের মতো সুন্দর কে আর? এই যে গাছের নিখুঁত রূপরেখা এসব তো এঁকে রেখেছি আমরাই: সৃজন করেছি তার গোলগাল

চেহারাটি—শান্ত-সুন্দর মূর্তিটি। না না, আমরা ছাড়া গাছ তো কিছুই নয়। তাহ'লে যদি একটু আত্মপ্রশংসা করি তো কী আর এমন অন্যায়টা? আমরাই তো দুপুরের ঝাঁঝ থেকে বাঁচাই গাছকে, আমরাই তো পথিকদের আশ্রয় দেই শীতল ছায়ায়, আমাদের খুশির টানেই তো পল্লীবালারা নাচতে নাচতে চলে আসে আমাদের সবুজের দেশে। এখানেই তো সকালসন্ধ্যা কী মধুর গান গায় দোয়েল ও বুলবুল। আর মলয়দেব বলেন—আমাদের সঙ্গে খেলতে তাঁর কী আনন্দ!

এমন সময় মাটির নিচ থেকে শোনা গেল কাদের কণ্ঠস্বর—'আমাদের জন্যেও একটুখানি ধন্যবাদ জানালে কি অন্যায় হ'ত?'

'কে? কাদের এমন বুকের পাটা আমাদের মুখের উপরেইবলে এমন দম্ভের কথা! বলো, বলো কে তোমরা? আমাদের সঙ্গেই কিনা সমান দাবীর কথা তুলছ? ভণ্ডামির আর জায়গা পাওনি?'—গাছের পাতারা এই বলে ফরফর করতে লাগল।

'আমরা? আমরা কারা? দিনের আলোর আড়ালে যারা মাটির গভীর খুঁড়ে খুঁড়ে বাঁচিয়ে রাখে তোমাদের। যে গাছটির গায়ের উপরে বেঁচে আছ তোমরা পাতারা, সেই গাছেরই শিকড়দের চেন না? তাদেরি এত আলাদা ক'রে, নিচুচোখে দেখছ? আবারো ফিরে আসবে নববসন্ত, নতুন পাতারা আনন্দে ঢেউ তুলবে ডালে-ডালে—কিন্তু একটিবার যদি শুকিয়ে যায় শিকড় এই গাছও থাকবে না, তোমরাও না।'

## ॥ গর্দভচন্দ্র ও তার গলঘণ্টা ॥

এক কিষাণ একটা গাধা পুষত, আর গাধাটাই তার সব কাজকর্ম করে দিত অতি চমৎকার। গাধাটির কর্তামশাই তো প্রশংসায় পঞ্চমুখ। তবুও তার মনে হ'ত, যথাযোগ্য প্রশংসা করা হ'ল না। এবং এহেন গর্দভ-রত্ন যদি বনে-জঙ্গলে পথ হারিয়ে ফেলে, সেই ভয় হ'ল তার। একদিন সে তাই গাধাটির গলায় একটা ঘণ্টা বেঁধে দিল, আর সেই ঘণ্টাটা সারাটা পথে-ঘাটে টুংটাং বাজতে লাগল।

এবারে কিন্তু গর্দভচন্দ্রের বেশ গর্ব হ'ল—তার হাবভাব হালচাল বেশ পালটে

গেল। (তা, তোমরা বুঝতেই পারছ, পদকে বা উপাধিতে বিভূষিত হ'লে কিরকমটা হয় গর্দভচন্দ্র তা নিশ্চয়ই শুনে থাকবে)। তার স্পষ্ট বোধ হ'ল—এখন থেকে তার এই জীবন স্বদেশের উদ্দেশেই উৎসর্গীকৃত! তা, উচ্চশ্রেণীতে উঠতে পেলে যেমন কিনা জেগে ওঠে এক ধরণের মিশ্র-সুখের অনুভূতি (এবং যারা গর্দভ নয়, তাদের বেলায়ও যেমনটা হয় আর কি)!

আমার বলা উচিত এই সেদিন পর্যন্তও—এই গর্দভটির দিকে কারো কোনো নজরই পড়েনি। কিন্তু যেদিন সে ঐ পদক-সম্মান পেল সেদিন থেকেই তার ভিতরে যে-কোনোরকমের দ্বিধা-দ্বন্দ্বেরই প্রয়োজনটা ফুরিয়ে গেল। সরাসরিই সে চড়াও হতে লাগল অন্যের ধান কি গমের ক্ষেতে, এমনকি কারো বাড়ীর পিছনের সব্‌জিবাগানেও! পেটটি পুরে খাওয়াটি সেরে সে চলে যেত ধীরেসুস্থে হেলেদুলে। কিন্তু বিভূষণ ঘণ্টাটির কথা ঐ যাঃ, তাই বলতেই ভুলে গিয়েছি। বেচারা গর্দভচন্দ্র এক পা এগোয় তো তার গলার ঐ সম্মানসূচক পদকটিও জানান দেয় উচ্চরবে। আর, লাঠিসোটা নিয়ে ধেয়ে আসে কিষাণরা—ধান-গমের ক্ষেত থেকে তাড়া লাগায় হৈ-হৈ শব্দে। প্রতিবেশী কিষাণরাও শুনতে পায় সোরগোলঃ তাদের ক্ষেতেও না ঢোকে তাই হাতের কাছে যা পায় তাই দিয়েই পাঁজরে গুতো লাগায় দমাদ্দম! আর, এইভাবেই পতন ঘটল আমাদের হতভাগ্য ঐ বিখ্যাত গর্দভটির—এবং শেষপর্যন্ত একটা চামড়া ও কতকগুলি হাড়গোড় ছাড়া গর্দভ বলতে তার কিছুই আর বাকী রইল না।

—আমাদের নাগরিক জীবনেও তো আমরা দেখে থাকি বদলোকের অমন দশাই ঘটে থাকে শেষ অবধি। যতদিন থাকে তারা দরিদ্র কি নিচুস্তরের লোক আপনাদের নজর হয়ত এড়িয়েও যেতে পারে বা, কিন্তু বদলোকের জীবনে সম্মানের পদ হ'ল কিনা ওই গলঘণ্টারই মতো! আর, তা যা আওয়াজ তোলে চলে যায় বহুদূর পর্যন্ত। আর, তা উচ্চরবে প্রচার করতে থাকে তাদের আসল পরিচয়টা—তাদের সত্যিকার কীর্তিকাহিনী।

## ॥ শুয়োর ॥

রাজাবাবুর বাড়ীর পিছন-দিকটায় একদিন যে করেই হ'ক, ঢুকে পড়ল এক বরাহ অর্থাৎ কিনা শুয়োর। বাসন-মাজার জায়গাটা একবার নজর করে দেখল, গোয়ালের চারদিকটা ঘুরে বেড়াল উঁকি মেরে মেরে, তারপর কিনা নোংরা কাদাজলে গড়াগড়ি খেল, এবং দুর্গন্ধ ভাগাড়ে গা মাখামাখি করল মনের সাধ মিটিয়ে—অর্থাৎ কিনা এসব ব্যাপারে শুয়োরদের যতখানিতে পরিপূর্ণ তৃপ্তি হয় আর কি! এতসবের পর তার আর চাড় রইল না আরো কিছু ঘুরেফিরে দেখবার। যতখুশি শুয়োতুর্মি করে হেলেদুলে এবার সে ফিরে চলল তার বাড়ীর দিকে।

পথেই দেখা বলাইবাবুর সঙ্গে, সে জানতে চাইল—'এবার বলো তো শুয়োরভাই, ওই যে জমকালো বাড়ীটা—ওখানে কী কী দেখে এলে? সব্বাই বলে, ওখানে ঘরের পর ঘরে সবকিছুই নাকি সোনা-হীরা-জহরতে তৈরী। সবকিছুই ঝলমল ঝলমল করছে আনন্দে, এবং একের পর একটা ঘর চমৎকার—আরো চমৎকার, আরো! আর, দেয়ালে দেয়ালে কত কী সাজানো!'

শ্রীযুক্ত শুয়োর কড়ামেজাজে ঘোঁৎ ঘোঁৎ করতে করতে বলে উঠল—'তা দেখো, লোকে কী না বলে? যত্দূর চোখ চলে, আমি তো দেখলাম—দেখবার মতো কী আর আছে? কিচ্ছু না! হ্যাঁ, তা আছে বটে—আছে ভাগাড়; আর আছে গোবরস্নারের ঢিবির পর ঢিবি! তা বুঝলে হে, আমি নাক উঁচিয়ে বসেই ছিলাম না, ওই স-ব কিছুই দেখতে বাকী রাখিনি—বাড়ীর পিছনটার সবখানাই চষে বেড়িয়েছি।'

: আমি লেখকরূপে আমার কোনো কথা দিয়ে কাউকেই আহত করতে চাই না। তবে, যে বিষয়েই সমালোচনা করুন না কেন, সমালোচক যদি দেখতে পান শুধু বদ ও নোংরাটুকুই—আর-কিছু দেখবার মতো চোখ যদি না থাকে তো, তাকে ঐ শুয়োর ছাড়া কী বা বলা যায়, আপনারাই বলুন।

---

*বদ্‌সমালোচকদের নোংরামির বিরুদ্ধে লেখকরূপে এই একটিমাত্র জবাবই দিয়েছিলেন আইভান ক্রিলভ।

# * আলেকজান্দ্‌র পুশ্‌কিন *

১৭৯৯—১৮৩৭ খ্রী·

প্রাক-বিপ্লব রুশ সাহিত্যের সর্বাগ্রগণ্য আধুনিক সাহিত্যিক হলেন পুশ্‌কিন : মুখ্য পরিচয়ে কবি হলেও একাই রুশ সাহিত্যের ভাণ্ডারে দান করেছেন কবিতা ও কাব্যোপন্যাস, উপন্যাস, ছোটগল্প ও বড়গল্প, এমনকি বিদ্রোহের ইতিহাস !

পুশ্‌কিনের জন্ম হয় মস্কোতে প্রাচীন এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে, ৬ই জুন ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দে। প্রাথমিক শিক্ষা এক ফরাসী আদলের বিদ্যালয়ে, রাজধানী-দস্তুর বিদেশী সাংস্কৃতিক আব-হাওয়ায় ; পরে সাহিত্য-শিক্ষায়তনে। ফরাসীভাষায় কবিতা লেখেন মাত্র সাতবছর বয়সে, নাটক লেখেন নয় বছর বয়সে ! বৈদেশিক মন্ত্রীর কার্যদপ্তরে চাকুরী-কালেই লেখা সুরু হয় এঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'রুসলাম ও লুদামিলা।' রাজধানী মস্কোর ফ্যাশানদস্তুর সমাজে কবি বেশীদিন মগ্ন থাকেননি, শীঘ্রই বিপ্লবী সাহিত্যিক-গোষ্ঠীতে যোগ দেন এবং এঁর 'স্বাধীনতার প্রশস্তি'-প্রমুখ কবিতা ছড়িয়ে পড়ে আগুনের মতো। এর ফলে জার-শাসকের বিচারে নির্বাসিত হন দক্ষিণ রাশিয়ায় ; এখানেই গুণীবন্ধু রায়েভস্কি-র কাব্যোৎসাহে এবং রাজধানীর অভিজাত-সমাজের বাইরে এসে ও ককেশাশের অপূর্ব-সুন্দর পল্লীজগতের প্রাণস্পর্শে কবিমন মুখর হয়ে

ওঠে অবিরাম কাব্যকাকলিতে—একে একে রচিত হয়: 'বক্‌সিচারির ঝর্ণাঝোরা' 'ককেশাশের বন্দী' 'জিপসী' কাব্য। তবে, কবির সর্বশ্রেষ্ঠ কাব্য তথা কাব্যোপন্যাস হ'ল 'ইয়েভ্‌নি ওনেগিন', বড়গল্প 'ইশকাবনের বিবি' এবং ছোটগল্পমালা 'বেল্‌কিনের গল্প' (এখানে আছে ওই বইয়েরই একটি গল্প), উপন্যাস 'ক্যাপ্টেন-কন্যা', ইতিহাস-গ্রন্থ 'গুচানেভ বিদ্রোহের ইতিহাস'।

পুশ্‌কিনের বহু সাহিত্যিক বন্ধু এবং গুণী বান্ধবী ছিলেন; স্ত্রী ছিলেন বিশেষ সুন্দরী, এবং এই স্ত্রীকে কেন্দ্র করেই প্রতিক্রিয়াশীল অভিজাত সমাজের কিছু ব্যক্তি ফরাসী মস্তক-এ এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি করে যাতে পুশকিন আত্মসম্মান রক্ষার্থেই তখনকার প্রথামতো দ্বন্দ্বযুদ্ধে নামেন এবং বরণ করেন সাংঘাতিক মৃত্যু, মাত্র আটত্রিশ বছর বয়সে।

রুশ ভাষা-সাহিত্যে সবচেয়ে মধুর ও মার্জিত-সুন্দর গীতিকবিতা সর্বপ্রথম রচিত হয়েছে পুশকিনেরই কলমে। এঁর ভাষার অনাড়ম্বর সৌন্দর্য, প্রাণময় রূপ, পল্লী-প্রকৃতির চিত্রায়ন, এবং সর্বোপরি সুগভীর দেশপ্রীতি সবচেয়ে উল্লেখজনক বৈশিষ্ট্য। পুশকিন রুশ সাহিত্যের সমৃদ্ধিযুগের অগ্রণী লেখক—ইতালীর দান্তে, জার্মানীর গ্যেয়টে এবং বাংলার রবীন্দ্রনাথের মতোই এঁর আসন রুশ সাহিত্যের সর্বোচ্চ-সীমায়। কবি তাঁর সাহিত্যে দান সম্পর্কে 'স্মরণী' কবিতায় নিজেই বলেছেন:

একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে রাশিয়ার
যুগে যুগে শত ভাষায়-গাথায় গাঁথা রবে মোর নাম
তাতার ফিনীশ আর গর্বিত শ্লাভদেশে
অশ্বারোহী যত কালমুখদের পথে পথে উদ্দাম।

## ॥ পোস্টমাষ্টার ও তাঁর মেয়ে ॥

আঠের শ' ষোল-র মে মাসে কোনও এক [অর্থাৎ 'এক্স'] অঞ্চলে গিয়ে পড়েছিলাম একেবারেই হঠাৎ, কিন্তু যে পথে গিয়েছিলাম তা আজ আর বর্তমান নেই।…

দিনটা ছিল খুবি গরম। ঐ 'এক্স' স্টেশন থেকে মাইল দুয়েক গিয়েছি কি, শুরু হ'ল ঝিরঝির বৃষ্টি ; আর দেখতে দেখতে প্রবল বর্ষণে আমি তো ভিজে ঢোল। স্টেশনে পৌছেই আমার পয়লা-নম্বর কাজ হ'ল যত তাড়াতাড়ি হয় পোশাক পালটানো, তারপর এককাপ চা দিতে বলা। পোস্টমাষ্টার হাঁক দিলেন—'এই দুনিয়া! কেৎলিটা গরম করে কিছুটা মাখন নিয়ে আয়।' এই কথার সঙ্গে সঙ্গেই একটি চতুর্দশী কি পঞ্চদশী কন্যা বেরিয়ে এল ঘরটাকে ভাগ-করা পাঁচিলটার ওপাশ থেকে…

পোস্টমাষ্টারকে জিজ্ঞেস করলাম—'আপনার মেয়ে?' সোৎসাহে বললেন —'হ্যাঁ, আমার মেয়ে, ঠিক ওর মায়ের মতো! কী চটপটে, আর কী বুদ্ধিমতী!' উনি তখন আমার সব চাহিদাই পূরণ করতে লেগে গেলেন, আর আমি নজর করে দেখতে লাগলাম সাদাসিধে সেই ছিমছাম ঘরটির দেয়ালে দেয়ালে টাঙ্গানো ছবিগুলি। ছবিগুলির বর্ণনীয় বিষয়টি ছিল বাইবেল-কথিত উড়নচণ্ডে পুত্রের কাহিনী। প্রথম ছবিটিতে শ্রদ্ধাভাজন বৃদ্ধপিতা বিদায়-সম্ভাষণ জানাচ্ছেন এক অস্থির-স্বভাব তরুণকে,—তরুণটি তাড়াতাড়ির ভঙ্গীতে গ্রহণ করছে বৃদ্ধের আশীর্বাদ এবং একই সঙ্গে থলে-ভর্তি টাকাটা! আর একটি ছবিতে বিশদভাবে এবং স্পষ্টরূপেই দেখানো হয়েছে তরুণটির মনের যা অস্থির অবস্থা : বসে আছে সে, আর তার চারপাশে টেবিলটা ঘিরে যতসব ভণ্ড বন্ধুদল ও নির্লজ্জ মেয়েরা। তার পরের ছবিটা হ'ল এক বিধ্বস্ত তরুণের : পরণে ছেঁড়া জামাপ্যাণ্ট, ছেঁড়া টুপি ; শুয়োর পুষছে, খাচ্ছেও তাদেরি খাবার! তার চোখেমুখে কী দুঃসহ যন্ত্রণার ও পাপের দহন-চিহ্ন! চিত্রগুলির শেষটিতে দেখা যাচ্ছে পিতার কাছে ফিরে এসেছে পুত্র, আর পিতা অমনি ছুটে গিয়েছেন পুত্রকে অভ্যর্থনা জানাতে ; সজ্জন সেই বৃদ্ধটির পরণে কিন্তু তখনো সেই বিদায়-রজনীর পোশাক ও টুপি! উড়নচণ্ডে পুত্র এবার পিতার পদতলে

সতজায়। পিছনে ছবিটার পটভূমিতে দেখা যাচ্ছে : বাড়ীর পাচক কোরবানি করছে একটি মোটাসোটা বাছুরকে, আর ছেলেটির বড়ভাই ভৃত্যদের কাছে জানতে চাইছে বাড়ীতে এই আনন্দ-উৎসবের কারণটা কী? প্রত্যেকটি ছবির তলায়ই জার্মান ভাষায় লেখা যথাযোগ্য যুগল-পংক্তি কবিতা।—এই সবকিছুই এখনো আমার মনে আছে স্পষ্ট, আর সেইসঙ্গেই আমার চারপাশের সেই পরিবেশ ও পাত্রভরা সুস্বাদু খাবার, আর ঝলমল ছককাটা পর্দা এবং অন্যান্য সবকিছুই। এখনো আমার সামনে দেখতে পাচ্ছি সেই গৃহকর্তাকে : বয়স হবে বছর পঞ্চাশেক, নিটোল স্বাস্থ্য, হাসিখুশি ; সবুজরঙের কোটের উপর থেকে ঝুলছে ফ্যাকাশে-রঙের ফিতেয় বাঁধা তিনতিনটে পদক।

বুড়ো কোচোয়ানকে তার ভাড়াটা চুকিয়ে দিয়ে ফিরতে না ফিরতেই দেখি, দুনিয়া এসে গেছে—বড় একটা কেৎলি হাতে। একটু 'ছেনালী' ধরণের এই কিশোরীটির।কিন্তু বুঝে নিতে মোটেই দেরী হ'ল না যে আমার উপরে সে বেশ একটা ছাপ ফেলতে পেরেছে। তার বড় বড় নীল দুটি চোখ সলজ্জভাবেই সে আনত রাখছিল। তার সঙ্গে আমি আলাপ সুরু করলাম, সে কিন্তু বিব্রত না হয়ে বরং আমার সব কথারই জবাব দিতে লাগল,—যে মেয়ে দুনিয়ার অনেক কিছুই দেখেছে ঠিক যেন তারি মতোই। আমি ওর বাবাকে খেতে দিলাম একগ্লাস দামী সুরা, আর দুনিয়ার হাতে দিলাম এককাপ চা। তারপর তিনজনে মিলে এমনভাবে বকবক করতে লাগলাম যেন আমরা এ-ওর কতদিনের চেনা!

ঘোড়া তৈরী, কিন্তু পোস্টমাষ্টার ও তার মেয়েকে ছেড়ে যেতে মন উঠছে না। শেষটায় ওদের কাছ থেকে বিদায় নিলাম, বাবা আমার শুভযাত্রা কামনা করলেন, আর মেয়েটি আমাকে গাড়ী পর্যন্ত এগিয়ে দিল। আমি গাড়ী-বারান্দায় এসে থেমে দাঁড়ালাম, দুনিয়াকে একটিবার চুম্বন করার অনুমতি চাইলাম। দুনিয়া সম্মত হ'ল···মনে মনে দিলাম চুম্বনের পর চুম্বন।

এহেন আনন্দ উপভোগ করেছি অনেকবারই, কিন্তু আর কোনো ঘটনাই তো জাগিয়ে রাখেনি এমন মোহন-মধুর এক চিরঞ্জীব স্মৃতি!

কয়েক বছর চলে গেল ; ঘটনাচক্রে আমি আবার এসে পড়লাম ঠিক সেই জায়গায় এবং ঠিক সেই পথে। পোস্টমাস্টারের মেয়েটি সারাটা মন জুড়ে ছিল, এবং তার সঙ্গেই আবার দেখা হচ্ছে ভেবে খুবি আনন্দ হতে লাগল। পরেই ভাবলাম বৃদ্ধ পোস্টমাষ্টার হয়ত কাজ থেকে বরখাস্ত হয়েছেন, আর দুনিয়ারও বোধ হয় ইতিমধ্যে বিয়ে হয়ে গেছে। দুজনের যে কোনো একজনের মৃত্যুও তো

হতে পারে—একথাটাও মনের মধ্যে একবার ঝলক দিয়ে উঠল। তারপর আমি নানারকম আগাম দুর্ভাবনা ভাবতে ভাবতে এগিয়ে চললাম পোস্টিং-স্টেশন এক্স-এর দিকে।

ঘোড়ার গাড়ীটা এসে দাঁড়াল পোস্টমাষ্টারের ছোট্ট বাড়ীটির সামনে। ঘরের মধ্যে ঢোকামাত্রই চিনতে পারলাম সেই উড়নচণ্ডে পুত্রের বর্ণনামূলক ছবিগুলি। সেই একই জায়গায় দাঁড়িয়ে রয়েছে টেবিলটা আর বিছানা, কিন্তু জানলার তাকে নেই ফুলগুলি। ঘরের সবকিছুতেই যেন অবজ্ঞা ও অবহেলার ছাপ। ভেড়ার চামড়ার একটা কোট গায়ে জড়িয়ে ঘুমিয়ে ছিলেন পোস্টমাষ্টার, আমার আগমনে জেগে উঠলেন, উঠে বসলেন···হ্যাঁ, ইনিই তো সেই পোস্টমাষ্টার সাম্সন ভিরিন, কিন্তু এ কী বুড়ো চেহারা! তিনি যখন আমার সব নির্দেশ পালন করছিলেন, আমি নজর করে দেখছিলাম শাদা হয়ে উঠেছে তাঁর মাথার চুল। দাড়ি-গজানো গালে ভাঁজ পড়েছে বেশ, নুয়ে পড়েছে ঘাড়! তিন কি চার বছরের মধ্যেই একটি হৃষ্টপুষ্ট বলিষ্ঠ পুরুষ কী করে এমন এক রোগাটে বুড়োতে রূপান্তরিত হতে পারে সেই বিস্ময় আমার চোখেমুখে ঢাকা রাখতে পারলাম না। জানতে চাইলাম—'আমাকে চিনতে পারছেন না? আপনি ও আমি তো পুরানো দোস্ত।'

'হয়ত হবে। এই পথটা খুবি সরগরম, কত পথিকই তো এসে থাকে এখানে।'

'আপনার দুনিয়া আছে কেমন?'--আমি বলে চললাম।

বৃদ্ধ ভ্রূকুটি করলেন—'তা, ভগবানই জানেন।'

'তাহ'লে, তার বিয়ে হয়ে গেছে?'

আমার প্রশ্নটা শুনতেই পাননি এমন ভাব করলেন বৃদ্ধ, বিড়বিড় করে পড়ে চললেন আমার নির্দেশনামার কাগজপত্র। আমি প্রশ্ন করা থেকে বিরত হলাম, কেৎলিটা বসাতে বললাম। আশা, সুরাপাত্রই আমার পুরোনো বন্ধুর মুখ খুলে দেবে।

ভুল করিনি আমি। বৃদ্ধ আমার পরিবেশন-করা সুরাপাত্র প্রত্যাখ্যান করলেন না। লক্ষ্য করছিলাম, দামী সুরা কেমন করে মুছে দিচ্ছে তাঁর বিষণ্ণভাব। দ্বিতীয় গ্লাস খেতেই তিনি কথা সুরু করলেন—যেন, কে আমি তা স্মরণে আনছেন, কিংবা স্মরণে আনার ভাব করছেন। আর তখন, আমি

তাঁর মুখ থেকেই শুনতে পেলাম এমন এক কাহিনী—যা আমাকে আকৃষ্ট করে রাখল, আলোড়িত করল আশ্চর্যভাবে।

'তাহ'লে, আপনি জানতেন আমার ছুনিয়াকে? তা কে-ই বা তাকে জানত না! ও আমার ছুনিয়া, ছুনিয়া রে! কী এক মেয়েই ছিল সে। যে-ই যখনি এখানে এসেছে তো মুখে মুখে ছুনিয়ার প্রশংসা—কেউই তো তার বিরুদ্ধে টুঁ শব্দটিও কখনো করেনি। ভদ্রমহিলারা তাকে উপহার দিতেন কত রকমের জিনিষ—কেউ দিতেন রুমাল, কেউ বা কানের দুল। ভদ্রলোকেরাও এই পোস্টিং স্টেশনে এলে ইচ্ছে করেই এখানে থামতেন, যেন দুপুরের বা রাতের খাবারের তাগিদেই, কিন্তু আসলে কিনা আমার মেয়েকে আর দুদণ্ড দেখতে পাবেন তো! কোনো ভদ্রলোক—তা তিনি যত বদরাগীই হন না, ওকে দেখলেই ঠাণ্ডা হয়ে যেতেন, নরম সুরে কথা বলতেন ওর সঙ্গে। আপনি হয়ত বিশ্বাস করতে চাইবেন না, জরুরী বার্তা-বাহক কিংবা সরকারী কোনো দূত এলে আধঘণ্টার জন্যে হলেও ওর সঙ্গে কথা না বলে থাকতে পারতেন না। আমার বাড়ীঘরের সবকিছুরি একমাত্র নির্ভর ছিল ও—ঘরবাড়ী পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা, রান্নাবান্না সবকিছুর জন্যেই ওর সময়ের অভাব হ'ত না। আর, আমি এই বুড়ো হাবড়া, ওর দিক থেকে চোখ ফেরাতে পারতাম না। আমার আনন্দ উথলে উঠত ওরি মধ্যে। আমার ছুনিয়াকে আমি কতই না ভালোবাসতাম, ওকে নিয়ে পোষণ করতাম কত না আশা! সে কি এখানকার সহজ জীবনে সুখে ছিল না? কিন্তু কেউ তো প্রার্থনা করেও বিপর্যয়কে ঠেকাতে পারে না—নিয়তি থেকে রেহাই নেই কারোই!' এই বলেই পোস্টমাষ্টার শুরু করলেন তাঁর ছুর্ভাগ্যের বিস্তৃত বিবরণ:

তিন বছর আগে এক শীতের সন্ধ্যেবেলা, পোস্টমাষ্টার এক নতুন হিসেব-খাতায় রুলরেখা টানছিলেন, আর তার মেয়ে ভাগ-করা পাঁচিলটার ওপাশে বসে একটা পোশাক বুনছিল। আর তখনি এসে দাঁড়াল একটা 'ট্রয়েকা'—তিন ঘোড়ার গাড়ী। এক আগন্তুক-যাত্রী মাথায় সার্কাশীয় টুপি, গায়ে সামরিক বিভাগীয় জবর-কোট, গলায় মোটা মাফ্‌লার—ঘরে ঢুকেই তিনি জবরদস্ত ভঙ্গীতে বলে উঠলেন—'এক্ষুনি যাত্রীঘোড়া চাই আমার।'* কিন্তু সব কটা ঘোড়াই যে বাইরে। একথা শুনেই, আগন্তুকটি গলা উঁচিয়ে তুললেন, এবং সেই সঙ্গে তাঁর হাতের

---

* তখনকার দিনে পোস্টিং-ষ্টেশনের পোস্টমাষ্টারদের উপরেই দায়-দায়িত্ব ছিল ঘোড়া বা গাড়ী (মেইল গাড়ী) দিয়ে যাত্রীদের যাতায়াতের ব্যবস্থা করা।

চাবুকটা। দুনিয়া তো এমনধারা দৃশ্যের সঙ্গে খুবি পরিচিত, অমনি ছুটে এল ঘর-ভাগ করা পাঁচিলটার ওপাশ থেকে, আগন্তুক যাত্রীকে সম্বোধন করল বিনীত-মধুর কণ্ঠে, জানতে চাইল—তিনি কিছু খাবেন তো? দুনিয়ার উপস্থিতি ঠিকঠিক বিস্তার করল তার প্রভাবটি। কোথায় গেল আগন্তুক যাত্রীটির ক্রোধ! ঘোড়াগুলো ফিরে না আসা পর্যন্ত তিনি অপেক্ষা করতে সম্মত হলেন এবং রাতের খাবারের ব্যবস্থাও করতে বললেন; ভিজে লোমশ টুপিটা খুলে রেখে, মাফলারটা ছাড়িয়ে নিয়ে, বিরাটাকার কোটটা দূরে ছুঁড়ে ফেললেন। এবার দেখা গেল আগন্তুকটি হলেন এক তরুণ অশ্বারোহী বিভাগের অফিসার—পাৎলা চেহারা, কালো গোঁফজোড়ায় মানিয়েছে বেশ। পোস্টমাষ্টারের বাড়ীতে নিজেকে তিনি বেশ মানিয়ে নিলেন সহজেই, এবং দেখতে দেখতে আলাপ জুড়ে দিলেন পোস্টমাষ্টার ও তাঁর মেয়ের সঙ্গে। পরিবেশন করা হ'ল রাতের খাবার। ইতিমধ্যে এসে গেছে ঘোড়াগুলি, এবং পোষ্টমাষ্টারও এই সৈনিক-যাত্রীটির গাড়ীতে ঘোড়াগুলি যুতে রাখবার নির্দেশ দিলেন—এমনকি ঘোড়াগুলিকে খাওয়াবার আগেই। তারপরেই সৈনিকটির ঘরে ঢুকে দেখেন: বেঞ্চির উপরে শুয়ে আছেন নিঃসাড়। জ্ঞান আছে কি নেই, মাথায় খুব যন্ত্রণা। যাত্রা সুরু করবার কথাই ওঠে না।……এখন, কী আর করা যায়! পোস্টমাষ্টার তাঁকে ছেড়ে দিলেন নিজের বিছানাটা; স্থির হ'ল কালকের মধ্যে রোগী যদি ভালো না হয় তো অষুধ আনতে পাঠাতে হবে শহরে বদ্যির কাছে।

পরদিন তরুণটির অবস্থাটা আরো খারাপ হ'ল। তার সঙ্গী চাকরটা কাছের শহরে ছুটে গেল অষুধের জন্যে। দুনিয়া অষুধ-জলে রুমাল ভিজিয়ে তরুণটির মাথায় জড়িয়ে দিল, তারপর তাঁর বিছানার পাশে বসে সেলাইয়ের কাজ করতে লাগল। পোস্টমাষ্টারের উপস্থিতিতে রোগী গোঙাচ্ছিলেন—কথাই বলতে পারছিলেন না যেন; তবে, কফি খেলেন দু-দু কাপ, দুপুরের খাবারের কথাও বললেন। দুনিয়া তো ওঁর বিছানা থেকে নড়েই না। তরুণটি বারবার জল খেতে চান, দুনিয়া নিজহাতে লেমনেড তৈরী করে এনে খাওয়ায়। রোগী তাঁর ঠোঁট ভিজান; আর যতবারই খাওয়াটা শেষ করে মগটা ফেরৎ দেন, কৃতজ্ঞতার ভঙ্গীতে মুঠোতে আকড়ে ধরে রাখেন দুনিয়ার হাতখানা। বদ্যি এলেন দুপুরবেলা। রোগীর নাড়ী পরীক্ষা করলেন, কিছু কথা বললেন জার্মান ভাষায়; জানালেন—রোগীর এখন দরকার হ'ল বিশ্রাম, এবং তাহলেই দু-চারদিনের মধ্যে যাত্রা সুরু করতে পারবেন মনে হয়। তরুণ সৈনিক-অফিসারটি ডাক্তারকে 'দর্শনী'

দিলেন পঁচিশ রুব্‌ল, এবং মধ্যাহ্ন ভোজনেও আমন্ত্রণ জানালেন। ডাক্তার সম্মত হলেন, এবং দুজনে মিলে সাধ মিটিয়ে খাওয়াদাওয়া করলেন, এক বোতল সুরা পান করলেন সবটাই। দুজনে এ-ওর উপরে ভারী খুশি।

আরো একটা দিন পার হ'ল। সৈনিকটি এবার সম্পূর্ণ সুস্থ। খুবি হাসিখুশি এবার, কথায় কথায় হাসিঠাট্টা চালাচ্ছেন—কখনো দুনিয়ার সঙ্গে, কখনো পোস্টমাষ্টারের সঙ্গে, শিস দিয়ে সুর ভাঁজছেন, আগন্তুক যাত্রীদের সঙ্গে গল্পসল্প চালাচ্ছেন, তাদের প্রসঙ্গটা পোস্টমাষ্টারের হিসাবখাতায় টুকে রাখছেন নিজেই। তিনি দয়ালু-স্বভাব পোস্টমাষ্টারটির এত প্রিয় হয়ে উঠলেন যে তার পরের দিনের পরদিন সকালেই যে এমন সুন্দর গৃহস্বামীর কাছ থেকে বিদায় নিতে হবে, তাতে বড়ই কষ্ট হচ্ছিল।

সেদিন ছিল রববার। গির্জায় যাবে তাই তৈরী হয়েছে দুনিয়া। আনা হয়েছে সৈনিকটির গাড়ীটা। তিনি বিদায় জানালেন পোস্টমাষ্টারকে,—তাঁর আহার ও বাসব্যবস্থার জন্যে পুরস্কৃত করলেন দরাজ হাতে। দুনিয়াকেও বিদায় জানালেন,—গ্রামের শেষপ্রান্তে অবস্থিত গির্জা পর্যন্ত তাকে এগিয়ে দেবার কথাটাও বললেন। দুনিয়া কেমন বিব্রত বোধ করছিল······তার বাবা বলে উঠলেন—'কিরে, ভয় কচ্ছিস কেন? উনি এক সম্মানিত ব্যক্তি,—নেকড়ে তো নয় যে তোকে কামড়ে ধরবে; গির্জাটা পর্যন্ত নিয়ে যান না।"

দুনিয়া গাড়ীটাতে উঠল বসল তরুণটির পাশেই, চাকরটা একলাকে উঠে বসল বাক্সাসনে। কোচোয়ান বাঁশী বাজাল,—জোরকদমে ছুটে চলল গাড়ী।

হতভাগ্য পোস্টমাষ্টার কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছিলেন না—কী করে তিনি তাঁর দুনিয়াকে যেতে দিলেন সৈনিকটির সঙ্গেই, কী করে এমনভাবে দৃষ্টি হারালেন,—তাঁকে পেয়ে বসেছিল কিসে?

আধঘণ্টা কাটতে না কাটতেই তাঁর বুকের মধ্যটায় কামড় মারতে লাগল, নানারকম দুর্ভাবনায় এতটা অভিভূত হয়ে পড়লেন যে আর স্থির থাকতে পারছিলেন না—সোজা গির্জায় চললেন দুনিয়ার সন্ধানে। গির্জার কাছাকাছি যেতেই দেখেন লোকজন ইতিমধ্যেই বেরিয়ে আসছে, কিন্তু দুনিয়া কই? গির্জার ভিতরেও নয়, বাইরেও নয়। গির্জার ভিতরে গেলেন। পুরোহিত চলে গেছেন আগেই, সহকারীটি মোমবাতিগুলি নিভোচ্ছে তখন, এককোণে দুজন মেয়েছেলে তখনো প্রার্থনা-বাণী আওড়াচ্ছে—কিন্তু দুনিয়ার দেখা নেই কোথাও! পোস্টমাস্টার অস্থিরচিত্তে এগিয়ে গেলেন সহকারীর কাছে জানতে যে দুনিয়া

প্রার্থনার সময় ছিল কিনা। তিনি জানালেন—না, ছিল না। পোস্টমাষ্টার যখন বাড়ী ফিরে এলেন, তাঁর তখন জীবন্মৃত দশা। একমাত্র আশা তখনো, তুনিয়া ঐ চঞ্চল-প্রকৃতি যুবকের সঙ্গে পরবর্তী স্টেশন পর্যন্ত গিয়ে থাকবে; ওখানেই তো রয়েছেন ওর ধর্ম-মা। গাড়ীর সঙ্গে পাঠানো ঘোড়াগুলি ফিরে আসার অপেক্ষা করতে লাগলেন—একান্ত অধীরভাবে। কিন্তু দিন শেষ হ'ল, কোচোয়ান তবু ফিরে এল না। অবশেষে, রাতের দিকে সে ফিরে এল একা,—মাতাল অবস্থা; নিয়ে এসেছে এক ভয়াবহ সংবাদ: পরবর্তী স্টেশন থেকেই অশ্বারোহী সৈনিক-অফিসারটির সঙ্গে চলে গেছে তুনিয়া!

বৃদ্ধ পোস্টমাষ্টার তুর্ভাগ্যের এই আঘাত আর সামলে উঠতে পারলেন না, সেই সন্ধ্যায়ই শয্যা গ্রহণ করলেন। এ সেই শয্যা—যেখানে প্রতারক তরুণটি শুয়ে ছিল এই গতকালও। সমস্ত ব্যাপারটার একটা সামগ্রিক চিত্র তুলে ধরে পোস্টমাষ্টার বুঝলেন যে ঐ তরুণের রোগটাই আসলে ভাণ! তারপর হঠাৎ এক প্রবল জ্বরে পড়লেন অসহায় পোস্টমাষ্টার, তাকে নিয়ে যাওয়া হ'ল হাসপাতালে। সেখানে চিকিৎসা করলেন সেই ডাক্তারটিই—যিনি দেখতে এসেছিলেন তরুণ সৈনিককে। এবার এই ডাক্তারই নিশ্চিত করে জানালেন যে সেই তরুণটি ছিল সম্পূর্ণ ই সুস্থ, এবং তার কুমতলবটাও তিনি টের পেয়েছিলেন ঠিকই, কিন্তু মুখ খোলেননি তাঁর চাবুকের ভয়ে। এই জার্মান ডাক্তারটি সত্যিকথা বলে থাকুন কিংবা তাঁর দৃষ্টিশক্তির বাহাদুরীটাই দেখিয়ে থাকুন, এই অসুখী রোগী ব্যক্তিটির কাছে তা কোনোই সান্ত্বনা জোগাতে পারল না। পোস্টমাষ্টার অসুখ থেকে সেরে উঠতে না উঠতেই কর্তৃপক্ষের কাছে চেয়ে নিলেন তু'মাসের ছুটি, এবং কাউকেই তাঁর মনের কথা না জানিয়ে পায়ে হেঁটে যাত্রা করলেন মেয়ের সন্ধানে। খাতা থেকে তিনি বার করে নিয়েছেন ঐ ক্যাপটেন মিন্স্কি রওনা হয়ে এসেছেন স্মল্নেস্ক্ থেকে পিটার্সবুর্গে। তাঁর সেই কোচোয়ান বলেছে—সারাটা পথ কেবলি কেঁদেছে তুনিয়া, যদিও মনে হচ্ছে স্বেচ্ছায়ই চলে গেছে সে। পোস্টমাষ্টার ভাবছিলেন—'ঈশ্বরের ইচ্ছা হ'লে, আমার পথহারা মেষ-শিশুকে আবার ফিরিয়ে আনব।' এই ভাব-ভাবনায় উদ্দীপিত হয়ে তিনি গিয়ে পৌছলেন পিটার্সবুর্গে, অবস্থান করলেন সেনাবাসে তাঁর প্রাক্তন সামরিক জীবনেরই সঙ্গী—অবসরপ্রাপ্ত এক ছোটখাট অফিসারের গৃহে। এবার, এখানে থেকেই সুরু হ'ল তাঁর খোঁজখবরের কাজকর্ম। তু'একদিনের মধ্যেই তিনি

জেনে গেলেন যে ক্যাপটেন মিন্স্কি রয়েছেন পিটার্সবুর্গেই—দিমুটভ হোটেলে। পোস্টমাষ্টারের স্থির সঙ্কল্প : তাঁর সঙ্গে দেখা করবেনই।

খুব সকাল-সকাল তিনি এসে হাজির হলেন ক্যাপটেন মিন্স্কির সদর দরজায়, ভৃত্যটিকে বললেন সাহেবকে জানাতে যে একজন বৃদ্ধ সৈনিক এসেছেন দেখা করতে। ভৃত্যটি জুতোদানীর ওপরে একজোড়া বুট জুতো রেখে পালিশ করতে করতে জানাল—উনি ঘুমোচ্ছেন, এবং বেলা এগারেটার আগে কারো সঙ্গেই দেখা করেন না। পোস্টমাষ্টার চলে গেলেন, ফিরে এলেন ঠিক সময়মতো। মিন্স্কি নিজেই ড্রেসিং-গাউন ও লালচে ফেজটুপি পরা অবস্থায় বেরিয়ে এলেন, বললেন—'আপনার জন্যে আমি কী করতে পারি ভাই, বলুন ?'

বৃদ্ধের সারাটা বুক উথলে উঠল করুণ আবেগে, দুচোখে ভরে উঠল অশ্রু, তিনি শুধু অস্পষ্টভাবে বিড়বিড় করে এইটুকুই বলতে পারলেন—'মহামান্য স্যর, ভগবানের নাম করে বলছি, স্যর···যা খোয়া গেছে তো একবারেই গেছে, এবারে ফিরিয়ে দিন আমার অভাগিনী দুনিয়াকে—ওকে নিয়ে তো যথেষ্ট আনন্দই করেছেন—বিনা অপরাধে ওর সর্বনাশটা করবেন না।'

'যা হয়ে গেছে তাকে তো আর না করা যায় না।'—বলতে লাগলেন সেই তরুণ যুবকটি, স্পষ্টতই খুব অভিভূত হয়ে পড়েছেন, বলতে লাগলেন—'আমি আপনার উপর অন্যায় করেছি—আপনার ক্ষমা চাইতেও রাজি আছি। তাই বলে নিশ্চয়ই ভাববেন না, দুনিয়াকে আমি ত্যাগ করব। সে সুখী হবে, আমি নিশ্চিত কথা দিচ্ছি আপনাকে। ওকে দিয়ে আপনি কি করতে চান ? ও আমাকে ভালোবাসে, আগের অবস্থায় থাকতে ও অনভ্যস্ত হয়ে পড়েছে। তা, ও কি আপনি কেউই কখনো ভুলতে পারবেন না যা ঘটে গেল।' তারপর পোস্টমাষ্টারের পকেটের মধ্যে কিছু-একটা গুঁজে দিয়ে তিনি দরজাটা খুলে ধরলেন, এবং বৃদ্ধ পোস্টমাষ্টারও কী করে যে রাস্তায় এসে দাঁড়ালেন তিনি নিজেই বুঝতে পারলেন না।

বহুক্ষণ তিনি দাঁড়িয়েই রইলেন স্থির অনড়, তারপর চোখে পড়ল তাঁর পকেটে এক বাণ্ডিল কি কাগজ। টেনে বার করলেন, ভাঁজ খুলে দেখেন একগাদা পাঁচ ও দশ রুব্‌ল নোট। দু'চোখে ছল্‌কে উঠল অশ্রু—ক্রোধের অশ্রু। নোটগুলি তিনি মুচড়ে মুচড়ে দলা পাকিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন মাটির উপর, দুপায়ের গোড়ালি দিয়ে দলে-পিষে ফেললেন, তারপর চলে গেলেন।···কয়েক পা এসেই থমকে দাঁড়ালেন, কি যেন ভাবলেন এবং···আবার ফিরে গেলেন কয়েক

পা। কিন্তু নোটগুলি আর নেই। এক সুসজ্জিত যুবক তাঁকে দেখেই দ্রুত ছুটে চলল একটা দ্রস্‌কি-গাড়ীর কাছে, একলাফে উঠে বসেই হাঁক দিল—'চালাও!' তার পিছু নিতে কোনোরকম চেষ্টাই করলেন না পোস্টমাষ্টার; স্থির করলেন ফিরে যাবেন তাঁর সেই পোস্টিং-ষ্টেশনে, তবে তার আগে বেচারা দুনিয়াকে দেখে যাবেন—যদি হয় তো একটিবার। কাজেই দুদিন পরে আবার তিনি হাজির হলেন ক্যাপটেন মিন্‌স্কির আস্তানায়। কিন্তু সামরিক-মার্কা ভৃত্যটি কড়াভাবেই জানিয়ে দিল যে তাঁর মনিব কারোর সঙ্গে দেখা করেন না, এবং সঙ্গেসঙ্গেই পোষ্টমাষ্টারকে সে ঘাড় ধরে বার করে দিল হলঘর থেকে—মুখের উপরেই দড়াম্ করে বন্ধ করে দিল দরজা। পোস্টমাষ্টার খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন বাইরে, তারপর চলে গেলেন।

সেদিনই সন্ধ্যাবেলা তিনি শহীদ-গির্জাতে প্রার্থনায় যোগ দেবার পরে হেঁটে চলছিলেন লিতেইনায়া স্ট্রীট ধ'রে। পাশ দিয়ে শ্‌শাঁ করে চলে গেল বেশ জমকালো একটা ঝকমকে গাড়ী,—পোস্টমাষ্টার ঠিকই চিনলেন মিন্‌স্কিকে। তেতলা এক বাড়ীর সামনে গাড়ীটা দাঁড়িয়ে গেল দরজাটা পর্যন্ত এগিয়ে। সেই মিন্‌স্কি নামক অশ্বারোহী-বিভাগের পদস্থ সৈনিকটিও বারান্দায় নেমে পড়লেন একলাফে। পোস্টমাষ্টারের মনের মধ্যে খেলে গেল এক সুখের ভাবনা, গাড়ীটা পর্যন্ত এগিয়ে এসে কোচোয়ানের কাছে জানতে চাইলেন—'এটা কার গাড়ী, ভাই? মিন্‌স্কির নয় কি?'

কোচোয়ান বলল—'হ্যাঁ, তাই! আপনি জিজ্ঞেস করছেন কেন?'

'বলছি, কেন? তোমার মনিব আমাকে বলেছিলেন তাঁর দুনিয়ার কাছে একটা খবর জানাতে, কিন্তু আমি ভুলে বসে আছি কোথায় থাকে তাঁর দুনিয়া।'

'কেন, এখানেই থাকেন তো, এর উপরের ফ্ল্যাটে। কিন্তু তুমি যে ভাই খবরটা দিতে দেরী করে ফেললে। মনিববাবু এখন ওঁর সঙ্গেই রয়েছেন তো!'

'তাতে কিছু হবে না।'—এইকথা বলতে পোস্টমাষ্টারের বুকের ভিতরটা কেমন যেন দুরদুর করে উঠল—'তুমি আমাকে সাহায্য করলে, এজন্যে ধন্যবাদ। তা, আমি আমার কথা রাখছি।'—এই বলেই তিনি সিঁড়ি বেয়ে উঠতে লাগলেন। দরজা বন্ধ। ঘণ্টা বাজালেন। থমথমে কয়েকটি দুর্ভর মুহূর্ত। গা-তালার চাবিটা কড়্‌কড়্ করে উঠল—খুলে গেল দরজা। জিজ্ঞেস করলেন—'আদোত্তিয়া সাম্‌সোনোভা কি এখানে থাকেন?' অল্পবয়সী একটি ঝি জানাল

—'হ্যাঁ!' আর কোনো কথা না বলে পোস্টমাষ্টার ঢুকে গেলেন হলঘরে। ঝি-মেয়েটি তাঁর পিছুপিছু গিয়ে বলে উঠল—'ভেতরে যেতে পারবেন না। আদোতিয়া সাম্‌সোনোভার সঙ্গে লোক রয়েছেন।' কিন্তু পোস্টমাষ্টার শুনেও শুনলেন না—এগিয়ে গেলেন। প্রথম তুটো ঘর অন্ধকার—তার মধ্যে দিয়ে এসে পড়লেন তৃতীয় একটি আলোকিত ঘরে। খোলা দরজার দিকে এগিয়ে গিয়েই থমকে দাঁড়ালেন। চমৎকার সাজানো-গোছানো ঘরে মিন্‌স্কি বসে আছেন গভীর কোনো চিন্তায় নিমগ্ন। চূড়ান্ত-ধরনের ফ্যাশান-দস্তুর সাজসজ্জায় বিভূষিতা তুনিয়া, মিন্‌স্কির চেয়ারের হাতলের উপরে বসে আছে,—চলেছে যেন বিলিতি ধরণের জিনাসনে চ'ড়ে! মিন্‌স্কির মুখের দিকে সে তাকিয়ে রয়েছে দরদভরে, মিন্‌স্কির কালো চুলের গোছা নিজের আঙ্গুলে জড়াচ্ছে, আর সেই আঙ্গুলে আঙ্গুলে ঝলমল করছে মুক্তো। বেচারা পোস্টমাষ্টার! তাঁর মেয়েকে তো এত সুন্দর দেখেননি আর কখনোই; অনিচ্ছায় হ'লেও স্বতোদিত প্রশংসার দৃষ্টিতেই দেখতে লাগলেন। হঠাৎ মাথা না উঁচিয়েই বলে উঠল তুনিয়া—'কে, কে ওখানে?' সাড়া না পেয়ে তুনিয়া মাথা তুলল···একটা গোঙানি দিয়ে পড়ে গেল কার্পেটের উপর। মিন্‌স্কি শঙ্কিত হয়ে তুনিয়াকে তুলে ধরতে গেলেন, কিন্তু বৃদ্ধ পোস্টমাষ্টারকে দরজায় দেখতে পেয়েই তুনিয়াকে রেখে, রাগে কাঁপতে কাঁপতে এগিয়ে গেলেন তাঁর দিকে—দাঁতে দাঁত ঘষতে ঘষতে বললেন—'কী চান আপনি? কেন, কেন আমার পিছু নিয়েছেন চোরের মতো! আমার জীবননাশ করতে চান? যান, বেরিয়ে যান!'—শক্ত হাতে কোটের কলার ধরে বৃদ্ধকে ঠেলে বার করে দিলেন সিঁড়ির দিকে।

বৃদ্ধ ফিরে এলেন তাঁর আস্তানায়। বন্ধুরা পরামর্শ দিলেন একটা মামলা ঠুকে দিতে। পোস্টমাষ্টার কিন্তু ভেবেচিন্তে, হাত দিয়ে কিছু একটা সরিয়ে দেওয়ার ভঙ্গী ক'রে, ব্যাপারটায় শেষ দাড়ি টানলেন। না, নতুন কিছুই আর করার নেই তাঁর। তুদিন বাদেই পিটার্স্‌বুর্গ ছেড়ে চলে এলেন পোস্টিং-ষ্টেশনে এবং সুরু করলেন তাঁর আগের কাজ।

সবশেষে বলছিলেন পোস্টমাষ্টার—'আজ প্রায় তিনবছর হতে চলল তুনিয়াকে ভুলে আছি, কখনোই আর তার কোনো কথা হয় না। সে বেঁচে আছে কি মরে গেছে, একমাত্র ভগবানই জানেন! সবকিছুই সম্ভব। তা, কোনো পথিক এসে ফুঁসলে নিয়ে যাবে এমন মেয়ে আজকাল কেবল সে-ই নয়,—সুরুতে কাছে রাখবে আর তারপর ঠেলে ফেলে দেবে। পিটার্স্‌বুর্গে ওর মতোই রয়েছে

কত শত মেয়ে : আজ পরবে ঝলমল মখমলের পোশাক, আর কাল ঐ দেখো ঝাঁটা দিয়ে সাফাই করছে পথ। মাঝেমাঝে যখনি ভাবি দুনিয়া ভিতরে ভিতরে মরে আছে, আমার মাথায় এই পাপচিন্তা দেখা দেয়—এর চেয়ে ও মরেই যাক না…'

—এই কাহিনীই বলে গেলেন বৃদ্ধ পোস্টমাষ্টার, বলতে বলতে চোখের জল বাধা দিচ্ছিল বারংবার, আর উনি জামার খুঁট দিয়ে চোখ মুছছিলেন এবং সেটি দেখবার মতো!…এহেন চোখের জলের খানিকটা হেতু হ'ল কাহিনীটা বলার মধ্যেই পাঞ্চ-সুরা গিলেছেন পুরো পাঁচগ্রাশ! তা হ'ক, কাহিনীটা আমাকে খুবি নাড়া দিয়েছে। তাঁর কাছ থেকে বিদায় নেবার বহুকালের পরেও আমার মাথার ভিতর থেকে পোস্টমাষ্টারের কথাটা মুছে ফেলতে পারিনি, কিংবা ত্যাগ করতে পারিনি অভাগিনী দুনিয়ার ভাবনাও।

কিছুকাল আগে এক গাঁয়ের মধ্য দিয়ে যেতে যেতে মনে পড়ল আমার সেই পুরোনো বন্ধুকে। জানতে পেলাম তাঁর ঘনিষ্ঠ সেই পোস্টিং-স্টেশনটি আজ আর নেই। 'পোস্টমাষ্টার কি বেঁচে আছেন?'—আমার এই অনুসন্ধানের জবাবে কেউই সঠিক কিছু বলতে পারল না। পরিচিত জায়গাগুলি একবার দেখে আসব—এই ভেবে আমি ঘোড়ার গাড়ী ভাড়া করে এগিয়ে চললাম গ্রামাঞ্চল এক্স্-এর দিকে।

তখন শরৎকাল। আকাশে ছাইরঙ্ মেঘের মেলা, শূন্য ক্ষেতগুলির দিক থেকে বয়ে আসছে হিমেল হাওয়া, হল্‌দে পাতাগুলি ঝরে ঝরে পড়ছিল গাছের ফাঁকে ফাঁকে। সন্ধ্যার ঠিক আগেই আমি পৌঁছে গেলাম গ্রামটিতে, থামলাম এসে পোষ্টমাষ্টারের বাড়ীটার সামনে। মোটাসোটা একজন মেয়েছেলে বেরিয়ে এল বারান্দায়, (এইখানেই একদিন আমাকে চুম্বন করেছিল দুনিয়া); আমার অনুসন্ধানের জবাবে জানাল যে বৃদ্ধ পোষ্টমাষ্টার মারা গেছেন বছর খানেক হ'ল, আর এখন তাঁর বাড়ীটা রয়েছে এক মদ-চোলাইকারীর দখলে, এবং সে নিজেই তার স্ত্রী। যাত্রাটাই বিফলে গেল, এবং সাত-সাতটা রুবলও,—আফশোস হতে লাগল। চোলাইকারীটির স্ত্রীকে আমি জিজ্ঞেস করলাম—

'কিসে মারা গেলেন?'

'মদের পর মদ গিলে, স্যার!'

'কবর দেওয়া হ'ল কোথায়?'

'গ্রামের প্রান্তে, তাঁর স্ত্রীর কবরের পাশে।'

'কেউ কি আমাকে সেখানটায় নিয়ে যেতে পারবে ?'

'পারবে না কেন ? এই ভাঙ্কা, ভাঙ্কা ? বলি, থাকিস কোথায় ? এই ভদ্দর-লোককে নিয়ে যা তো কবরখানায়, দেখিয়ে দে পোস্টমাষ্টারের কবরটা।'

দৌড়ে এল লালচুলো এক ন্যাকড়া-পরা ছোঁড়া, আমাকে নিয়ে চলল গ্রামের প্রান্তে।

পথে যেতে যেতে জিজ্ঞেস করলাম—'পোস্টমাষ্টারকে চিনতে তুমি ?'

'চিনব না ! আমাকে তো উনিই শিখিয়েছিলেন কেমন করে বাঁশী বানায়। রোজ সরাইখানা থেকে ফিরে এলেই (হ্যাঁ, ভগবান তাঁকে সুখে রাখুন!) আমরা পিছুপিছু ছুটতাম আর বলতাম—কাকাবাবু, কাকাবাবু! আমাদের বাদাম দিন না ? আর তখন তিনি আমাদের সবাইকেই বাদাম দিতেন। সব সময়েই আমাদের সঙ্গে খেলতেন।'

'যাত্রীরা এসে কেউ কি তাঁর কথা জানতে চায় ?'

'এখন আর যাত্রী তত বেশী আসেই না। যদি আসে তো ঘুরতে ঘুরতে আসে কোনো শাসকবাবু—তারা তো মরা লোকের ভাবনা ভাবেই না। তবে হ্যাঁ, এই গরম কালে এসেছিলেন এক ভদ্দরমহিলা, এসেই খোঁজখবর নিলেন পোস্টমাষ্টারের, তাঁর কবরটা দেখতে গেলেন।'

'কি রকমের ভদ্রমহিলা ?'—সন্ধানী দৃষ্টিতে জানতে চাইলাম।

'খুব সুন্দর ভদ্দরমহিলা! ছয়ঘোড়ার গাড়ীতে এসেছিল, সঙ্গে তিনটি বাচ্চা আর একজন ধাই, আর ক্ষুদে একটা কালোকুকুর। সবাই যখন বলল, পোস্টমাষ্টার মারা গেছে, তখন তার সে কী কান্না! বাচ্চাদের বলল: তোরা এখানে চুপ করে বসে থাক্,—আমি কবরখানায় যাচ্ছি। আমিই তাকে সেখানে নিয়ে যেতে চাইলাম। কিন্তু সে বলল—পথ চিনি আমি। তা, আমাকে সে রূপোর পাঁচ কোপেক দিয়ে দিল—এমন দয়ালু ভদ্দরমহিলা!'

আমরা পৌঁছলাম গিয়ে কবরখানায়। জায়গাটি ন্যাড়া, চারদিকে রেলিং নেই কোনোই, সবদিকেই জেগে আছে কাঠের ক্রুশ—রোদে বৃষ্টিতে ছাউনি নেই। আমার এ জীবনে আমি কখনোই আর এমন বিষণ্ণ কবরভূমি দেখিনি।

একটা বালুটিপির উপর কালোরঙের একটি ক্রুশে এঁটে রাখা হয়েছে পিতলের যীশুমূর্তি। ছেলেটা একলাফে ওখানে উঠে বলল—'এই তো বুড়ো পোস্টমাষ্টারের কবর।'

'সেই মহিলা কি এখানে এসেছিলেন ?'—জিজ্ঞেস করলাম।

ভানিয়া জবাব দিল—'হ্যা, এসেছিল। আমি তাকে দূর থেকে নজর করে দেখেছি। এখানে সে শুয়ে ছিল—বহুক্ষণ শুয়ে ছিল। তারপরেই তো গাঁয়ের দিকে গেল—সেই ভদ্দর মহিলা। পুরুতকে ডেকে আনল, তাকে কিছু টাকা দিল, তারপরে চলে গেল। তা, আমার হাতে দিল রূপোর গোটা পাঁচ-কোপেক —ভারী চমৎকার ভদ্দর-মহিলা।'

আমিও ভানিয়াকে দিলাম গোটা পাঁচ কোপেক ; তা, আমার এবারকার এই যাত্রাটার জন্যে এবং পাঁচ-পাঁচটা রুব্‌ল খরচ হবার জন্যেও, মোটেই আফশোস করতে হয়নি।

## * নিকোলাই গোগোল *

১৮০৯—১৮৫২ খ্রী.

রুশ সাহিত্যে বাস্তব-ধর্মী রচনার প্রথম সার্থক শিল্পী হলেন গোগোল। এঁর রচনা-পরিবেশ কিছুটা রোমান্টিক হ'লেও বাস্তবের সঙ্গে তার সহজ-ঘনিষ্ঠ শিকড়-যোগ। সাধারণ মানুষের জীবন ও ভাবনা এঁর গল্পে ও উপন্যাসে নিখুঁত চিত্রের মতো আঁকা; সর্বোপরি তাজা হাস্য ও ব্যঙ্গরসের সহজ পরিবেশনে তা ঝলমল ঝলমল করছে। রুশ জীবন-সুলভ অকৃত্রিম হাস্যরসের সঙ্গেই দুঃখ-বেদনার এমন আশ্চর্য মিলন

রুশ সাহিত্যে খুবি দুর্লভ, এমনকি বিশ্বসাহিত্যেও।

গোগোলের জীবনকাহিনী বড়ই বিচিত্র ধরণের। জন্ম পল্‌তোভা প্রদেশের সেরোচিন্তস্কিতে, ৩১ মার্চ ১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দে—সম্ভ্রান্ত এক কসাক পরিবারে। শিক্ষা পেয়েছেন নিঝিন-শিক্ষায়তনে। গোগোল বহু-বিচিত্র ক্ষেত্র কাজ করেছেন এলোমেলো: কখনো অভিনেতা, কখনো অধ্যাপক, কখনো-বা সরকারী চাকুরে, এবং শেষ পর্যন্ত স্বধর্মে প্রতিষ্ঠিত জগদ্বিখ্যাত সাহিত্যিক: নাট্যকার-গল্পকার ও উপন্যাসিক। এঁর 'রেভিজর' [ অর্থাৎ গভর্নমেণ্ট ইন্‌সপেক্টর* ] হ'ল রুশ আমলাতন্ত্রের বিরুদ্ধে ব্যঙ্গ-সমালোচনমূলক এক নিদারুণ

প্রহসন—বিশ্বসাহিত্যে অদ্বিতীয়। বিখ্যাত উপন্যাস 'তারাস বুলবা', 'ডেড সোল্‌স', [ মৃত আত্মা ], গল্পগ্রন্থ 'মীরগরোদ', 'পিটার্সবুর্গের গল্প'—বিখ্যাত 'গল্প ওভারকোট'*, 'আগের দিনের ভদ্রজীবন'*, 'জুড়িগাড়ী', এবং 'ডিকাঙ্কার কোলে সেই সন্ধ্যাগুলি' গল্পগ্রন্থের প্রত্যেকটি বড় কি ছোটগল্প। এখানে এই বই থেকে তুলে ধরেছি দুটি গল্প।

গোগোলের মৃত্যু হয় ২১শে ফেব্রুয়ারী, ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে, মাত্র তেতাল্লিশ বছর বয়সে।

গোগোল তাঁর কথাসাহিত্যে রোমান্টিসিজম্-এর শ্রেষ্ঠ বিকাশের সঙ্গেই একান্ত বাস্তব জীবনের নিগূঢ় যোগ ঘটিয়েছেন আশ্চর্য দক্ষতার সঙ্গে; সবচেয়ে বড় কথা হ'ল গোগোলের অননুকরণীয় বাণীভঙ্গী: সহজ চলন্ত ভাষা, প্রাণবন্ত বর্ণনা, নিখুঁত জীবন্ত চিত্রন, অফুরন্ত হাস্যরসের দিল-দরাজ পরিবেশন।

---

* তারকা-চিহ্নিত রচনাগুলি গ্রন্থের সম্পাদক-অনুবাদক কর্তৃক বহুপূর্বেই পরিবেশিত।

## ॥ ভুতুড়ে জমি ॥

সত্যিই বলছি, গল্প বলতে বলতে আমার ক্লান্তি ধরে গেছে। তা, তোমরাই বা কী চাইছ? একজন কেউ গল্পের পর গল্প বলেই চলবে, এ থেকে তার আর রেহাই নেই! ঠিক আছে, আমি গল্পই বলছি আবার। তবে মনে রেখো, এইটেই শেষবার। তা, আমরা কোন্ বিষয়ে কথা বলছিলাম : লোকে যাকে ভূতপ্রেত বা শয়তানের শক্তি বলে থাকে, তার কাছ থেকেই কিছু সুবিধে করে নেওয়া যায় কিনা—কাজ হাঁসিল করা যায় কিনা। তা দেখো, এই প্রসঙ্গেই যদি আসতে চাও তো বলি, কতরকম হয়-নয়ই তো ঘটে থাকে এই দুনিয়ায়! বরং বলাটা উচিত, ভূতপ্রেত বা শয়তান তোমাকে যদি নাস্তানাবুদ করতেই চায় তো, কার সাধ্য ঠেকায়?

তোমরা জানো, বাপমায়ের ঘরে আমরা ছিলাম চার ভাই, আর আমি ছিলাম ভ্যাবলা-ক্যাবলা ধরণের, কত্‌টুকুই বা তখন—দশ কি নয়, কি তারো কম। সবি মনে পড়ছে, যেন এই আজকেরি কথা। চার হাত-পায়ে সবে তড়বড় ছুটছি, চেঁচাচ্ছি বাচ্চা কুকুরের মতো, আর বাবা আমাকে লক্ষ্য করে মাথা নাড়তে নাড়তে বলছেন—'হ্যাঁরে ফোমা, বড়সড় এক দামড়া হয়ে উঠেছিস, এবার তোর শাদি দিলেই হয়। আর, তুই কিনা দিনে দিনে হয়ে পড়ছিস হাবাগোবা এক বাচ্চা গাধা।' হ্যাঁ, আমার দাদুও তখন বেঁচে ছিলেন, বহাল তবিয়তে ভালোই ছিলেন। এখন আছেন ওপারে। তা আশা করছি, তার শ্লেষ্মার টানটা এখন কম্‌তির দিকেই! এই দাদুকেই মাঝেমধ্যে পেয়ে বসত এক অদ্ভুত ধরণের খেয়ালে।

কিন্তু না, এভাবে তো গল্প বলা যায় না। তোমাদের একজন এই ঘণ্টাখানেক ধরেই চুল্লী থেকে টিকে খুঁজে বেড়াচ্ছ পাইপে ধূমপানের জন্যে, কেউ কিছু-একটা বিশেষ কারণে দৌড় লাগাচ্ছ গোয়ালঘরের পিছনটায়। তা, এসব হচ্ছে কী! হ্যাঁ, এতে কিছুই দোষ হত না—আমি নিজেই যদি তোমাদের ধরে বেঁধে গল্প শোনাতে বসতাম। কিন্তু কথাটা হচ্ছে, তোমরাই আমাকে বলে-কয়ে

একটা গল্প বলাতে রাজি করিয়েছ। তা, গল্প যদি শুনতেই চাও তো ঠিকঠাক হয়ে বসো!

তখন সবে সুরু হয়েছে বসন্তকাল। আমার বাবা তামাকপাতি গাড়ী করে পাঠিয়েছেন ক্রিমিয়াতে বিক্রি হবার জন্যে, তবে আমি শুধু স্মরণে আনতে পারছি না কয় গাড়ী মাল পাঠিয়েছিলেন—দুইগাড়ী কি তিনগাড়ী। হ্যাঁ, তখনকার দিনে তামাকের বেশ কদর ও চাহিদা ছিল। তিনবছরের ছোট ভাইটিকেও বাবা সঙ্গে করে নিয়ে গেলেন, ব্যবসাদারি শেখবার জন্যে। বাড়ীতে রইলাম দাদু, মা, আমি, আমার ভাই, আর আমার আরো একভাই। দাদু সেবার সড়কের পাশেই ফুটি-তরমুজের এক ক্ষেত করেছিলেন, সেখানেই গেছেন—কুঁড়েটাতে থাকবেন। সঙ্গে আমাদেরো নিয়ে গেছেন পাখ-পাখালিদের ভয় খাইয়ে তাড়াবার জন্যে। তা, আমাদের নিয়ে যাওয়াটা আমাদের পক্ষে মোটেই অসুবিধের হয়নি, বলতে পারি। আমরা তো যতখুশি খেতে-খেতে শশা, ফুটি তরমুজ, প্যাঁজ, কড়াইশুঁটি এতবেশী খেয়ে ফেললাম যে, সত্যিকথা বলতে কি আমাদের পেটের ভিতর ডাকতে সুরু করল যত কাক আর মোরগ! তা, ক্ষেতের কারবার ছিল যাকে বলে লাভজনক, পথিকেরা সড়ক ধরে টলতে টলতে আসত দলে-দল। প্রত্যেকেই খেতে চায় ফুটি কি তরমুজ। আর এ ছাড়াও, ধারেকাছের খামারবাড়ীগুলি থেকেও লোকজন নিয়ে আসত মুরগী হাঁস ডিম,—বদল করে নিত ক্ষেতের ফসলের সঙ্গে। এতে বেশ দুপয়সা হ'ত।

তবে কিনা, আমার দাদু সবচেয়ে বেশী চাইতেন ফি-রোজ বিশপঞ্চাশটা মালগাড়ীদার যেন মালভরা গাড়ী নিয়ে সড়ক ধরে এগিয়ে আসে। হ্যাঁ, ওইসব লোকই তো দেখেছে দুনিয়াটা কেমন। ওদের কেউ গল্প বলতে সুরু করেছে তো, দু'কান খাড়া করে শুনতে হবে; আর, আমার দাদুর কাছে তা হ'ল হা-ভাতের কাছে ফলার! মাঝেমধ্যে দেখাসাক্ষাৎ হ'ত পুরোনো দিনের সাগরেদদের সঙ্গে। আমাদের দাদুকে চিনত তো সকলেই। আর জানোই তো, বুড়োরা একত্তর হ'লে কেমনটা হয়: এই এটা, এই সেটা—এই ঘটল, সেই ঘটল—বকবক করে চলেছে তো চলেইছে। সবকিছুই ওরা মনে রাখেন, তবে একমাত্র ভগবানই জানেন কখনো সেসব ঘটেছিল কিনা!

একদিন সন্ধ্যেবেলা—কী আশ্চর্য, মনে হচ্ছে যেন এই আজকার কথা। সূর্য তখন অস্ত যায়-যায়। দাদু বাগানটা ঘুরে ঘুরে দেখছেন—কড়ারোদের ঝাঁঝ

থেকে ফুটি-তরমুজগুলোকে বাঁচাবার জন্যে যেসব বড় বড় পাতা দিয়ে ঢাকা দিয়ে রেখেছিলেন, সেগুলি একে একে তুলে নিচ্ছিলেন।

আমি আমার ভাইকে বলে উঠলাম—"ওই ছাখ, ওস্তাপ! ওই কতগুলি মালগাড়ীদার আসছে!'

দাদু বেশ বড়রকমের একটা তরমুজের উপর দাগ কেটে রাখছিলেন—ছেলে ছোকরারা যাতে দাঁত না বসায়; দাগ কাটতে কাটতে জিজ্ঞেস করলেন—'কোথায় রে!'

সড়ক ধরে সারি সারি এগিয়ে আসছিল ছয়-ছয়টা মালগাড়ী; যে মাল-গাড়ীদারটা আগে আগে—গোঁফে তার পাক ধরেছে। হাত দশেক দূরে এসেই সে,—এই যাকে বলে থমকে দাঁড়াল, একেবারে নড়নচড়ন নেই।

'আদাব, মাক্সিম! ভগবানের মর্জিতেই দেখা!'

মাক্সিম দাদু তাঁর চোখ দুটো কুঁচকে তাকিয়ে রইলেন—'সুপ্রভাত! কোত্থেকে এলে? ও, বোলিয়াচ্‌কা-ও যে! আদাব ভাইজান। আচ্ছা তাজ্জব বটে? ক্রুতোত্রিশেচস্কো-ও! আর, পেচেরিৎসায়া! কোভ্‌লেক আর স্তেস্কো! আদাব, আদাব!'—তারপর এ-ওকে জড়িয়ে ধরে খুব সমাদর দেখাতে লাগল।

ওরা বলদগুলোর লাগাম খুলে দিল, বলদগুলো চরে বেড়াতে লাগল ঘাস খাবার জন্যে। গাড়ীগুলো সড়কে রেখে সকলেই কুঁড়েটার পাশে চক্কর দিয়ে বসে পড়ল, পাইপ ধরাল,—পাইপের দিকে যদিও তাদের খুব একটা নজর ছিল না। গল্পসল্পের ও আলাপ-সালাপের দিকেও বা কতটা আমি বলতে পারব না, ওরা নিজের মতো আলাদাভাবেই যে যার পাইপ টানছিল তাও বলা যায় না।

দুপুরের খাওয়াদাওয়ার পরে দাদু তার অতিথি-অভ্যাগতদের পরিবেশন করলেন ফুটি। ওরা প্রত্যেকেই এক-একটি ফুটি হাতে নিয়ে ছুরি দিয়ে নিখুঁত করে বাকল ছাড়াল, বহুদিনের পাকাহাত তো! আর, জানেও দলে বসে কেমন করে খেতে হয়—ভদ্দরলোকদের খাবার টেবিলে বসে খাওয়ার যোগ্য বটে। ফুটিগুলো ভালো করে ছাড়িয়ে প্রত্যেকেই তার মধ্যে আঙুল ঢুকিয়ে একএকটা ফুটো করল, রসটা চুষে খেল; কেটে কেটে খণ্ডখণ্ড করে পুরতে লাগল মুখের মধ্যে।

দাদু এবার আমাদের বললেন—'একটু নেচেকুঁদে দেখা না, বাঁদরেরা! ও ওস্তাপ, তোর নলের বাঁশীটা কোথায়? হ্যাঁ, হ্যাঁ, এবার দেখা রে একখানা

কশাক নাচ। ও ফোমা, কিরে? এখনো বুকের উপর হাত ভাঁজ করে দাঁড়িয়ে? আয়! হ্যাঁ, হ্যাঁ, এই তো চাই, এবার সুরু হ'ক।'

আমি তখন ছিলাম খুবি দামাল ছেলে। আর, এই বুড়ো বয়স এক অভিশাপ! এখন তো আর তেমন করে পা-ই ফেলতে পারি না। ঘূর্ণী-নাচ করতে গেলে তো আমার পা টলে কেবল, উল্টেই পড়ি বা। আমার দাদু মালগাড়ীদারদের সঙ্গে বসে বসে খানিকক্ষণ আমাদের নজর করে দেখতে লাগলেন। কিন্তু আমি লক্ষ্য করছিলাম—দাদুর পা দুটো যেন স্থির থাকছে না, কিসে যেন পা দুটোকে টেনে টেনে তুলছে বারংবার। ফোমাকে বলল ওস্তাপ —'ভাখ ভাখ ফোমা, বুড়োটা বুঝি-বা নাচতেই সুরু করে দেয়!' একথা বলতে না বলতেই বুড়ো নিজেকে আর সামলে রাখতে পারলেন না। বুঝতেই পারছ তোমরা, ওইসব ব্যবসায়ী মালগাড়ীদারদের সামনে বুড়োটা তাঁর কেরামতি দেখাতে চাইছিলেন। বলে উঠলেন—'ওরে ছোঁড়ারা, ওটা কি নাচ হ'ল? অমন করে কি নাচ হয়?'—বলতে বলতেই উঠে দাঁড়ালেন দাদু, দুহাত বাড়িয়ে দিলেন—থপ্ থপ্ পায়ের গোড়ালি ফেলে নাচতে লাগলেন তালে তালে। তা, আমি হলফ করে বলছি, আমাদের গাঁয়ের মোড়লের সুন্দরী স্ত্রীটিকে—সবচেয়ে সুন্দরীটিকে পাশে নিয়ে নাচলেও এর চেয়ে সুন্দর নাচ হ'ত না। আমরা একপাশে সরে এসে দেখতে লাগলাম। বুড়ো শশাক্ষেতের পাশের সমতল জমিতে পা ফেলে চক্কর মেরে নাচতে লাগলেন। আর তারপর, জমিটার মধ্যিখানে এসে, এবার তিড়িং-তিড়িং লাফ মেরে ঘূর্ণীর মতো ঘুরে ঘুরে, তাঁর নাচের সেরা নাচ সুরু করবেন, আর তখনি একি! কিছুতেই পা যে আর মাটি থেকে তুলতেই পারছেন না! না, কিছুতেই নয়! একি যম-যন্ত্রণা! দাদু তো দেহটাকে একবার এদিক একবার ওদিক, একবার সামনে একবার পিছনে ঘোরাচ্ছেন বারংবার, কিন্তু পা-দুটো কিছুতেই মাটি থেকে উঠছে না। না, কিছুতেই কিছু হচ্ছে না। পা দুটো দাঁড়িয়ে, যেন দুটো কাঠের থাম! দাদু বলে উঠলেন—'দেখছ তো সবাই, জায়গাটা ভূতুড়ে—শয়তানের আস্তানা; খোদ শয়তানের যোগ আছে এখানে।'

সত্যিই, এই ব্যাপারীদের সামনে দাদু কি নিজেকে আহাম্মক বানাতে চাইতে পারেন, তোমারাই বলো না। তাই নতুন করে আবার ছোট ছোট চক্কর মেরে নাচ সুরু করলেন। তা, সত্যিই সুন্দর হ'ল দেখতে। আর তার

পর, যেই সেই জমিটার মাঝখানটায় গেছেন, আবার সেই কাণ্ড! আর তো পারছেন না।

'আচ্ছা শয়তানের কাণ্ড! হ্যাঁরে শয়তান, তুই পচা ফুটি গলায় আটকে মর্ না। তুই শয়তানের বাচ্চা, শয়তান! মরা বাচ্চা হয়েই জন্মালি না কেন? এখন, তুই আমার এই বুড়ো বয়সে একি লজ্জার মধ্যে ফেললি।'—এই বলার সঙ্গে সঙ্গে সত্যিই কে যেন হেসে উঠল দাদুর পিছন দিকে।

দাদু পিছু ফিরলেন, চারদিকটা তাকিয়ে দেখলেন। তা, কোথায় সেই ফুটিক্ষেত আর কোথায় সেই ব্যাপারীরা? কোথাও কিচ্ছুটি নেই। ডানে বাঁয়ে, সামনে পিছনে ছড়িয়ে আছে সমতল জমি শুধু! 'না, এমনটা তো কখনো—' দাদু ভুরু দুটো কুঁচকে তুলে নজর করে দেখতে লাগলেন। তা, জায়গাটা তো একেবারে অচেনা বলেও মনে হচ্ছে না: একদিকে রয়েছে ঝোপঝাড়, পেছনেই পোঁতা একটা থাম—আকাশের পটে বহুদূর থেকেও দেখা যায় স্পষ্ট। মরুক গে! কিন্তু ওটা তো পুরুতবাড়ীর বাগানক্ষেতের সেই পায়রার খোপটা, অন্যদিকটায় দেখা যাচ্ছে কী যেন একটা ছাইরঙের। দাদু ঘনিয়ে এসে দেখলেন,—না, এটা তো সরকারী কেরানীবাবুর ঝাড়াই-মাড়াই বাড়ী। তবে তো শয়তানই টেনে এনেছে এখানে! চক্রাকারে ঘুরতে লাগলেন দাদু। হঠাৎ পেয়ে গেলেন একটা সরুপথ।

চাঁদের হদিশ নেই আকাশে, দেখা যাচ্ছে শুধু একখানা কালোমেঘের পিছনে আবছা আলো খানিকটা। 'কাল নিশ্চয়ই ঝড় উঠবে।'—দাদু ভাবছিলেন। তখন দাদু দেখেন কি, পথটা থেকে খানিকটা দূরেই কবরের জমিটাতে দপ্‌দপ্ করে জ্বলে উঠল একটা আলো। দাদু বলে উঠলেন—'আচ্ছা?' ঘুরে দাঁড়ালেন, বুকের উপর দুহাত এঁটে,—ওইদিকে তাকিয়ে রইলেন, স্থিরদৃষ্টি। আলোটা নিভে গেল। দূরে বহুদূরে ঝিকমিক করে উঠল আরো কয়েকটা আলো। দাদু আপন মনে বলে উঠলেন—'গুপ্তধন! নিশ্চয়ই গুপ্তধন! গুপ্তধন না হয়েই যায় না।' সঙ্গে সঙ্গেই দাদু তার দু'হাতের তালুতে থুথু ঘষে মাটি খুঁড়তে এগোচ্ছেন, তখন মনে পড়ল হাতে তো কোদাল নেই। 'ওঃ! হয়ত, মাটির উপরকার ঘাসের চাপড়া সরালেই বেরিয়ে পড়বে আমার যাদুধনেরা, আমার সোনারা! তা, জায়গাটার একটা হদিশ রেখে যাই, পরে ভুল না করি।'

ঝড়ে ভাঙা একটা বড়সড় ডাল টেনে এনে সেই কবরখানার উপর ফেলে রাখলেন দাদু—ঠিক যেখানটায় আলো জ্বলছিল। তারপর পথ ধরে এগিয়ে

চললেন। ক্রমেই হাল্কা হয়ে এল অল্পবয়সী ওকচারার ঝোপ। সামনেই দেখা গেল একটা পাঁচিল। দাদু ভাবছিলেন—'এই এইখানটাকেই কি আমি পুরুতের সব্‌জি বাগান ভাবিনি? হ্যাঁ হ্যাঁ, এই তো পাঁচিলটা। এখন-থেকে ফুটিতরমুজের ক্ষেতটা তো প্রায় মাইলখানেকের কম নয়।'

দাদু যখন বাড়ী ফিরলেন, দেরী হয়ে গেছে বেশ। কিছুই খেলেন না, ভাই ওস্তাপকে জাগিয়ে তুলে জানতে চাইলেন বহু আগেই ব্যাপারীরা চলে গেছে কিনা, তারপর ভেড়ার চামড়ার গরম কম্বলটা দিয়ে গা ঢেকে শুয়ে পড়লেন। ওস্তাপ জিজ্ঞেস করল—'দাদু, আজ কোথায় আটকে পড়েছিলে, দাদু?' দাদু আরো আঁটসাট কম্বল মুড়ি দিয়ে বলে উঠলেন—'কিচ্ছুটি জানতে চাস না, ওস্তাপ! শুনলে তোর লোম খাড়া হয়ে উঠবে।'

দাদু এরপর এমন বিকট রবে নাক ডাকাতে স্থরু করলেন যে আমাদের ফুটিতরমুজ ক্ষেতে যে চড়ুইয়ের দল জড়ো হচ্ছিল, উড়ে গেল ঝটপট! তা, কী ঘুমই না ঘুমুলেন দাদু। আমাদের এই দাদু ছিলেন মহা ওস্তাদ লোক—ধূর্ত বুড়ো। তা, তাঁর আত্মা এখন শান্তিতেই থাকুক! যেকোনো ধরণের আপদ বিপদ থেকেই পিছলে বেরিয়ে আসতে পারতেন আমাদের এই দাদু। কখনো কখনো তিনি এমন সব কাণ্ড করে বসতেন, শুনলে আমাদের চুল খাড়া হয়ে উঠত।

পরদিন সন্ধ্যার অন্ধকার একটু ঘন হতেই, দাদু জামাপ্যাণ্ট পরে, কোমরে বেল্ট বেঁধে, বগলে একখানা কোদালি চেপে ধ'রে, মাথায় টুপি চড়িয়ে, এক গ্লাস ভদ্‌কা খেয়ে—জামার খুঁট দিয়ে মুখ মুছলেন। এবার সোজা এগিয়ে চললেন পুরুতের বাগানটার দিকে। পাঁচিলটা পেরিয়ে গেলেন, পেরিয়ে চললেন চারাওকের ঝোপঝাড়টা। পথ চলে গেছে ঘুরে ঘুরে গাছগুলির মধ্য দিয়ে, সেই পথ ধরেই এসে পড়লেন একটা ফাঁকা জায়গায়। হ্যাঁ, ঠিক সেই গতকালের জায়গাটার মতোই মনে হচ্ছে তো। স্পষ্ট দেখছেন—উঁচিয়ে রয়েছে পায়রার খোপটা, কিন্তু ঝাড়াই-মাড়াই বাড়ীটা? না, এটা তো সে জায়গা নয়; নিশ্চয়ই আরো কিছুটা দূরে। নিশ্চয়ই আরো কিছুটা এগিয়ে গেলে তবেই চোখে পড়বে সেই ঝাড়াই-মাড়াই বাড়ী। এই ভেবে ভেবে পিছু ঘুরে অন্যপথ ধরে এগোতে লাগলেন দাদু। তা, ঝাড়াই-মাড়াই বাড়ী দেখতে পাচ্ছেন ঠিকই, কিন্তু পায়রার খোপটা গেল কোথায়? আবার মোড় ঘুরে পায়রার খোপটা পেয়েছেন তো, ঝাড়াই-মাড়াই বাড়ীটা বেপাত্তা। দাদুর উপর একহাত নে। জন্যেই যেন

স্থরু হ'ল বৃষ্টি, এবং তার সঙ্গে ঝিরঝির তুষার। দাদু তাঁর কুঁড়েটার উদ্দেশে ছুটে চলেছেন তো পায়রার খোপটা উধাও, পায়রার খোপের দিকে তো কুঁড়েটা নেই!

'ওরে নরকের শয়তান! তুই তোর বাচ্চাকাচ্চাদের কাছে পৌঁছবার আগেই যেন অক্কা পাস্!'—চেঁচিয়ে চেঁচিয়েই বলছিলেন দাদু।

এবার স্থরু হ'ল বৃষ্টি মুষলধারায়। নতুন বুটজোড়া পা থেকে খুলে রুমালে জড়িয়ে নিলেন দাদু, বৃষ্টিতে চুপসে না যায়। ছুটে চললেন, নেমেছেন যেন ঠিক দৌড়ের পাল্লায়! কুঁড়েটাতে ঢুকলেন যখন আমাদের দাদু, একেবারে ভিজে জুবজুবে। ভেড়ার চামড়ার জামাটা দিয়ে গাটা জড়িয়ে নিলেন, ঠকঠক কাঁপছেন দাঁতে দাঁত, শয়তানের চৌদ্দ পুরুষ উদ্ধার করছেন ঝাঁঝালো যত্‌ত সব গালি-গালাজ ছেড়ে,—যে রকমটা শুনিনি আমি কখনোই, দিনের আলোতেই স্পষ্ট যদি শুনতাম তো লজ্জায় মরে যেতাম।

পরদিন ঘুম থেকে উঠেই এগিয়ে গিয়ে দেখি কি, দাদু বার্ডগাছের বড় বড় পাতা দিয়ে ঢেকে রাখছেন ফুটি-তরমুজগুলোকে। দুপুরবেলা ওই কচিবুড়ো আবার মুখ খুললেন: আমার ভাইকে ভয় দেখাবার জন্যেই বললেন—ফুটির বদলে এই তোকেই গিলে খাবো! বিকেলবেলা এক টুকরো কাঠ দিয়ে তৈরী করলেন একটা বাঁশী, নিজেই বাজাতে লাগলেন। আমার সঙ্গে মজা করার উদ্দেশ্যে আমাকে এমন একটি ফুটি দিলেন—যেটা কিনা তিন-তিন ভাঁজে দেখতে হয়েছে ঠিক তিনটে সাপের-জড়ানো দেহের মতো। দাদু বুঝিয়ে বললেন ওটা হ'ল কিনা তুর্কী ধরণের, অমনটা আর দেখা যায় না কোথাও। দূরদেশ থেকে দাদু তার বীজ আনিয়েছিলেন, এটা সত্যি।

বিকেল বেলার খাওয়াটা শেষ করে কোদাল হাতে নিয়ে দাদু চললেন দেরী-ফসলী কুমড়োর জমি তৈরী করতে। সেই ভুতুড়ে জায়গাটার পাশ দিয়ে যেতেই দাদু বলে উঠলেন—'অভিশপ্ত জায়গা বটে!' জায়গাটার মাঝখানে এসে দাঁড়ালেন—ঠিক যেখানটায় আটকে গিয়েছিল তাঁর নাচ। হঠাৎ এক ঝলকে তাঁর সামনে দেখা দিল সেই সবকিছুই! একদিকে উঁচিয়ে আছে সেই পায়রার খোপটা, অন্যদিকে ঝাড়াই-মাড়াই ঘর। 'বাঃ, সঙ্গে কোদাল আনার কথাটা মনে করে ভালোই হয়েছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, এই তো সেই পথ; আর ঠিক সেই কবরখানা! ডালটাও রয়েছে ঠিক জায়গা মতোই! আর, ওই তো ঢালুতে জ্বলছে সেই আলো—অবশ্যি কোনোরকম যদি ভুল না হয়ে থাকে।'

পা টিপে টিপে এগিয়ে চলেছেন দাদু কোদালটা উঁচিয়ে। যেন কোনো তরমুজের মধ্যে নাক ঢুকিয়ে দিয়েছে কোনো শুয়োরের বাচ্চা, আর তার উপরে ঘা হানতে যাচ্ছে দাদু। এইভাবেই এসে পড়লেন কবরখানায়, এসেই থমকে দাঁড়ালেন। নিভে গেল আলোটা! কবরখানায় একটা পাথরের উপর ঘাস গজিয়েছে খানিকটা। দাদু ভাবছেন—'এবারে পাথরটা তুলব।' পাথরটার চারপাশটা খুঁড়বার চেষ্টা করতে লাগলেন। শালার পাথর যা তাগড়াই। দাদু তার দুটো পা শক্ত করে মাটিতে দাবিয়ে রেখে কবর থেকে সরালেন পাথরটা,—'ওঃ!'—প্রতিধ্বনি উঠল চতুর্দিকে। 'ঠিক মতোই কাজ হচ্ছে। এবারে খুব জল্‌দি!'

এসময়ে দাদু একটু থামলেন, নস্যির ডিবেটা বার করে হাতে খানিকটা নিয়ে যেই নাকের দিকে তুলেছেন, তাঁর হাতের উপরেই সে কী এক জারালো হ্যাঁচ্চো! কেঁপে উঠল গাছপালা, আর দাদুর সারাটা চোখ-মুখ ভিজে উঠল সিকনিতে!

চোখমুখ মুছে দাদু বলে উঠলেন—'তা, হাঁচি দিতেই চাইছ তো মাথাটা একটু ঘুরিয়ে নিলে কি দোষ হ'ত?' দাদু চারদিকটা তাকিয়ে দেখেন—কৈ, কেউই তো নেই কোথাও!' তা, মনে হচ্ছে শয়তানটার নস্যি খুব পছন্দ নয়।' নস্যির ডিবেটা জামার মধ্যে রেখে, কোদালটা উপরে তুলতে তুলতে দাদু ভাবছিলেন—'আচ্ছা হাবা তো। তোর বাপ-ঠাকুর্দা কি চৌদ্দপুরুষের কেউই এমন নস্যি দেখেনি কখনো, বুঝলি?'

খুঁড়ে চলেছেন দাদু। জমিটা বেশ নরমই, কোদালটা সোজা বসে যাচ্ছে। তারপর? তার পর ঠনঠন কিসের শব্দ! সব মাটিটা সরিয়ে ফেলতেই দেখেন কি দাদু—সে এক প্রকাণ্ড জালা!

'আ-হা! তাহ'লে তুমি এখানে!'—কোদালটাকে ওইটার তলায় ঢুকিয়ে, চার দিতে দিতে সোল্লাসে বলে উঠলেন দাদু।

'আ-হা! তাহ'লে তুমি এখানেই!'—জালাটাকে ঠোঁট দিয়ে ঠোকরাতে ঠোকরাতে বলে উঠল একটা পাখী।

দাদু সরে গেলেন একপাশে,—হাত থেকে পড়ে গেল কোদালটা।

'আ-হা! তাহ'লে তুমি এখানেই!'—একটা গাছের মাথা থেকে বলে উঠল এক ছাগলের মাথ'।

'আ-হা। তাহ'লে তুমি এখানেই!'—একটা গাছের গুঁড়ির আড়াল থেকে নাকটা বাড়িয়ে গজরে উঠল এক ভালুক।

এবারে এক নিদারুণ ভয় শিরশির করে নামতে লাগল দাদুর শিরদাঁড়া বেয়ে বেয়ে।

'হ্যাঁ, এখানে কারো কথা বলতেও ভয় হয়!'—আপন মনেই বিড়বিড় করছিলেন দাদু।

'হ্যাঁ, এখানে কথা বলতেও ভয় হয়!'—ঠোঁট ফাঁক করে বলে উঠল পাখীটা।

'হ্যাঁ, এখানে কথা বলতেও হয়!'—বলে উঠল ছাগলের মাথাটা।

'একটা কথা বলতেও!'—গর্জে উঠল ভালুকটা।

'হুম্‌ম্‌!'—বলে উঠলেন দাদু, বুঝি ভয় পেয়েছেন।

'হুম্‌ম্‌!'—বলে উঠল পাখীটা।

'হুম্‌ম্‌!'—বলে উঠল ছাগলটা।

'হুম্‌ম্‌! —গর্জে উঠল ভালুক।

দাদু তো ভয়ে ভয়ে মোড় ঘুরে দাঁড়িয়েছেন। ওঃ ভগবান, একী রাত! তারা নেই, চাঁদ নেই, আর চারদিকে একি, কেবল খাদ আর খাদ! পায়ের পাশেই এক অতল পাহাড়-গহ্বর! মাথার উপরেই ঝুলে রয়েছে একখানা পাথরের চাঁই—ভাবখানা এমন, যেকোনো মুহূর্তেই মাথায় এসে পড়তে পারে। দাদুর মনে হতে লাগল তার পিছন দিক থেকে উঁকি মারছে কী ভয়ঙ্কর একখানা মুখ! 'ওঃ! বাপরে! কী ভয়ঙ্কর! নাকটা যেন কামারশালার হাপর, শব্দ করছে! নাকের এক-একটা ফুটো এত বড় যে এক-এক বাল্‌তি জল ঢেলে দেওয়া যায় ওর মধ্যে! ওষ্ঠ দুটো ঠিক একজোড়া কাষ্ঠখণ্ড! কপালের উপর লাল টকটকে দু-দুটো চোখ, লকলকে জিভ—মজা করে দুলছে যেন!

জালাটা থেকে হাত দুটো সরিয়ে এনে বলে উঠলেন দাদু—'মর্ গে, শয়তান! মর্ গে তোর ধনদৌলত নিয়ে। ওরে বাবারে, একী বিশ্রী মুখ!' দাদুর অবস্থা তখন ছেড়ে দিলে কেঁদে বাঁচি। কিন্তু চারদিকটায় একবার তাকাতেই থমকে দাঁড়ালেন দাদু। কৈ, কিছুই তো নেই! হ্যাঁ, ওই শয়তানেরই কারসাজি সব, আমাকে ভয় খাওয়ানোর জন্যে।

আবার কাজে হাত দিলেন দাদু, জালাটাকে তুলবার জন্যে। কিন্তু যা ভারী!

তাহ'লে কী করা যায়? এবার তো আর ফেলে রেখে চলে যাওয়া যায় না। মরি-বাঁচি আবার টানতে লাগলেন জালাটা।

'এই যে, হেঁইও। এই যে, হেঁইও।'—টেনেই তুললেন।

'ওঃ! এবারে একবার নস্যি নিতে হচ্ছে।' ডিবেটা বার করলেন, ডিবেটা খুলবার আগে একবার দেখে নিলেন ধারে কাছে কেউ ঠিক আছে কিনা। না, কেউ নেই বলেই তো মনে হয়। তারপরেই যেন দেখতে পেলেন, কাছের গাছটার গুঁড়িটা হাঁপাচ্ছে—দুভাগ হয়ে গেল! দেখা দিল দু-দুটো রক্তচক্ষু, কোঁকড়ানো একটা নাক—আর সেই নাকটা কিনা হাঁচি দেবার উপক্রম করছে!

'না, এখন নস্যি নেব না।'—এই ভেবেই দাদু গুঁজে রাখলেন ডিবেটা, ঐ শয়তান এক্ষুনি আবার আমার মুখের উপরেই হ্যাঁচ্চো দেবে। দাদু বরং তড়িঘড়ি জালাটাকে তুলে ধরেই ছুটতে শুরু করলেন—দুটো পা যত জল্‌দি ছুটতে পারে আর কি। বারবার শুধু মনে হতে লাগল কিসে যেন তার পায়ে আঁচড় কাটছে কাঁটাগাছের ডাল দিয়ে। দাদু কি আর করেন যত্‌ত জোরে পারেন ছুটছেন তো ছুটছেনই, আর মাঝেমাঝেই ককিয়ে উঠছেন—'ওঃ!' এহেন অবস্থায় পুরুতের সব্‌জি বাগানে পৌঁছে তবেই স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেন দাদু।

আমরা তো বাড়ীতে বসে পুরো তিনঘণ্টা অবাক হয়ে ভাবছি দাদুটা গেল কোথায়? খামার-বাড়ী থেকে মা এসে গেছে অনেক আগেই, নিয়ে এসেছে এক ভাঁড় গরম গরম ঘনদুধ। তবুও দাদু কৈ? রাতের খাওয়া দাওয়ার পরে মা বাসনকোসন ধুয়ে ফেলে ভাবছেন উচ্ছিষ্ট ময়লা-জলটা ঠিক কোথায় ছুঁড়ে ফেলা যায়। কারণ, চারদিকেই তো ফুটিক্ষেত। আর তখনি মা দেখে কি, তার দিকেই সোজা এগিয়ে আসছে কিনা প্রকাণ্ড একটা জালা! তখন অন্ধকার বেশ ঘনিয়ে উঠেছে; মা ভাবছে, নিশ্চয়ই ছেলেরা কেউ জালার আড়ালে গা ঢাকা দিয়ে বাঁদরামো করছে। 'দাঁড়া না দেখাচ্ছি! গরম গরম এই নোংরা জলই ছুঁড়ে দেব তোর গায়ে!'—এই বলেই মা ঝপাস্‌ করে ছুঁড়ে দিল পাত্রের সবটা জল।

'ইস্‌স্‌!'—শোনা গেল কার গলা? আরে, এ যে স্বয়ং দাদু! তা, কে ভাবতে পেরেছে দাদুই? সত্যিই বলছি, আমরা তো সবাই ভেবেছিলাম গড়িয়ে আসছে বুঝি কোন্‌ এক জালা! ঐ খাবার বাসনকোসন-ধোয়া গরম জলে আর ফুটি-তরমুজের খোসার রসে দাদুর সারাটা শাদামাথা একেবারে চমৎকার চান

করে উঠেছে! বিশ্বাস করো, ঐ না দেখে আমাদের ভারী মজা লাগছিল—যদিও তা যে খুবি অন্যায় অস্বীকার করছি না।

দাদু তাঁর জামার খুঁট দিয়ে মাথাটা মুছে মাকে বলে উঠলেন—'আচ্ছা শয়তানি, আচ্ছা বেয়াদপি তো! ওঃ, গরম জলে কী চানটাই না করালে। আমি কি বড়দিনের ঝলসানো শুয়োর না কি, এ্যাঁ? তা এবারে শোন্ ছোঁড়ারা, এই বাঁদরের বাচ্চারা! তোরা—হ্যাঁ তোরাই এবার রুটির উপর রোজ খেতে পাবি পুরু পুরু মাখন। এই ছাখ, তোদের জন্যে এই কী এনেছি! এখন থেকে তোরা ঘুরে বেড়াবি সোনার পোশাকে। ছাখ, এই চেয়ে ছাখ তোদের জন্যে কী এনেছি!'—এই বলেই দাদু খুলে ফেললেন জালার মুখটা।

ভিতরে কী আছে ধারণা করতে পারছ তো? হ্যাঁ, হ্যাঁ, একটু ভেবেচিন্তে বলো, অনুমান করো? এ্যাঁ, সোনা? কিন্তু তা সোনা নয় মোটেই। আমার বলতে লজ্জা হচ্ছে—তা হ'ল নোংরা আবর্জনা পচাকাদা! থুঃ থুঃ, ওয়াক থুঃ! দাদু থুথু ফেলতে লাগলেন, ছুঁড়ে ফেলে দিলেন জালাটা। ভালো করে ধুয়ে এলেন হাতমুখমাথা।

আর, এই থেকেই দাদু আমাদের দিয়ে এক প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিলেন—শয়তানের উপর আমরা যেন কখনোই আস্থা না রাখি।

···এবারে দেখলে তো তোমরা, মানুষকেই বাগে এনে কিভাবে তার কাজ করে নেয় শয়তান। আমি কিন্তু ঐ ভূতুড়ে জমিটা বেশ ভালোরকমই চিনে রেখেছি। কিছুকাল পরে ফুটি-তরমুজের ক্ষেত তৈরী করবে ব'লে দাদুর কাছ থেকে ওর সবটাই কিনে নিয়েছিল এক কশাক। লাভজনক জমি, ফি-বছর ফসলও হ'ত চমৎকার, কিন্তু ঠিক ঐ ভূতুড়ে জায়গাটিতে কক্ষনো ভালো-কিছু ফলেনি। চাষ দিয়েছে, বীজও পুঁতেছে ঠিকঠিক; তা, ফসল তুলবার বেলায় একটি ফুটিও নয়, একটি তরমুজও নয়, এমনকি একটি শশাও নয়। কেবল শয়তানেই জানে ঐ জমিটা দিয়ে কী হবে।

## জুড়িগাড়ী

কোনোও এক অশ্বারোহী সৈন্যবিভাগ এসে ছাউনি ফেলতেই 'বি'-আদ্যক্ষর-নামের শহরটি যেন গা ঝাড়া দিয়ে উঠল। এতদিন সবকিছুই ছিল বড্ড এক-ঘেয়ে। পথ চলতে চলতে দেখা যেত ছোট ছোট বাড়ীঘর দুপাশে দাঁড়িয়ে

দাঁড়িয়ে কেমন বিষন্নভাবে ঝিমুচ্ছে খালি। তা দেখলে মনটা যে কী রকম হয়ে যেত তা যেন ঠিক বুঝিয়ে বলা যায় না। বাজি রেখে হেরে গেলে কিংবা হঠাৎ বোকার মতো কোনো মন্তব্য করে বসলে যেমনটা হয় আর কি! এক কথায় যাকে বলে খুব-একটা অপ্রীতিকর অবস্থা। পথে-ঘাটে কোনো জনপ্রাণীই চোখে পড়ত না, কখনো বা একটা মোরগ হঠাৎ পেরিয়ে যেত পুলটা। পুল তো নয় যেন মোলায়েম গদি, ধুলো জমে জমেই দশাটা অমন। বর্ষার ছাঁট লেগেছে কি কাদায় কাদায় নরকখানা। বি-শহরের পথঘাট তখন ভরে যেত দুই বিশেষ জাতের প্রাণীতে অর্থাৎ কিনা কেঁচোতে আর শুয়োরে। সেইপথে কখনোই কাউকে গাড়ী নিয়ে বেরুতে দেখা যেত না। ক্বচিৎ চলে যেত কোনো জমিদারের জুড়িগাড়ী।···বাজারের রাস্তার পাশে সেই যে একখানা দোতলা বাড়ীর কাঠামো দাঁড়িয়ে আছে তো দাঁড়িয়েই আছে—বিগত বিশ বছর ধ'রেই। বাজারের ঠিক মধ্যিখানেই ছোট ছোট কয়েকখানি মুদি ও মনোহারী দোকান, আর তাতে সাজানো থাকত আলতা সাবান বিড়ি কল্‌কে খেলনা ইত্যাদি জিনিষপত্র। এবং সেইসব দোকানে বসে বসেই কিন্তু সমানে তাস খেলা চালিয়ে যেত দোকানদারেরা ও তাসের সাথীসঙ্গীরা। তবে, এসবি আগের কথা।

ওসবি আগের কথা। আর, এই সেনাবিভাগ এসে বি-তে হাজির হতেই বদলে গেল সবকিছু—পথে পথে ঝলমল করে উঠল আলো আর রঙীন নিশান। এককথায় সে একেবারেই আলাদা চেহারা। পালক-শোভন টুপি মাথায় চড়িয়ে, এক-একজন সুদর্শন অফিসার চলাফেরা সুরু করে দিল নানা গেরস্ত ঘরবাড়ীর পাশ দিয়ে······কখনো বা তাদের তাস খেলতে দেখা যেত—এই যাকে বলে ধাবন্ত সেনাবিভাগীয় গাড়ীতে।···ঘরবাড়ীর কাছে-কাছে পাঁচিলের পাশ ধরে-ধরে হাওয়া খেতে লাগল একের পরে এক সামরিক টুপি। কোনো কোনো বাড়ীর পাশেই দেখা যাচ্ছে কোনো তরুণ সৈনিক, কিংবা জাঁদরেল গোঁফ—ছোট-সড়কে, অলিগলিতে। আর, সেসব গোঁফ কী গোঁফ,—ঠিক যেন এক-একজোড়া ঝাঁটা, কিংবা জুতোর ব্রাশ! আর, যেখানেই যাবেন, এই গোঁফের মেলা—যাকে বলা যায় গুম্ফ-প্রদর্শনী। মেয়েরা ঝুড়ি-হাতে বাজারে এসে জড়ো হলেই আর কথা নেই, তাদের ঘাড়ের উপর দিয়ে ঝুঁকে পড়বে জাঁদরেল সব গোঁফ! না, এর ব্যতিক্রমটি হবার জো নেই। সত্যিই, স্বাগত সামরিক অফিসারগণই জাঁকিয়ে তুলল স্থানীয় সমাজকে। এ পর্যন্ত থাকা বলতে ছিলেন তো শুধু জজসাহেব, আর থাকতেন তিনি কিনা এক

পুরুতের অন্দরে ; আর ছিলেন বড় দারোগা—যিনি কিনা ঘুমুতেন পড়ে পড়ে ভোর থেকে সন্ধ্যা অবধি—অর্থাৎ কিনা দুপুরের খাওয়ার পরে ছিল তাঁর রাতের খাওয়া, আর রাতের খাওয়ার পরে একঘুমে বেলা দুপুর ! কিন্তু জেনারেল সাহেব এখানে এসে ছাউনি ফেলতেই বি-র শহর-সমাজ হয়ে উঠল সরগরম, এমনকি ফেঁপে ফুলে উঠল আকারেও। এতদিন তো কেউ টেরই পেত না আশেপাশের জমিদারেরা আছেন কি নেই। এবারে কিন্তু তাঁরা এই মফস্বল শহরটিতে যাতায়াত সুরু করে দিলেন সোৎসাহে—সামরিক অফিসারবৃন্দের সঙ্গে কিংবা অন্যান্য ভদ্রলোকদের সঙ্গে মোলাকাত করবার জন্যে, কখনো বা তাসপাশার টানে। ওঁরা আবার তাসপাশা বলতে অজ্ঞান কিনা !

আমাদের নবাগত জাঁদরেল অর্থাৎ কিনা জেনারেল সাহেব একবার এক বিরাট ভোজের ব্যবস্থা করেছিলেন। আমি কিন্তু সত্যিসত্যিই দুঃখিত, এই বিরাট ভোজটা হয়েছিল কী উপলক্ষে তা স্মরণেই আনতে পারছি না। তবে হ্যাঁ, আয়োজনটা হয়েছিল যাকে বলে বিরাট। জাঁদরেলের রান্নাঘরের ঠুনঠান্ আওয়াজই নাকি স্পষ্ট শোনা গিয়েছিল শহরের আর এক প্রান্ত থেকে ! আর, সেই ভোজে ব্যবহার করা হয়েছিল শহরের সমস্ত-কিছুই। এই ধরুন না কেন, জজসাহেব ও পুরুত-গিন্নি নিরিমিষ খান তাম্রপাত্রে ! সেদিন জাঁদরেল সাহেবের আঙ্গিনাটি ভরে উঠল গাড়ীঘোড়ায়, পদার্পণ করলেন এসে কয়েকজন সরকারী অফিসার ও স্থানীয় কয়েকজন জমিদার। আর এই জমিদারদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হলেন কিনা পিফগর পিফগরভিচ শেরৎকুৎস্কি (সংক্ষেপে কুৎস্কি)। এলেন তিনি ফিটফাট একটি গাড়ীতে। বি-শহরের তিনিই হলেন অন্যতম সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি। নির্বাচনী মহড়ায় তাঁর নামেই হৈচৈ হয় সবচেয়ে বেশী, এবং সেই হৈচৈর চোটে তিনি মাথায় তোলেন সারাটা ত্রিভুবন। একসময়ে তিনিই ছিলেন অশ্বারোহী সৈনিকদলে, ছিলেন এই যাকে বলে 'ডাকসাঁইটে' অফিসার। বলনাচের অর্থাৎ কিনা জোড়া-জোড়া ঘূর্ণীনাচের আসরে কিংবা কোনো উৎসবে সবসময়েই দেখা যেত তাঁকে ; দেখা যে যেত তার সাক্ষী রয়েছে তো নানারকম পদস্থ-কর্তাদের মেয়েরাই। তারপর কোনও এক কারণে, সাধারণত যাকে বলা হয় সে এক বিশ্রী ব্যাপার —সেই কারণে পদত্যাগ করতে বাধ্য না হ'লে তিনি বিশেষ সম্মান অর্জন করতে পারতেন অনেক অনেক অন্যান্য বিভাগেও। তা, এক নয় তিনি তাঁর চেয়ে উচ্চপদস্থ কারো মুখে ঘুষি মেরেছিলেন, অথবা সেই উচ্চপদস্থ ব্যক্তি নিজেই

তাঁকে ঘুষি মেরেছিলেন—কোন্‌টা যে সত্যি তা অবশ্যি মনে পড়ছে না—তা যাই হ'ক না কেন, তার ফলেই তাঁকে পদত্যাগ করতে অনুরোধ করা হ'ল। অবশ্যি, এতেই মুষড়ে পড়বার লোক নন তিনি ; প্যান্টকোট জাঁকিয়ে পুচ্ছ-ওয়ালা জুতো পায়ে চড়িয়ে, প্রজাপতি-মার্কা গোঁফ বাগিয়ে, চলাফেরা করতে লাগলেন সমানেই। এই শেষোক্ত ফ্যাসান-দস্তুরটির উপর সবিশেষ নজর ছিল তাঁর,—তাঁকে পদাতিক বাহিনীর লোক বলে ভুল না করা হয় সেজন্যেই। কারণ, উক্ত বাহিনীটির নামে শুনলেই তিনি নাক সিঁটকোতেন কিনা। এই জমিদার সাহেব গত নির্বাচন সূত্রে সারাটা ভদ্র-সমাজকে নিমন্ত্রণ করে খাওয়ানোর সময়েই নিবেদন করছিলেন যে তাঁকে তাঁরা যদি সভাপতি নির্বাচন করেন তো তাঁদেরকেই অর্পণ করবেন উঁচু উঁচু পদ। অর্থাৎ কিনা সবদিক দিয়েই চলেন তিনি জমিদারী চালে,—গাঁয়ের ভাষায় বলা হয় যেমনটা। অপূর্ব সুন্দরী একটি তরুণীকে তিনি বিয়ে করেছিলেন, এবং তার সঙ্গে যৌতুক পেয়েছিলেন দু'হাজার-ঘর প্রজা এবং নগদ কয়েক হাজার টাকা। টাকাটা পেয়েই তিনি কিনে ফেললেন একটা ছয়-ঘোড়ার জুড়িগাড়ী। আহা কী যে চমৎকার ছিল সেই ঘোড়াগুলি। আর, গাড়ীর দোরের হাতলটি পর্যন্ত ছিল কিনা গিল্টি সোনার। গৃহসজ্জার জন্যে কিনলেন তিনি এক পোষা বাঁদর, আর রাখলেন একজন সরকার। তারপর কোনও ব্যাপারে সেই দু'হাজার প্রজা এবং সেই সঙ্গে নিজস্ব দ্বিগুণ-সংখ্যক বন্ধক রাখলেন। এককথায় তিনি ছিলেন জমিদারবাবুদের ঠিক যেমনটি থাকা উচিত। এই, কথায় যাকে বলে জমিদার বটেন। আলোচ্য ভোজোৎসবে তিনি ছাড়া আরো কয়েকজন জমিদার উপস্থিত ছিলেন, কিন্তু চোখে পড়বার মতো একটা-কিছু নন। অন্যান্যরা হলেন সেনাবিভাগের অফিসার : দুজন ষ্টাফ অফিসার, একজন কর্ণেল, এবং আরেকজন—যাকে বলা যায় 'পেটমোটা মেজর'। আমাদের জাঁদরেল সাহেব ছিলেন বেশ জোয়ান চেহারার লোক এবং ভালো লোক। অফিসারদের মত হ'ল তাই। তিনি কথা বলেন ভারিক্কী গলায়। কিন্তু, এসব থাক এখন। তা, সেই ভোজটি হয়েছিল উপাদেয়। ষ্টার্জন, পম্‌প্লেট এবং আরো নানাবিধ মৎস্য, মুরগী, হাঁস, ভেড়া, কপি বীট, জ্যাম জেলি, আরো কতো কী। চার-চারটি সুশিক্ষিত সৈনিক সারাটা রাত ধরেই রান্নাবান্নায় সহায়তা করেছে পাচককে! ভোজের টেবিল তো বোতলের মেলা : লম্বা-গলাওয়ালাগুলিতে 'শ্যাম্পনে' সুরা, খাটোগুলিতে 'মাদেরিয়া'। তখন বসন্তের সকাল, ঘরের

জানালাগুলি রয়েছে আগাগোড়া খোলা, আর টেবিলে সারি সারি প্লেট। তুমুল আলোচনায় চড়ে উঠছে জেনারেলের জাঁদরেল গলা, সমস্ত কথাই হাবুডুবু খাচ্ছে সুরাস্রোতে। অর্থাৎ কিনা সবি ঠিক যেমনটি হওয়া উচিত। খাওয়া দাওয়ার পরে উঠে দাঁড়ালেন সবাই—একসারি যেন টইটম্বুর রসের জালা! এবারে সবাই লম্বা বা খাটো পাইপ ধরিয়ে, হাতে হাতে কফির পেয়ালা নিয়ে বেরিয়ে এলেন বাইরে।

'চলুন, এবারে দেখা যাক ওকে।'—জাঁদরেল সাহেব বললেন এবং সুদর্শন একটি সহকারী অফিসারকে নির্দেশ দিলেন—"ঘোড়াটাকে আনতে বলো।" হ্যাঁ, এবার আপনারা স্বচক্ষেই দেখতে পাবেন।'—জাঁদরেল তাঁর পাপইটায় টান মারেন প্‌ প্‌ প্‌ পাঃ! ধুঁয়ো ছাড়েন একরাশ, তারপর বলতে থাকেন—"তা, এখনো অবশ্যি বড়সড়টি হয়নি। তা, এই বাজে শহরে ভদ্রভাবের একটা আস্তাবল পর্যন্ত নেই! তবে, আমার ঘোড়াটি—প্‌ প্‌ পাঃ, সত্যিই বড় চমৎকার ঘোড়া।'

জমিদার বুৎস্কি পাইপ টানতে টানতে জিজ্ঞেস করেন—'আপনার কাছে রয়েছে, প্‌ প্‌ পাঃ—কতদিন হ'ল?'

'প্‌ প্‌ প্‌ প্‌ পাঃ—বেশীদিন নয়। এই বছর দুই হ'ল।'

'এখানে এনে শিক্ষা দিয়েছেন, না আগেই শিক্ষা পেয়েছে?'

'প্‌ প্‌ প্‌ ফুউ উ উ উ উঃ! এখানে।'—এবং সঙ্গেসঙ্গেই জাঁদরেল সাহেব ডুবে যান ধুঁয়োর কুণ্ডলীর মধ্যে।

ওদিকে আস্তাবল থেকে বেরিয়ে এল এক সৈনিক। শোনা গেল অশ্ব-খুড়ের শব্দ। লম্বা গোঁফওয়ালা আর-একটি সৈনিক ধরে ধরে নিয়ে আসছে বলগাটা। তা, ঘোড়াটা হঠাৎ ভয় পেয়ে মাথাটা উচিয়ে তোলে, আর সেই টানে মাটি ছেড়ে উঁচিয়ে ওঠে সৈনিকটি ও তার গোঁফজোড়া!

'আঃ আস্তে, আস্তে আগ্রাফিনা!'—সৈনিকটি আগ্রাফিনাকে নিয়ে আসে বারান্দায়।

আগ্রাফিনা নামের এই ঘোড়াটির চেহারাটি কী নিটোল ছিমছাম। পাইপটা নামিয়ে জাঁদরেল সাহেব আগ্রাফিনার দিকে তাকিয়ে থাকেন পরম পরিতৃপ্তিতে। বারান্দা থেকে বেরিয়ে এসে আগ্রাফিনার মুখখানি ধরে আদর করেন কর্ণেল, পায়ে হাত বুলিয়ে দেখেন পেটমোটা মেজর, অন্য সবাই জিভ দিয়ে শব্দ করতে থাকে চক-চক চক-চক!

কুৎস্কি এগিয়ে এসে ঘুরে ফিরে দেখতে থাকেন ঘোড়াটার চারদিকটা। সৈনিকটি তাকিয়ে থাকে তাঁর দিকে ভুরু দুটো কুঁচকে—এক্ষুনি যেন ঝাঁপিয়ে পড়বে কুৎস্কির ঘাড়ের উপরে!

'বা বাঃ, বেড়ে ঘোড়া!'—বলে ওঠেন কুৎস্কি—'আহা হা, কী সুন্দর গড়ন! আচ্ছা, একটা কথা জানতে পারি কি, ওর চালচলনও কি এমনি সুন্দর?'

'আহা হা, চলতে দেখলেই দু'চোখ জুড়িয়ে যায়। তা, এই কদিন হ'ল আমাদের পশু-চিকিৎসক ভগবানের নাম করেই কী একটা অষুধের বড়ি খাইয়ে দিয়েছেন তো, এখন এই দু'দিন ধরেই কেবল হাঁচি আর হাঁচি।'

'সত্যিই চমৎকার। তা, স্যর, ওর যোগ্য গাড়ী আছে তো আপনার?"

'জুড়িগাড়ী! তা, এটা তো কদমের ঘোড়া।'

'তা, তা তো দেখতেই পাচ্ছি। আমি বলছিলাম কি, অন্য ঘোড়াও তো রয়েছে আপনার, তার উপযুক্ত গাড়ী আছে না?'

'তেমন একটা যে আছে তা বলতে পারব না। সত্যিই বহুদিন থেকেই অভাব বোধ করছি হালফ্যাশানের একটা জুড়িগাড়ীর। রাজধানীতে আমার ভাইয়ের কাছেও লিখেছি। তা, আমাকে পাঠাবে কিনা সে-ই জানে।'

'আমার মতে দেখুন স্যর,'—কর্ণেল মন্তব্য করেন মাঝখানে—'ভিয়েনায় তৈরী জুড়িগাড়ীই সবার সেরা।'

'ঠিকই বলেছ, প্ প্ প্ পাঃ।'

'আমার কিন্তু চমৎকার একটি জুড়িগাড়ী আছে, সত্যিকার ভিয়েনায় তৈরী!'—বলে ওঠেন কুৎস্কি।

'যেটায় এসেছেন?"

'না, না, সেকি! ওটা তো সাধারণ একটা গাড়ী, এই নিজেই একটু যাতায়াত করি ওটাতে। তবে অন্যটা⋯ওঃ, সে এক আশ্চর্য গাড়ী! এই ধরুন, তুলোর মতোই হাল্কা! আর, একটিবার ভিতরে ঢুকেছেন তো মনে হবে, অবিশ্যি কিছু মনে না করেন তো বলি, মনে হবে আপনার ধাই-মা আপনাকে আবার যেন দোলনায় চড়িয়ে দোল দিচ্ছে!'

'বেশ আরামের তো তা হ'লে!'

'হ্যাঁ আরামের বলতে আরামের! এই গদি রয়েছে, তলায় স্প্রিং রয়েছে, ঠিক যেন একটি ছবি!'

'বাঃ বেশ সুন্দর তো!'

'তাছাড়া, ভিতরটায় জায়গাও খুব। দেখুন স্যর, ওরকমটি আর দেখলাম না কোথাও। চাকুরীকালে এই আমি তার ভিতর-বাক্সে রাখতাম দশদশ বোতল মদ, সের দশেক তামাক, দু-দুটো সামরিক পোশাক, জামাজুতো এবং বড় বড় একজোড়া পাইপ!…তাছাড়া, গাড়ীর পকেটেই রাখা যেত কিনা আস্ত একটা জ্যান্ত ভেড়া!'

'বাঃ বেশ তো!'

'হ্যাঁ স্যর, ওই গাড়ীটির জন্যে আমাকে গুণে গুণে দিতে হয়েছে নগদ চারটি হাজার।'

'দাম শুনে তো মনে হচ্ছে খুবি চমৎকার হবে গাড়ীটা। তা, আপনি কি নিজেই দেখে শুনে কিনেছিলেন!'

'উহুঁ! এই, পেয়ে গেলাম হঠাৎ। গাড়ীটা কিনেছিল আমারি এক বন্ধু। জানলেন, ভারী চমৎকার লোক—আমারি সে ছেলেবেলার বন্ধু। আপনার তাকে খুবি ভালো লাগবে, স্যর। সে আর আমি হলাম একেবারে হরিহর আত্মা! তার ও আমার আলাদা বলে কিচ্ছুটি নেই—সবি একাকার। একবার আমি তাসখেলায় বাজি জিতে তার কাছ থেকেই পেয়ে গেলাম গাড়ীটা। আচ্ছা স্যর, কাল দুপুরে আমাদের বাড়ীতে আপনার নিমন্ত্রণ রইল, অনুগ্রহ করে না বলবেন না, স্যর! গাড়ীটাও দেখবেন তখন।'

'তা, না বলি আর কেমন ক'রে? তবে কিনা আমি একা…আচ্ছা, আমার এইসব সঙ্গীদেরও কি নিয়ে আসতে পারি?'

'সে তো খুবি সুখের কথা! আমার বাড়ীতেই আপনাদের সকলকে পাব—সে তো আমার সৌভাগ্যেরই কথা।'

কর্ণেল মেজর ও অন্যান্য অফিসারগণ তখন মাথা নুইয়ে ধন্যবাদ জানাল।

জমিদার কুৎস্কিবাবু তখনো বলতেই থাকেন—'দেখুন স্যর, আমার মতে কোনো জিনিস কেনেন তো ভালোটা দেখেই কিনবেন; তা নইলে কেনার কোনো মানেই হয় না। আমি আমার জমিদারীতে কৃষিকাজের জন্যে যেসব বিভিন্ন রকম যন্ত্রপাতির ব্যবস্থা রেখেছি, হ্যাঁ আমার ওখানে গেলে আপনাদের তাও দেখাব।'

জাঁদরেল সাহেব একদৃষ্টে জমিদার সাহেবের দিকে তাকিয়ে থেকে ধুঁয়ো ছাড়েন একরাশ।

অফিসারদের নেমন্তন্ন করাতে জমিদার সাহেবের আজ ভারী খোশ-মেজাজ।

ভোজে পোলাও-কোপ্তা-পিঠে সুরা-সরবৎ ইত্যাদি কী কী খাওয়াবেন ইতিমধ্যেই বসে বসে তার একটা লম্বা ফর্দ করতে লেগে গেলেন, এবং অফিসারদের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে বিনয়ের হাসি হাসতে লাগলেন। এবং তাঁরাও বিনিময়ে দ্বিগুণতর বিনয়ের ভাব ধারণ করলেন—তাঁদের চোখের কেমন আনত দৃষ্টিতেই তা ধরা পড়ছিল। জমিদারবাবু এবারে হয়ে উঠলেন আরো সহজ, তাঁর কণ্ঠস্বর জড়িয়ে এল খুশিতে—'দেখুন স্যর, আমার স্ত্রীর—মানে গৃহকর্ত্রীর সঙ্গেও পরিচয় করে দিয়ে আনন্দ লাভ করব।'

'সে তো খুবি সুখের কথা।' জাঁদরেল গোঁফ মোচড়াতে থাকেন।

এরপরে কুৎস্কি ভারী ব্যস্ত হয়ে উঠলেন আগামী কালের অভ্যর্থনার এবং ভোজোৎসবের সুব্যবস্থায় বাড়ী ফিরবার জন্যে। টুপিটা তুলে মাথায়ই চড়াতে যাচ্ছিলেন—কিন্তু অবাক কাণ্ড, খানিকটা দেরী করতে লাগলেন। ওদিকে ঘরে পাতা হয়েছে তাসখেলার টেবিল, লোকজন সবাই খেলতে বসেছে চার-চার ভাগে। ধরানো হয়েছে ঝাড়লণ্ঠন। আমাদের জমিদার বাবুটি বহুক্ষণ পর্যন্ত স্থির করে উঠতে পারলেন না—তিনিও বসে পড়ে খেলবেন কিনা। অফিসারগণ বারবার অনুরোধ করতে থাকলে, অন্যায় ও অভদ্রতা হবে ভেবে বসেই পড়লেন। তাঁর সামনে অমনি হাজির হ'ল এসে একগ্লাস দামী সুরা, এবং কেমন যেন উদাসীন ভাবেই তিনি খেয়ে ফেললেন সবটাই। দু'হাত খেলার পরে আরো এক গ্লাশ। এবারেও অনাসক্ত ভাবেই। খাওয়ার আগে অবশ্যি বলে নিলেন-'দেখুন মহাশয়েরা, এবারে আর বাড়ী না ফিরলে নয়। না না, আর দেরী করা যাবে না।' অথচ আবারো খেলতে বসলেন আর একহাত। ইতিমধ্যে ঘরের সর্বত্রই জমে উঠেছে নানারকম আলাপ আলোচনা। যারা 'হুইষ্ট' বাজি খেলছেন তাঁরা কিন্তু নিঃশব্দ গম্ভীর। যাঁরা কেবলমাত্র দর্শক—সোফায় হেলান দিয়ে কথাবার্তা বলছেন নিজেদের মধ্যে। একপ্রান্তে তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে বসে আছেন কাপ্তান সাহেব—দাঁত দিয়ে পাইপটা এঁটে ধরে মন খুলে শোনাচ্ছেন তাঁর এক প্রণয়-কাহিনী। শ্রোতারা ঝুঁকে পড়েছে চারদিক থেকে। এক জমিদারও ছিলেন এঁদের মধ্যে। তাঁর মোটাসোটা খাটোখাটো হাত দুখানা দেখতে যেন প্রকাণ্ড দুটো নৈনীতাল আলু! সারা মুখে একগাল হাসি নিয়ে গদগদ ভঙ্গীতে শুনছিলেন তিনি, আর কষ্টেসৃষ্টে সেই মোটা-খাটো হাত দিয়ে পিছন পকেট থেকে তুলে আনতে চেষ্টা করছিলেন নস্যির ডিবেটা! চতুরঙ্গ কুচকাওয়াজ বিভাগে জোর আলোচনা চলছিল পাশেই। আর কুৎস্কি দু-দুবার বিবির

বদলে টেক্কা ফেলে এখন পাশের আলোচনায় যোগ দেবার মতলবে বলছিলেন—'তা, তা, কোন্ বছরে বললেন ?' কিংবা বলছিলেন—'কি বললেন, কোন্ সৈন্ত-বিভাগে ?' অথচ তিনি কিন্তু লক্ষ্যই করছিলেন না যে আলোচ্য বিষয়ের সঙ্গে তাঁর প্রশ্নের নেই কোনো যোগমাত্রও।

রাতের খাবার আনা হ'লে বন্ধ হ'ল খেলা, তবে আলোচনা চলতে লাগল সমানেই। খেলা বন্ধ হ'লেও সবার মাথার ভিতরে সুরার খেলা চলছে তখনো! জমিদার বন্ধুটির হঠাৎ মনে হ'ল, খেলায় ঠিকই জিতেছেন (পকেট যদিও গড়ের মাঠ!); তারপর টেবিল থেকে উঠে কিছুক্ষণ তিনি এমন ভাবে দাঁড়িয়ে রইলেন যেন হারিয়ে গেছে তাঁর রুমালখানা। ইতিমধ্যে সুরু হ'ল খাবার পরিবেশন। আর, একথা তো বলাই বাহুল্য যে জমিদার বাবুটি তখন অসহযোগ করেননি। তিনিও তাঁর গ্লাসটা ভর্তি করে নিলেন—অনেকটা যেন ঠেকায় প'ড়েই! তা, ডানে বাঁয়ে চারদিকেই যখন কেবল বোতল বোতল আর বোতল, তখন আর উপায়ই বা কী। এবারে ভোজালাপ বেশ দীর্ঘ ও ঘোরালো হয়ে উঠল, এবং তা বেশ একটু অদ্ভুত ধরণের হ'ল বটে! কেনো এক কর্নেল—যিনি ১৮১২-র সামরিক অভিযানে ছিলেন, তিনি এমন এক যুদ্ধ বর্ণনা করছিলেন আসলে যা ঘটেইনি কোনোদিন। তারপরেই কোনো এক রহস্যময় কারণে তিনি কিনা হঠাৎ আগুনের মধ্যে ছুঁড়ে মারলেন তাঁর হাতের চামচটা—অর্থাৎ কিনা সবকিছুই এক কথায় বলতে হ'লে বলতে হয়, অতিথিরা সবাই যখন বিদায় নিলেন তখন রাত তিনটে, এবং কোনো কোনো বাবুকে তাঁদের কোচোয়ান দুহাতে কোলপাঁজা করে বয়ে আনল—ঠিক এক-একটা বস্তা! জমিদারবাবু নিজে তাঁর বংশমর্যাদার কথাটা ভুলে গিয়ে, গাড়ীতে ওঠার সময় মাথাটা এতটা নুইয়ে অভিবাদন জানালেন যে, বাড়ীতে পৌছলে দেখা গেল তাঁর গোঁফের মধ্যে লেগে রয়েছে দু-দুটো খড়ের টুকরো!

বাড়ীতে সবাই তখন ঘুমে। কোচোয়ান তো কোনোরকমে সজাগ করে তুলল চাকরটাকে। চাকরটা বৈঠকখানার মধ্য দিয়ে মনিবকে বয়ে এনে, তুলে দিল পরিচারিকার জিম্মায়। মনিবটি কোনোরকমে শোবার ঘরে পৌছেই শুয়ে পড়লেন তাঁর তরুণী স্ত্রীর পাশে। স্ত্রীটি তখন তুষার-শাদা মসলিন গাউন পরে ঘুমিয়ে ছিলেন অতি মনোরম এক ভঙ্গিমায়। বিছানার উপরে স্বামী-দেবতার-দেহ পতনের ধাক্কায় হঠাৎ জেগে উঠলেন, গা আড়মোড়া দিয়ে একটিবার চোখ মেললেন, মুখে ফুটে উঠল রাগের ভাব জড়ানো একখানি হাসি! কিন্তু

স্বামীটির সেদিকে কোনো নজরই নেই, আবার তাই শুয়ে পড়লেন পাশ ফিরে— নিজের হাতের উপর নরম গালটি রেখে ঘুমিয়ে পড়লেন।

তরুণী গৃহকর্ত্রীটি যখন ঘুম থেকে জাগলেন তখনো সমানে নাসিকা গর্জন করে চলেছেন তাঁর পতি-দেবতা। সে সময়টাকে দেশগাঁয়ে খুব একটা ভোর-বেলা বলা চলে না। শেষরাতে এসে ঘুমিয়েছেন তো, তাই ভেবে আর তাঁকে জাগানো হ'ল না। নিজে উঠে দামী একটা 'স্লিপার' পরলেন (এটা তাঁর স্বামী নিজে তৈরী করিয়ে এনেছেন রাজধানী থেকে), এবং চট করে একটা ড্রেসিং জ্যাকেট চড়িয়ে দিলেন তাঁর খালি গায়ে। ড্রেসিং জ্যাকেটটা এলিয়ে ছড়িয়ে পড়ল তাঁর চারপাশে—ঠিক যেন ফোয়ারা! এবারে স্নানঘর-সাজঘরে এসে সর্বাঙ্গ ধোয়ামোছা করলেন সুগন্ধি জলে, আর সে জলও ছিল তাঁর দেহের মতোই নির্মল! এবারে চলে এলেন সাজ-টেবিলের সামনে। আর, আয়নায় তাঁকে ভারী সুন্দর মনে হতে লাগল। এবং এই বিশিষ্ট ঘটনাটিকে কেন্দ্র ক'রে, আয়নার সামনেই তিনি কাটিয়ে দিলেন বাড়তি দু-দুটো ঘণ্টা! শেষপর্যন্ত তিনি সুন্দর একটি পোশাক পরে বাগানে নেমে এলেন বিশুদ্ধ বায়ু সেবন করতে। আর, ঠিক এজন্যেই যেন সেদিনের আবহাওয়াটি হয়ে উঠল বেশ মিঠে ধরণের। তা, গর্ব করার মতো দখিণা আবহাওয়া বটে! ...মাথার উপরে উঠে এসেছে সূর্য, ছড়িয়ে দিচ্ছে প্রখর রোদ। তবে, সঘন বীথির ছায়াপথ ধরে হাঁটতে কী যে আরাম! সূর্যতাপে ফুলদল তাদের প্রাণকোষ উজাড় করে ছড়িয়ে দিচ্ছে মাতাল সুরভি। আমাদের সুন্দরী গৃহকর্ত্রীটির কিন্তু একেবারেই খেয়াল নেই যে ইতিমধ্যে বারোটা বেজে গেছে এবং বাড়ীর কর্তাটি তখনো ঘুমে!

আস্তাবলের পিছনের ঘরটা থেকে শোনা যাচ্ছে মধ্যাহ্ন-ভোজন শেষে কোচোয়ানের নাসিকা-গর্জন। আমাদের গৃহকর্ত্রীটি তখনো বাগানের ছায়ায় বসে আছেন নিরালায়। সামনেই স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে বড় সড়কের দৃশ্য। উদাস চোখে গৃহকর্ত্রীটি তাকিয়ে রইলেন প্রান্তরের দিকে। হঠাৎ চোখে পড়ল: দূরে জমে উঠছে ধুলোমেঘ। ভুরু কুঁচকে নজর করে দেখতে দেখতে মনে হ'ল কয়েকটা গাড়ী। সামনেরটা হালকা ধরণের—ভিতরে দেখা যাচ্ছে এক জেনারেলকে, জামায় আঁটা পদক ঝলমল করছে রোদে, পাশেই কর্নেল। তার পরেই আর একটা গাড়ী, সেখানে রয়েছে জেনারেলের সহকারী এবং আর দুইজন অফিসার। পিছনেই আসছে বহু সেনাবিভাগীয় গাড়ী, এবং দেখা যাচ্ছে সেগুলি রয়েছে মেজরেরই কর্তৃত্বাধীনে। তারও পিছনে আসছে আর একটা চারজনের-গাড়ী, গাড়ীর

ছাতের উপরেও একজন ব'সে। সবার শেষে সুন্দর তিনটি ঘোড়ার পিঠে তিনজন অফিসার, এগোচ্ছেন তাঁরা ধূলোমেঘের মধ্য দিয়ে।

'অবাক কাণ্ড তো, আমাদের দিকেই আসছে যে!'—গৃহকর্ত্রীটি ভাবছেন 'ও তাই তো, পুলের কাছটায়ই তো মোড় নিচ্ছে!' সঙ্গেসঙ্গেই তিনি হাত-তালি দিতে দিতে, ফুলের মধ্য দিয়ে, ফুলের উপর দিয়ে, সোজা ছুটে এলেন স্বামীর শয়নকক্ষে। তখনো কিন্তু স্বামীদেবতাটি ঘুমুচ্ছেন প'ড়ে প'ড়ে—মড়ার মতো।

'ওঠো, ওঠো শিগগির।'—স্বামীর হাত ধরে ঝাঁকুনি দেন।

'হুম্'—জমিদারবাবু আড়মোড়া দেন, কিন্তু চোখের পাতা খোলেন না।

'ওঠো, ওঠো বলছি! অতিথিরা এসে পড়লেন যে!'

'অতিথি? কোন্ অতিথিরা?'—বলার সঙ্গে সঙ্গেই মুখ দিয়ে একটা ম্ ম্ ম্ আওয়াজ বের করে বলেন—'তুমি এখনে এসো···'

'আঃ ওঠো, ওঠো জলদি, আমার মাথা খাও! ওঠো এক্ষুনি, এক্ষুনি ওঠো! জেনারেল আসছেন অফিসারগণ আসছেন। একি, তোমার গোঁফের মধ্যে যে খড়ের টুকরো!'

'এ্যা, কি বললে? জেনারেল? সর্বনাশ, এরি মধ্যে এসে গেছেন? চাকর-বাকর কেউ আমাকে জাগায়নি কেন? তা, ভোজের কি কি ব্যবস্থা হয়েছে? সবি ঠিকঠাক আছে তো?'

'কোন্ ভোজের কথা বলছ তুমি?'

'বাঃ রে, তোমাকে বলেছিলাম না?'

'কে বলেছে? তুমি? এলেই তো শেষরাতে চারটায়। তা, আমি বারবার জিজ্ঞেস করা সত্ত্বেও একটা কথাও তো বললে না। তা, তোমাকে জাগাতেও কষ্ট হচ্ছিল, এত কম ঘুমিয়েছ···'—শেষের দিকের কথা কটি বলেন খুব ইনিয়ে বিনিয়ে দরদের সুরে।

কুৎস্কি চোখ রগড়াতে রগড়াতে বিছানার উপরে বসে থাকেন বজ্রাহতের মতো। তারপর হঠাৎ লাফিয়ে মেজেতে নেমে কপাল চাপড়ে বলে ওঠেন—'ওঃ, আমি কী গর্দভ? আমি নিজেই তাঁদের সাদরে আমন্ত্রণ করেছি ভোঁজে। এখন, কি করি? আচ্ছা, ওরা খুব দূরে আছেন কি?'

'তা, আমি কি করে বলব?···যে কোনো মুহূর্তেই এসে পড়তে পারেন।'

'গিন্নি, ও গিন্নি!···শিগগির, শিগগির লুকিয়ে পড়ো! কে, কে ওখানে?

আচ্ছা হাঁদারাম তো! বলি, ভয়টা কিসের? কয়েকজন অফিসার এক্ষুণি এসে পড়ছেন। তাঁদের বলবে—'বাবু বাড়ী নেই···ভোরেই বাইরে চলে গেছেন··· বুঝলে তো? হ্যাঁ, আর সব ঝি-চাকরদেরও বলে দাও। জল্‌দি। আরো জলদি!'

—এই বলতে না বলতেই জমিদার সাহেব একটা কম্বল নিয়ে গরাজ-ঘরের দিকে মরি-বাঁচি দে ছুট—সেখানেই গা ঢাকা দিয়ে থাকবেন। কিন্তু গরাজ-ঘরের একটা কোণে দাঁড়িয়েই মনে হ'ল, জায়গাটা অদৃশ্য হয়ে থাকবার মতো যথেষ্ট নিরাপদ নয়। 'এর চেয়ে বরং'—হঠাৎ একটা মতলব খেলে যায় মগজের মধ্যে, এবং সঙ্গেসঙ্গেই তিনি জুড়িগাড়ীটার মধ্যে ঢুকে প'ড়ে বন্ধ করে দেন দরজাটা। এবং অধিকতর নিরাপত্তার জন্যে কম্বলটা গায়ে জড়িয়ে টুপিটা দিয়ে মাথাটা ঢেকে, পড়ে থাকেন দলা পাকিয়ে।

ইতিমধ্যে বাড়ীর ফটকে এসে পৌঁছেছে গাড়ীর পর গাড়ী। জেনারেলই সর্বপ্রথম গাড়ী থেকে বেরিয়ে প'ড়ে গা ঝাড়া দিলেন; তাঁর পরেই দুহাতে টুপির পালক সাজাতে সাজাতে বেরিয়ে এলেন কর্ণেল।—তার পরে পেটমোটা মেজর-বগলের নিচে ঝুলছে এক তলোয়ার; তারপরে শীর্ণদেহ লেফটেনেণ্ট ও আর সব অফিসারগণ, এবং সবশেষে ঘোড়া থেকে নামলেন বাকী অতিথিরা।

'বাবু তো বাড়ী নেই?' একটা চাকর সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে এসে জানিয়ে দিল।

'বাড়ী নেই? দুপুরে খাবার সময় ফিরবেন নিশ্চয়ই।'

'না, আজকের মতোই বেরিয়েছেন, ফিরবেন কাল এমনি সময়ে।'

'আচ্ছা?'—বিস্ময়ে বলে ওঠেন জেনারেল—'তার অর্থ?'

'নিশ্চয়ই ঠাট্টা করছেন।'—কর্ণেল হাসেন।

'ঠাট্টা! তার অর্থ?'—জেনারেল অপ্রীতির সুরে বলতে থাকেন—'কি বিশ্রী ব্যাপার? অভ্যর্থনা না করতে পারো তো নেমন্তন্ন করাটা কেন?'

'আমি কিছুতেই বুঝতে পারছি না, স্যর, মানুষ কি করে এহেন ব্যবহার করতে পারে?'—মন্তব্য করেন এক তরুণ অফিসার।

'সত্যিকথা। তা' যদি কিছু ঘটেই থাকে তো আগেভাগে জানালেই হ'ত, আর তা নয় তো নিমন্ত্রণ ফেরৎ নিলেই চলত।'

'তা, এখন আর কি করা যাবে, স্যর? ফেরা ছাড়া পথ নেই।'—বলেন কর্ণেল।

'তা ঠিকই, ফেরা ছাড়া উপায় কি ? তা, আমরা তাঁকে না পেলেও তাঁর গাড়ীটা তো দেখা যেতে পারি। সেটাকে সম্ভবত সঙ্গে নিয়ে বেরোননি। এই, কে আছ ? এসো তো এদিকে।'

'বলুন, স্যর !'

'আস্তাবলটা—মানে জুড়িগাড়ীটা দেখতে পাব তো ?'

'হ্যাঁ স্যর, চলুন।'

'কিছুদিন হ'ল তোমার মনিব যে গাড়ীটা এনেছেন, সেটা একবার দেখাও তো আমাদের।'

'আসুন স্যর, কষ্ট করে গাড়ী-ঘরটায় একটু আসুন।'

জেনারেল ও অফিসারবৃন্দ গাড়ী-ঘরটার দিকে গেলেন।

'গাড়ীটা একবার নাড়াচাড়া করে দেখতে হবে, এখানটায় যা অন্ধকার !'

জেনারেল ও অফিসারগণ গাড়ীটার চারপাশে ঘুরে ফিরে নিখুঁত নজরে দেখতে থাকলেন গাড়ীটার চাকা ও স্প্রিং।

'দেখবার মতো তেমন কিছু নেই তো ? অত্যন্ত সাধারণ গাড়ী !'—মন্তব্য করেন জেনারেল।

'অত্যন্ত সাধারণ গাড়ী ! দেখবার মতো কিছুই নেই !'—সায় দেন কর্ণেল।

'দেখুন স্যর, আমাদের কিন্তু মনে হয় না এরই দাম চার হাজার !'—মন্তব্য করেন এক তরুণ অফিসার।

'কি বলছ ?'

'আমি বলছিলাম কি, এর দাম চার হাজার হবে না।'

'চার হাজার ? এর দাম দুই-ও হবে না। চেয়ে দেখবার মতো কী বা আছে এমন ? অবশ্যি, ভিতরটায় যদি কিছু না থেকে থাকে। হ্যাঁ, দোরটা খুলে দেখাও তো একবার…'

আর তখন ? সকলের চোখের সামনেই : টুপি ও কম্বল জড়িয়ে দলা-পাকিয়ে বসে আছেন স্বয়ং জমিদার বাবু ?'

'ও, আপনি এখানে ?'—বিস্ময়ে বলে ওঠেন জেনারেল, এবং সঙ্গেসঙ্গেই তাঁর মুখের উপর দড়াম্ করে দোরটা বন্ধ ক'রে, দলবল নিয়ে বেরিয়ে যখন সোজা।

# ॥ সেইণ্ট-জন সন্ধ্যা ॥

[ গাঁয়ের গির্জা ও কবরখানার তত্ত্বাবধানকারীর মুখে-শোনা সত্যিকার গল্প ]

ফোমা গ্রিগরিয়েভিচ্ অর্থাৎ আমার দাদু মরে গেলেও কখনো একই গল্প দুবার করে বলতেন না। কখনো বা কারো সনির্বন্ধ অনুরোধেই এক গল্পই আবার বলতে রাজি হয়েছেন, কিন্তু তখন এমন কিছু ঢুকিয়ে দেবেন, নয়তো এমন বদলে ফেলবেন যে তোমরা বুঝতেই পারবে না সেটা আগের সেই গল্প। সেবার হ'ল কি,…কলাই সবুজ রঙের কোট-গায়ে এক তরুণ এল—সঙ্গে নিয়ে এসেছে একখানা ছোট্টবই, বইয়ের মাঝামাঝি জায়গাটা আমাদের সামনে খুলে ধরে দেখাল। দাদু তাঁর চশমাজোড়া নাকে চড়াতে যাচ্ছেন, তখন মনে পড়ল সুতো আর মোম দিয়ে ওটা সারানো হয়নি, আমার হাতে দিলেন বইটা। আমি পড়তে জানি অথচ চশমা পরি না, গলা ছেড়ে পড়তে লেগে গেলাম। দুটো পৃষ্ঠা উল্টেছি কি দাদু হঠাৎ আমার বাহুটা ধরলেন সজোরে—'দাঁড়াও, আগে বলো দেখি—কি ওটা পড়ছ?'

সত্যি বলতে কি, প্রশ্নটা শুনে আমি একটু ঘাবড়েই গেলাম—'এ কি বলছেন আপনি, আপনার গল্পটাই তো পড়ছি—আপনার নিজের মুখের কথা।'

'কে বলেছে ওটা আমারি গল্প?'

'আরো ভালো কি কি প্রমাণ চান বলুন,—এই তো ছাপা রয়েছে এখানে: অমুক জায়গায় অমুক কর্তৃক কথিত।'

'চুলোয় যাক না যে-ব্যাটা ছেপেছে এটা! মিথ্যে বলছে, বজ্জাতের ব্যাটা! আমি কি ওভাবে বলেছি? করো মাথায় যদি ইস্‌ক্রু আল্‌গা থাকে তো আমি কি করতে পারি? এবার আমিই বলছি, শোন্।'

আমরা তো জড়ো হয়ে বসলাম তাঁর চারদিকে।

আমার দাদু (শান্তিতে বিশ্রাম নিন তিনি! পরপারে এখন যেন তিনি খেতে পান শুধু ঘি-চপচপে চাপাটি আর মধু-মাখা পুলিপিঠে!)—আমার এই দাদু ছিলেন গল্প বলায় মহা-ওস্তাদ। একবার গল্প বলতে শুরু করেছেন কি, উদয়াস্ত একঠাঁয় বসে শুনে যেতে হবে—ভুলে যাবে নড়ন-চড়ন।…কিন্তু,

আমার দাদুর গল্পবলার সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্যটি হ'ল : দাদু জীবনে কখনো মিথ্যেকথাটি বলেননি, আর তিনি যা বলেছেন সত্যিসত্যিই ঘটেছিল তা।

তাঁর চমৎকার সব গল্পমালার একটি গল্প আমি এখানে তোমাদের কাছে উপস্থিত করছি। আমি জানি আজকাল গজিয়ে উঠেছে বহু চালাকচতুর ছোঁড়া—আইন-আদালত করে, এমন কি ছাপার অক্ষরে হালের অনেক কিছুই পড়ে থাকে…তাদের যাই বলো না কেন, হেসে উড়িয়ে দেবে? দুনিয়া জুড়ে ছড়িয়ে পড়ছে আজকাল এহেন অবিশ্বাস! একদিন ডাইনীদের নিয়ে একটা কথা বলেছি কি, এক বজ্জাত মাথাভাঙ্গা ছোঁড়া কিনা ডাইনীতে বিশ্বাস করে না! এখানে এই আমি রয়েছি কত দশকুড়ি বছর,—ঈশ্বরের ইচ্ছায় দেখেছি কত না নাস্তিককে, স্বীকারোক্তির সময়েও ঈশ্বরের নাম ক'রে মিথ্যেটা বলে যায় সোজা জলের মতো—যেন একটিপ নস্যি নিচ্ছে আর কি! কিন্তু সেই তারাও কিনা ডাইনীর কথা সুরু করতেই খ্রীষ্টনাম জপে!

অনেক অনেক বছর আগে—তা, শ'খানেক তো হবেই, আমার পরলোকগত দাদুই বলেছেন—আমাদের এই গাঁ কেউ বড় একটা চিনতই না। ছিল তো কুঁড়ে কুঁড়ে ঘরবাড়ী—খুবি দীন-দরিদ্র ধরণের!…

আর, এই গাঁয়েই যখন তখন এসে দেখা দিত একটি লোক, লোক না বলে বলা উচিত মূর্তিমান এক শয়তান। কেন যে সে এসে হাজির হ'ত, কোত্থেকেই বা আগমন তার—কেউই কিছু জানতে পেত না। খানাপিনা হৈহুল্লা, তারপরেই কিনা উধাও,—যেন হাওয়া হয়ে গেল! আর তো কোনো পাত্তাই নেই। আর তারপর, হঠাৎ এসে হাজির—নেমে পড়ল যেন আকাশ থেকেই! ঘুরে-ফিরে বেড়াতে লাগল আমাদের এই ডিকাঙ্কার শ'খানেক হাত দূরের ওই গাঁয়েরই পথে-ঘাটে। এখন আর কোনো চিহ্নই অবশ্যি চোখে পড়বে না সেই গাঁয়ের। ছন্নছাড়া কোনো কশাকের সঙ্গে ভিড়ে পড়বে লোকটি, আর তারপরে সুরু হবে হাসিঠাট্টা নাচগান—উড়ে চলবে টাকার মালা, জলের মতো বয়ে চলবে ভদকার স্রোত! কখনো-বা জুটিয়ে নেবে মেয়েদের—মশগুল হবে তাদের নিয়ে, দিয়ে দেবে ঝুড়িঝুড়ি ফিতে, কানের দুল, গলার হার। সেসব এতটা যে মেয়েরাই দিশেহারা হয়ে যাবে এতসব দিয়ে তারা করবেটা কি! তবে এটা ঠিক, মেয়েরা ওসব উপহার হাতে নেবার আগে দু'চারবার বেশ ভেবে নিত। কারণ, ওসব শয়তানের হাত

থেকেই এসেছে কিনা কে বলবে! আমারি দাতুর কাকীমার ছিল একটা সরাই—এখন যেটাকে বলে অপোশ্নায়া সড়ক, সেখানটায়ই আসত বাসাভ্রুক —ওটা ওই শয়তানটারই নাম। যখন তখন আসত। কাকীমা বলেছেন—সারা তুনিয়ার সব ধনসম্পদ হাতে পেলেও, ঐ শয়তানের কাছ থেকে কোনো উপহার নেবেন না। কিন্তু মেয়েরা 'না' বলবে এমন বুকের পাটা থাকলে তো! বাসাভ্রুয়াক যখন তার তুইঝোপ ভুরুর তলা থেকে নজর ছুঁড়ে মেরে খেঁকিয়ে উঠত, ওরা তো দূরের কথা—সবচেয়ে জোয়ান মরদও পালিয়ে বাঁচত। আবার, কোনো মেয়ে যদি হাত পেতে নেবে তো সেই রাতেই নির্ঘাত তাকে দেখা দেবে জলা থেকে উঠে-আসা কোনো জলপেত্নী—মাথার উপরে কতগুলো শিং! গলায় যদি হার থাকবে তো গলাটায়ই ফাঁস লাগিয়ে দেবে, আংটি থাকলে কামড়ে নেবে আঙ্গুল, মাথায় ফিতে বাঁধা তো ছিঁড়ে ফেলবে চুল! তাহ'লে, নিকুচি করেছে অমন উপহার! তবু বিপদ কি বিপদ! জলেই ছুঁড়ে দিয়েছ কি ঐ সব হার বা আংটি,—সোজা ভেসে উঠবে, ভেসে ভেসে চলে আসবে তোমার হাতে!

গাঁয়ে ছিল একটা গির্জা—নামটা যদি ঠিক ঠিক মনে করে থাকি তো পেভেলি সাধুবাবার গির্জা; ধর্মপিতা অর্থাৎ 'ফাদার' ছিলেন চিরস্মরণীয় আফানসি···তিনি তো স্পষ্টই ঘোষণা করে দিলেন—কেউ যদি ওই বাসাভ্রুয়াকের সঙ্গে মেলামেশা করে তো তাকে গণ্য করা হবে খ্রীষ্টধর্মের শত্রু—মানবজাতির শত্রু!

ঐ গাঁয়েই বাস করত কোরঝ্ নামে এক কশাক। তার বাড়ীতে থেকে কাজকম্ম করত 'পেত্রো অনাথ' নামে একটা ছেলে, ওর বাবা-মার খোঁজ-খবর কেউ জানত না বলেই 'অনাথ' নাম। গির্জাবাড়ীর রক্ষকটি অবশ্যি বলেন, পেত্রো অনাথের বাবা-মা মারা যায় ওর যখন এক বছর। কিন্তু আমার দাতুর কাকীমা সেকথা মানতেই রাজি নন, তিনি নিজেই জুটিয়ে দিয়েছেন তার কত না আত্মীয়-স্বজন। তা, পেত্রো অবশ্যি ওসবের ধারই ধারে না।···ভ্রমর-ভুরু মেয়ের দল বা অন্যসব তরুণীরা পেত্রোর আত্মীয়-স্বজন নিয়ে মাথা ঘামাত না। তাদের কথাটা শুধু: ও যদি পরতে পেত নতুন ধরণের জামাপ্যাণ্ট, নীলচূড়া আস্ত্রখান টুপি, কোমরের পাশে ঝুলত যদি তুর্কী তলোয়ার, একহাতে এক চাবুক অন্য হাতে স্বন্দর এক পাইপ—তাহ'লে এ অঞ্চলে ওর পাশে দাঁড়ায় কে? তা, বেচারা পেত্রোর থাকা বলতে আছে তো

শুধু সেই এক এবং অদ্বিতীয় ছাইরঙ জামাটি,—আর সেই জামায় যত সংখ্যক ফুটো বা ছেঁড়া, কোনো কিপ্‌টে ইহুদীর জামার পকেটেও টাকা থাকে না ততটা। এতেও কিন্তু কিছুই আসে যাচ্ছে না, আসে যাচ্ছে একটা ব্যাপারে, অর্থাৎ কিনা বুড়ো কোবৃঝ-এর একটি মেয়ে ছিল—অমন স্নন্দরী মেয়ে মনে হচ্ছে তোমরা কেউ কখনো দেখোনি। আমার দাত্বর কাকীমা বলতেন—জানলে, মেয়েরা তোমার আড়ালে এমনকি শয়তানকেও আদর করতে রাজি, তবু কিনা তারা কোনো মেয়েকেই বলবে না 'স্নন্দরী'। আরে সেই কাকীমাই বলতেন: মেয়েটির ভরা গাল ত্নটি যেন তাজা টলমল ত্নটি পপিফুল, স্বর্গের শিশিরে স্নান করে পাপড়ি মেলে মেলে ফুটে উঠেছে স্বর্যোদয়ে,—ছড়িয়ে দিয়ে কী কোমল-রক্তিম আভাটি! আর তার ভুরু ত্নটি যেন কালো ত্নটি ফিতে—ছোট ছোট মূর্তি কিংবা লকেট ঝুলিয়ে রাখবার জন্যে ঠিক যে-রকমটি আমাদের মেয়েরা আজকাল কিনে থাকে মস্কো থেকে আগত ভ্রাম্যমান ফেরিয়ালাদের কাছ থেকে। ওই ভুরু ত্নটিই ত্নপাশে অর্ধবৃত্তের মতো বেঁকে নেমে আছে—তাকিয়ে আছে যেন তার টলমল চোখত্নটির দিকে! আর তার ছোট্ট ঠোঁট ত্নটির দিকে লুব্ধভাবেই তাকিয়ে থাকত যত তরুণেরা। তা, ও ত্নটি স্বষ্টি হয়েছে যেন নাইটিঙ্গেলের গলার স্বরটি উৎসারিত করবার জন্যেই। তার চুলের গোছা চাতকের ডানার মতো কালো আর বাচ্চা-ভেড়ার লোমের মতোই নরম, লুটিয়ে পড়েছে সোনায় কাজকরা জ্যাকেটের উপর। তখনকার দিনে আমাদের মেয়েরা ত্নপাতা কেটে চুল আঁচড়াত না—ঝলমলে ফিতেয় জড়িয়ে চুল বাঁধত।…তা দেখো, একটা ছেলে ও একটি মেয়ে যদি কাছা-কাছি থাকে তো কি হয় সবাই জানো তোমরা: স্বর্য উঠবার আগেই দেখা যাবে একজোড়া ছোট পায়ের ছাপ—ঠিক যেখানটায় পিদোরকা নামের মেয়েটি কথা বলছিল তার পেত্রো নামের ছেলেটির সঙ্গে। কোরঝ্‌ও ভাবেনি কোনো অন্যায় কিছু ঘটতে পারে কখনো। তা, ঐ শয়তানেরই চক্রান্ত, একদিন পেত্রো কিনা এত পাগলাটে হয়ে উঠল যে বৈঠকখানাতেই কসাক মেয়ে পিদোরকার রক্তিম ওষ্ঠে একটি প্রাণভরা চুম্বন এঁকে দিল—তার আগে চারদিকটা একটিবার দেখেও নিল না। আর তখনি সেই শয়তানের প্ররোচনায়ই কিনা… বুড়োটা এসে দোরটা খুলে ফেলল হঠাৎ। কোরঝ তো হতভম্ব! দরজাটা আঁকড়ে ধরে আছে, হা হয়ে আছে মুখখানা! ঐ অভিশপ্ত চুম্বন যেন আচ্ছন্ন করে ফেলল তার সমস্ত চেতনা।…

সামলে উঠেই দেয়াল থেকে নামিয়ে আনল তার ঠাকুর্দার ঘোড়ার চাবুকটা।

বেচারা পেত্রোর পিঠের উপর ঝাড়তে যাচ্ছে, অমনি কোত্থেকে ছুটে এলো পিদোর্‌কার ছয়-বছরের ছোটভাই আভাস—ভয়ে দুই হাতে জড়িয়ে ধরল বুড়োর দুই পা, কেঁদে উঠল—'বাবা, ওকে মেরো না, বাবা!'

কী আর করা যায়। বাবার প্রাণ তো আর পাথর নয়, চাবুকটা দেয়ালেই ঝুলিয়ে রেখে, আস্তে আস্তে পেত্রোকে বার করে দিলে ঘর থেকে, বলল—'ফের যদি আমার এই বাড়ীতে তোকে দেখেছি কি ছিঁড়ে দেব তোর ঐ কালোগোঁফ, আর তালুর উপরকার চুলের গোছাও; তা, ঐ গোছা তোর কান দু-দুবার ঘের দেওয়ার মতো যথেষ্ট লম্বাই হ'ল বা! এটা যদি না করি তো আমার নামই তেরেন্তি কোর্‌ঝ নয়।' এই না বলেই পেত্রোর পিঠে এমন ছোটখাট একখানা কনুইয়ের গুঁতো ঝাড়ল যে পেত্রো যেন শূন্যে উড়ে গেল, দু-চোখে দেখতে লাগল সর্ষে ফুল!

তা, আমাদের পায়রা-জুটি তো ব্যথায় ভেঙ্গে পড়ল। তারপর গ্রামে এক গুজব উঠল কোর্‌ঝ-এর বৈঠকখানায় নাকি নতুন এক অতিথিকে দেখা যাচ্ছে প্রায়ই। জাতে সে পোলিশ—সারাটা পোশাকে ঝলমল করছে সোনার ফিতে, বড় বড় একজোড়া গোঁফ আছে, আছে তলোয়ার, আছে 'নাল' এবং পকেটে পকেটে ঝং ঝং করছে টাকা—আমাদের গির্জায় সেক্সটনের থলেটার গায়ে বাজতে থাকে যেমন ঘণ্টাগুলি। আমাদের সবারই জানা কথা, ভ্রমর-কালোভুরু মেয়ের বাপের কাছে কেউ আসে কী কারণে। তাই, পিদোরকা একদিন চোখের জলে বুক ভাসিয়ে তার ছোটভাই আভাসকে দুহাতে জড়িয়ে ধরে বলে—'আভাস, আমার লক্ষ্মীভাই, সোনাভাই আমার! তীরের মতো ছুট্টে যাও পেত্রোর কাছে। যাও, বলো গে: আমি ওর বাদামী চোখ বড়ই ভালোবাসি, আমি ওর সুন্দর মুখে মুখ রাখব, কিন্তু আমার ভাগ্য বলছে—তা হবে না। তোয়ালের পর তোয়ালে ভিজিয়েছি দু' চোখের জলে—আমি ক্লান্ত অসুস্থ, বুকে বড় ব্যথা। আমারি বাবা কিনা আমার শত্রু—আমাকে জোর করে বিয়ে দিচ্ছে ঐ ঘৃণ্য পোলটার সঙ্গে। ওকে বল্‌গে, এরা আমার বিয়ের আয়োজন করছে, তবে সে বিয়েতে গানবাজনা হবে না। নহবতের জায়গায় হবে শুধু পুরুতের মন্তর পড়া! আমি কিছুতেই আমার ঐ বরের হাত ধরে নাচতে যাব না—আমাকে বয়ে নিতে হবে বোঝার মতো। আমার বাস হবে ঘন অন্ধকারে—ম্যাপল কাঠের শবাধারে, আর চিম্‌নীর বদলে দাঁড়িয়ে থাকবে একটা ক্রুশ! আধো-আধো স্বরে সরল শিশুর মুখ থেকে পিদোর্‌কার এসব কথা শুনে

পেত্রো দাঁড়িয়ে রইল পাষাণ-মূর্তি—'তা আমি কী দুর্ভাগা—আমি ভাবছি কিনা চলে যাব ক্রিমিয়া বা তুর্কীস্থান—যুদ্ধে গিয়ে তোমার কাছেই ফিরব বড়লোক হ'য়ে, হায়রে আমার মনোরমা! কিন্তু তা হবে না তো! কারো কুনজর পড়েছে আমার উপর, হ্যাঁ আমারো বিয়ে হবে বৈকি, আদরিণী আমার! তবে আমার সেই বিয়েতে কোনো পুরুত থাকবে না,—তার জায়গায় আমার উপরে ঘুরে ঘুরে কর্কশরবে ডাকতে থাকবে এক দাঁড়কাক; জনহীন খোলা প্রান্তর হবে আমার বাসভূমি, ধূসর ঝোড়ো মেঘেরাই হবে আমার সেই বাসভূমির ছাত। এক ঈগল এসে খুঁড়ে খুঁড়ে খাবে আমার চোখ-তুটো, অশান্ত বৃষ্টিধারা ভিজিয়ে ভিজিয়ে ধুয়ে দেবে আমার দেহের কশাক-হাড়গুলি. আর ঘূর্ণীবায়ু এসে শুকিয়ে দেবে সে সব। কিন্তু—এসব কী বলছি আমি? কার কাছে অভিযোগ করছি আমি, কার সম্পর্কে? মনে হচ্ছে সবি ভগবানের ইচ্ছা। যদি মরতেই হয় তো মরেই যাব।'—সোজা সে চলে গেল সরাইখানায়।

আমার দাতুর কাকীমা তো পেত্রোকে সরাইখানায় দেখে অবাক। আরো বিশেষ করে এমন এক সময়ে, যে-কোনো সৎলোকেই যখন কিনা ধর্মসঙ্গীতে যোগদান করতে যায় গির্জাতে। আর, পেত্রো যেই দিতে বলল পুরো একজগ ভদকা,—প্রায় একমগই হবে, তখন সেই কাকীমার তো চোখ ছানাবড়া! তবে, এই বেচারা বৃথাই চেষ্টা করতে লাগল তার সবতুঃখ তলিয়ে দিতে। ভদ্‌কা তার জিভে যেন দংশন করতে লাগল বিষকাঁটার মতো, তেতো মনে হ'ল গাঁদালপাতার মতো—,মেজেতেই ছুঁড়ে ফেলল জগটা!

'কশাক-যুবক. শোক ত্যাগ্ন করো।'—তার মাথার উপরেই গম্ভীর আওয়াজ! পোত্রো মাথাটা ঘুরিয়েই দেখে কি—বাসাভ্রুয়াক! ওঃ, দেখতে সে কী ভয়ানক! চুল তো নয় সজারুর কাঁটা, তুই চোখ জ্যান্ত বাঘের।

'জানি আমি কিসের অভাব তোমার। অভাব হ'ল এইটার!'—এই বলেই সে এক শয়তানী দৃষ্টি হেনে তার বেল্টে-বাঁধা চামড়ার থলেটা বাজাতে লাগল টুংটাং!

চমকে উঠল পেত্রো।

'এই যে, দেখো না কেমন ঝকমক করছে!'—হাতের তালুতে ঢেলে দিল কতকগুলি মোহর! 'দেখছ, কী রকম বাজছে! জানলে, এমন একঝুড়ি চাও তো, কাজ চাই কেবলমাত্র একটি!'

উচ্চস্বরেই বলে উঠল পেত্রো—'যাই হ'ক না, বলুন—বলুন, আমি সবকিছুই করতে রাজি!' হাতে হাত মেলায় দুজনেই।

'হ্যাঁ, বুঝলে তো পেত্রো, ঠিক সময়টিতেই এসে পড়েছ। কালকেই সেই বিশেষ সেণ্টই-জন দিবস! সারাটা বছরের একমাত্র এইদিন দুপুর রাতেই ফোটে 'ব্র্যাকেন ফুল'! তোমার এই তো সুযোগ! আমি তোমার প্রতীক্ষায় থাকব ভালুক-গিরিদরির পারে—ঠিক দুপুর রাতে!'

পেত্রো ঠিক সেই সময়টির প্রতীক্ষা করতে লাগল,—বাড়ীর কর্তামার হাতে দানা খাবার সময়টির জন্যেও এমন অধীরভাবে অপেক্ষা করে না মুরগীর বাচ্চারা! পেত্রো চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগল গাছ থেকে পড়েছায়ারা ক্রমেই লম্বা হয়ে উঠছে কিনা, অস্তসূর্য লাল আভা ছড়াচ্ছে কিনা। তারপর ধীরে ধীরে ঠিক সময়টি এগোতেই সে ক্রমেই অধীর হয়ে উঠল। ওঃ, কী ধীরে ধীরেই না এগোচ্ছে সময়! মনে হচ্ছে, ঈশ্বরের সৃষ্টি এই দিনটিতেই হারিয়ে ফেলেছে তার শেষ! সীমানা তারপর একসময় অস্ত গেল সূর্য। আকাশের একপ্রান্তে দেখা যাচ্ছে শুধু এক ঝলক আরক্ত আলোরেখা! এবার তাও নিভে এল। হিম হয়ে আসছে সমস্ত প্রান্তর। আলো ক্ষীণ হতে হতে ঘনিয়ে উঠল গাঢ় অন্ধকার। এইবার! বুক এমনভাবে টিপটিপ করতে লাগল হৃৎপিণ্ডটা যেন ঠেলে বেরিয়ে আসবে। ঠিক ঠিক পথে যাত্রা করল পেত্রো, খুব ভেবেচিন্তে ঘন বনের মধ্য দিয়ে পথ করে করে নেমে এল নিচে এক গভীর খাদের পাশে,—এবং এটাই সেই ভালুক-গিরিদরি। আগেই এসে গেছে বাসাভ্রয়াক। এত ঘন অন্ধকার যে নিজের হাতই নিজে দেখতে পাবে না মুখের কাছে এনেও। হাতে হাত ওরা পথ করে এগিয়ে চলল কাদাভরা জলার মধ্য দিয়ে, কাঁটা-ঝোপঝাড়ে জড়িয়ে পড়ে আর প্রতিটি পদক্ষেপে হুঁচট খেতে খেতে। তারপর এসে পড়ল এক সমতল জায়গায়। চারদিকটা তাকিয়ে দেখবার জন্যে একবার থামল পেত্রো,—এহেন জায়গায় আগে আর কখনোই আসেনি। থেমে দাঁড়াল বাসাভ্রয়াক।

'সামনে ঐ দেখছ তো তিন-টিলা? ওর গায়ে আছে কত না রকমারি ফুল; কিন্তু সাবধান, মাটির তলার অন্ধকার জগতের কোনো শক্তিই যেন তোমাকে ওদের কোনোটাকেই তুলে আনতে প্রলুব্ধ না করে। তবে, যখন ফুটে উঠবে ব্র্যাকেন-ফুল, তুলে আনবে; এদিক ওদিক তাকাবে না—তোমার পেছনেই যা-কিছুই দাঁড়িয়ে আছে মনে হ'ক না।'

পেত্রো ওকে একটা কথা জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিল, কিন্তু একি! চলে

গেছে। তিন-টিলার দিকে এগিয়ে গেল পেত্রো। সেই ফুল কৈ? কিছুই তো নেই। গহন-ঘন আগাছাগুলি সর্বত্রই দেখাচ্ছে কালো—ঢেকে রেখেছে অন্য সবকিছুই। আকাশে হঠাৎ চমকে উঠল গ্রীষ্মকালের বিদ্যুৎ, আর সামনেই পেত্রো দেখতে পেল এক বিস্তীর্ণ পুষ্পমেলা। কী চমৎকার সব, সবি তার কাছে নতুন—আর তার মধ্যেই রয়েছে সাধারণ ধরণের ব্র্যাকেনও। ঘাবড়ে যায় পেত্রো, দাঁড়িয়ে থাকে, কী যে করবে বুঝে ওঠে না—হাত দুটি বুকের উপর ভাঁজ করে রাখে—'তা, এতে অসাধারণটা কী আছে। হয়ত বা, শয়তানেই আমাকে নিয়ে মজা করতে চাইছে।'

আর তখনি পেত্রো হঠাৎ দেখতে পেল ছোট্ট একটি ফুল দুলছে ঘুরছে—ঠিক জ্যান্ত যেন। সত্যিই কী আশ্চর্য ফুল! ঘুরতে ঘুরতে ক্রমেই হয়ে উঠল বড়, আরো বড়—লাল হয়ে উঠল একখানা জলন্ত কয়লার মতো। হঠাৎ ঝকমক করে উঠল একটা তারা, কী একটা শপাং করে উঠল, আর পেত্রোর চোখের সামনেই ফুটে উঠল ফুলটি—জ্বলে উঠল শিখার মতো, আলো ছড়িয়ে দিল অন্যসব ফুলগুলির উপরে।

'হ্যাঁ, এটাই তো সেই সময়।'—ভাবতে ভাবতেই পেত্রো বাড়িয়ে দিল হাতখানা। আর তখনি সে দেখতে পায় শত শত লোমশ-হাত তার পিছনে ফুলটির দিকেই এগিয়ে আসছে। কি একটা যেন ঝট্ করে সরে গেল তার পিঠের দিকে। পেত্রো চোখ বুঁজে বোঁটাটা টেনে ধরল—ছিঁড়ে এল হাতের মধ্যে। নেমে এল নিস্তব্ধতা। বাসাভ্রুয়াককে মনে হ'ল—বসে আছে একটা কাটাগাছের গুঁড়ির উপর, দেখাচ্ছে মড়ার মতো ফ্যাকাশে। একচুলও নড়ছে না, তার অনড় চোখ দুটো কী দেখছে সে-ই জানে। আধখোলা ওষ্ঠ দুটো, কিন্তু আওয়াজ নেই। চারদিকে কোথাও নেই কোনো সাড়াশব্দ। সে কী এক ভয়াবহ পরিবেশ। অবশেষে শোনা গেল একটা শিস, ভয়ে ঠাণ্ডা হয়ে উঠল পেত্রোর সারাটা শরীর। তার মনে হ'ল ঘাসগুলি যেন ফিস ফিস করে উঠল, ফুলগুলি নিজেদের মধ্যে কথা বলছে কী এক কোমল ভাষায়,—বাজছে যেন ছোট ছোট রূপোলি ঘণ্টা! কিন্তু গাছপালায় প্রতিধ্বনিত হচ্ছে ক্রোধের সে কী ঝড়ঝাপট। বাসাভ্রুয়াকের মুখখানায়ও হঠাৎই যেন ফিরে এল প্রাণ। জ্বলজ্বল করে উঠল চোখ দুটো। দাঁতে দাঁত ঘষতে ঘষতে সে গর্জে উঠল: 'শেষ পর্যন্ত ফিরে তো এসেছিস, ডাইনী-বুড়ী! এবার ঐ দেখো

পেত্রো, ঐ যে তোমার সামনেই দেখা দিয়েছে এক সুন্দরী—যা বলবে তাই করবে। নয়তো চিরদিনের মতোই সব খতম।'

তারপর দেখাল একটা লাঠি দিয়ে একটা কাঁটাঝোপ যেই সে দু'ভাগ করে ফেলল, একেবারেই সামনেই দেখা দিল একটা কুঁড়ে—এক ডাইনীর কুঁড়েঘর, ঠিক রূপকথায় হয় যেমন। বাসাভ্রুয়াক এক ঘুষি হানল ওর উপরে—কেঁপে উঠল শক্ত বেড়াটা, দৌড়ে বেরিয়ে এল একটা কালো কুকুর, হয়ে গেল একটা বেড়াল—এক চিৎকার ছেড়ে লাফিয়ে উঠল একেবারে চোখের কাছে।

'রেগো না, রেগো না ডাইনী-বুড়ী!'—বলে ওঠে বাসাভ্রুয়াক এবং সঙ্গে সঙ্গে ঝাল-মশলার মতোই জুড়ে দেয় এমন কতকগুলি শব্দ, যা শুনলে যে-কোনো সৎলোকই কানে আঙ্গুল না দিয়ে পারবে না। বেড়ালটা যেখানে দাঁড়িয়ে ছিল এবার সেখানে এক বুড়ী—শুকনো আপেলের মতো কোঁচকানো চামরা সারাটা গায়ে, দেহটা দুমড়ে হয়ে উঠেছে যেন দুটো দেহ, নাক এসে নেমেছে চিবুকে—দেখতে যেন এক জাঁতি।

'একি সুন্দরী!'—ভাবতেই পেত্রোর শিরদাঁড়া বেয়ে শিরশির করে নামে কেমন এক ভয়।

ডাইনী-বুড়ী তার হাত থেকে কেড়ে নিল ফুলটা—বহুক্ষণ ধরে বিড়বিড় করে কী বলতে লাগল তার উপর, তারপর ছড়িয়ে দিল কী-এক ধরণের জল। তার মুখ দিয়ে তখন ছিটকে বেরিয়ে আসতে লাগল আগুনের ফুল্‌কি, দুই ওষ্ঠের উপর জমে উঠল ফেনা। ফুলটাকে পেত্রোর হাতে ফেরৎ দিয়েই বলে উঠল বুড়ী—'ছুঁড়ে ফেলে দে!' পেত্রো ছুঁড়ে ফেলে দিল, আর তখনি এ কী আশ্চর্য কাণ্ড। ফুলটা নিচে নেমে পড়ল না, অন্ধকারে বহুক্ষণ ধরে ঝুলতে লাগল—এক আগুনের গোলক যেন, হাওয়ায় ভাসতে লাগল নৌকোর মতো। আর তারপর নামতে লাগল আস্তে আস্তে, গিয়ে পড়ল দূরে। মনে হ'ল, যেন পোস্তবীজের চেয়েও ছোট্ট একটি তারা! 'ঐখানে ওই!'—বুড়ী হিসহিস করে বলে ওঠে ফাঁপা গলায়। বাসাভ্রুয়াক অমনি পেত্রোর হাতে একটা কোদাল তুলে দিয়ে বলল—'এখানেই খোঁড়ো। এখানেই পেয়ে যাবে এত সোনা—যা তুমি বা তোমার ঐ কোরঝ্ কোনোদিন স্বপ্নেও দেখেনি।'

পেত্রো তার দু'হাতের তালুতে থুথু মেখে শক্ত করে আঁকড়ে ধরল কোদালটা, পা দিয়ে ঠেসে ঢুকিয়ে দিল—তুলে ফেলল মাটি। আবার আর

এক কোদাল,……আর একটা…আরো একটা…শক্ত একটা কিছুতে ঠন্ করে ঠেকে গেল কোদালটা—না, আর ঢুকছে না। এবারে তুচোখে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে একটা লোহার সিন্দুক, তুলে আনতে গেল তু'হাত বাড়িয়ে।

কিন্তু একি, সিন্দুকটা তলিয়ে যেতে লাগল গভীর থেকে আরো গভীরে। আর পেত্রোর পিছনেই—সে কী অদ্ভুত হাসি, যেন সাপের হিস্ হিস্!

'না। সোনা পেতে চাও তো, তার আগে চাই জ্যান্ত মানুষের তাজা রক্ত!'—বলে ওঠে ডাইনী, আর পেত্রোর সামনেই এনে দাঁড় করায় ছয়-বছরের একটি শিশুকে—শাদা চাদরে আগাগোড়া ঢাকা; সেদিকে ইশারা করে বলে মাথাটা কেটে আনতে। পেত্রোর মুখ দিয়ে তো কথা সরে না। একি কথা, শুধু শুধু কিনা খুন করব একটা মানুষকে এবং তাও একটি শিশুকেই! রেগে-মেগে শিশুটির ঢাকনাটা টেনে খুলে ফেলল—আর কী দেখে পেত্রো? সামনেই দাঁড়িয়ে আইভাস—পিদোর্কার ছোটভাই। শিশুটির হাত তুটো বাঁধা—ঝুলে পড়েছে মাথাটা! শিশুটি হাত তুটি ভাঁজ করে রেখেছে বুকের ওপর। ডাইনীটার দিকে পাগলের মতো ধেয়ে গেল পেত্রো, হাতে ছুরি—হাতটা উঁচিয়ে তুলল আঘাত হানবার জন্যে।

'হ্যাঁ, মেয়েটির খাতিরে কী প্রতিজ্ঞা করেছিলে?' বজ্রের মতো গর্জে উঠল বাসাভ্রয়াক—তার কথা গুলির মতো পেত্রোর বুক চিরে বেরিয়ে গেল। ডাইনীটা পা দিয়ে লাথি মারল মাটির উপর—মাটি থেকে বার হতে লাগল নীল আলো, দেখা যেতে লাগল মাটির পেটের মধ্যটায় আলো—সব যেন স্ফটিকে গড়া, সবি দেখা যাচ্ছিল স্পষ্ট! মোহরের পর মোহর আর দামী দামী হীরা-জহরৎ খোলা পড়ে আছে সিন্দুকে সিন্দুকে আর ঝাঁপির পর ঝাঁপিতে,—যেখানটায় ওরা সবাই দাঁড়িয়ে ছিল ঠিক তারি তলায়। জ্বল জ্বল করতে লাগল পেত্রোর চোখ তুটো, ঘুরতে লাগল মাথাটা—উন্মাদ পেত্রো ছুরিটা শক্ত করে ধরল: আর তার তুচোখে ছিটকে এল নিরীহ রক্তধারা। চারদিকে বেজে উঠল হিহি হিহি হাসি। কদাকার দৈত্যদানোরা দলে দল লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে দাঁড়াল এসে তার সামনে। মুণ্ডহীন মড়াটাকে তুহাতে আঁকড়ে ধরে ডাইনীটা রক্ত খেয়ে নিল—ঠিক নেকড়ের মতো। বোঁ বোঁ ঘুরছে পেত্রোর মাথা। মরি-বাঁচি ছুটে চলেছে। তার চারদিকেই কেবল রক্ত আলোর বন্যা! গাছপালা সব স্নান করে উঠেছে রক্তে—জ্বলে উঠছে যেন, গোঙাচ্ছে। থরথর কাঁপছে রক্ত-তপ্ত

সূর্য। তার চোখের সামনেই বিদ্যুৎ চমকের মতো ঝলসে উঠছে আগুন শেষ-নিশ্বাসের শক্তি দিয়েই হাঁপাতে হাঁপাতে পড়ল এসে তার কুটিরের মধ্যে—পড়ে গেল মেজের উপর। মড়ার মতো নিঃসাড় হয়ে রইল গভীর ঘুমে।

পুরো দুদিন ও দুরাত্রি ঘুমোল পেত্রো—একটিবারও জাগল না। তৃতীয় দিনে সে একদৃষ্টে চেয়ে রইল ঘরটার কোণের দিকে—বহুক্ষণ। কিন্তু কি-সব ঘটে গেল কিছুই মনে আনতে পারল না। তার স্মৃতি যেন একটা বুড়ো কৃপণের পকেট, একটি পয়সাও গলিয়ে আনা সম্ভব নয়। একটু আড়মোড়া দিতেই পায়ের কাছে কী যেন টুং টুং করে উঠল। সোনা পড়ে আছে—দুই বস্তা সোনা। আর তখনি, যেন স্বপ্নের মতো মনে পড়ল—ধনরত্নের খোঁজেই তো ছিল সে : একাই ছিল, আর বনের মধ্যে ভয় পেয়েছিল। কিন্তু কী মূল্যে পেল সে ধনরত্ন—কিছুতেই মনে করে উঠতে পারল না।

তারপর ঐ বস্তা দুটো দেখেই তো নরম হয়ে গেল কোর্‌ঝ। 'হ্যাঁ পেত্রো ছিল এরকমটি, পেত্রো ছিল সেরকমটি, পেত্রো ছিল কত কী!' তার কথা তো আর থামে না—'তা, আমি কি বরাবরই ওকে পছন্দ করতাম না? ও কি আমার ছেলের মতোই ছিল না!' এই ধূর্ত বুড়ো শেয়াল এমন অবিশ্বাস্যভাবেই কথা বলে চলল যে শুনে শুনে কেঁদে ফেলল পেত্রো। আর, পিদোর্‌কা বলতে লাগল—আইভাসকে কী করে চুরি করে নিয়ে গেছে কিছু ভ্রাম্যমান জিপ্‌সী। পেত্রো কিন্তু এমন কি মনে করেও উঠতে পারল না ছেলেটির মুখখানা। অভিশপ্ত শয়তান তাকে এমনটাই করে রেখেছে।

এবার আর বিলম্বে কাজ কি। সেই পোলটাকে তারা তাড়িয়ে দিল এক ধাক্কায়, আয়োজন শুরু করল বিয়ের। সবাই সুরু করল কাজকর্ম : কেউ বিয়ে-পুলি ভাজছে, কেউ বুনছে তোয়ালে ও রুমাল, কেউ গড়িয়ে গড়িয়ে আনছে এক পিপে ভদকা। তরুণেরা লেগে গেছে নানা কাজে টেবিলে—কাটাকাটি হচ্ছে বিয়ের রুটির পাহাড়। বাজছে বাঁশী, বাজছে 'বান্দুরা' আর খঞ্জনী। সুরু হয়ে গেছে আমোদ-আহ্লাদ।

তখনকার দিনে কী যে হ'ত, আজকালকার বিয়ের সঙ্গে তুলনাই হয় না। আমার দাদুর কাকীমা সবাইকেই বলতেন—সে ছিল এক মজার ব্যাপার! অল্পবয়সী মেয়েরা সাজত ফিটফাট—শিরোসাজ টুপিই কত না রঙের ; হলদে-নীল-লাল ফিতে ঝুলানো, আর তার উপর দিয়ে ঘুরিয়ে-বাঁধা সোনালি বেণী ; বাহারে প্রতিটি সেলাইর লাইনের উপরেই লাল রেশমী-কাপড়ের কারুকাজ—

তার উপরে বসানো ছোট ছোট রূপোলি ফুল। মরোক্কা ধরণের উঁচু গোড়ালি বুট জুতো পায়ে ঘরময় নেচে নেচে বেড়াত ময়ূরীর মতো কী মনোরম ভঙ্গীতে, ঘূর্ণীর মতো ঘুরে ঘুরে।

আর, অল্পবয়সী বৌয়েরা পরেছে কেমন নৌকো-আকারের শিরোসাজ: একেবারে উঁচুর দিকটা তৈরী সোনালি জরি দিয়ে, পিছনের দিকটায় একটুখানি ফাঁক থেকে উঁকি মারছে সোনালি টুপির খানিকটা—সামনে ও পিছনে তার ছোট্ট দুটি শিং যেন, মিশ্‌কালো অষ্ট্রাখান মসলিনে তৈরী; আর গায়ে নীল রঙেব কোট—প্রান্তগুলি লালরঙের। বেশ মর্যাদার ভঙ্গীতে বুকের উপর দু-দুটি হাত ভাঁজ ক'রে—একে একে বেরিয়ে এসে তারা নাচতে স্থরু দিল 'কোপাক' নৃত্য।

আর, ছেলেরা সবাই পরেছে উঁচু কশাক টুপি, গায়ে মিহি কাপড়ের জ্যাকেট, কোমর-আঁটা বেল্টে রূপোর কারুকাজ, মুখে মুখে দাঁত দিয়ে এঁটে ধরেছে বাঁশী—সঙ্গং করছে, নাচের সঙ্গে লাফালাফি করছে কত না ভঙ্গীতে। এই তরুণদের চেয়ে দেখতে দেখতে কোর্‌ঝ-এর মনে পড়ে গেল তার তরুণ যৌবনের-কথা, আর সঙ্গেসঙ্গেই দুহাতে তুলে নিল একটা বান্দুরা, পাইপে ধূমপান করতে করতে গান গাইতে লাগল, আর সেইসঙ্গেই মাথায় একটা ঘট নিয়ে তাল সামলে শুরু করে দিল সে কী নাচ!···তা, আজকালকার সবাই কী করে? জিপসী মেয়ে-ছেলেদের মতো বা মস্কোবাসীদের মতো সাজসজ্জা!···আহা, সেই প্রাচীনকালে কী চমৎকারই ছিল সব। কেউ হ'ত এক ইহুদী, আর কেউ এক শয়তান। শুরুতে এ-ওকে চুমো খেল, আর তারপরেই কিনা এ-ওর তালুর গোছা ধরে চুলোচুলি! সত্যি বলছি, হাসতে হাসতে পাঁজরে ব্যথা উঠত। ওরা পোশাক পরত তুর্কী ও তাতারী ধরণের—আগুনের মতো ঝলমল করত! তারপর স্থরু হ'ত হাসি ঠাট্টা ও নানারকম মজা-মস্করা। শেষ পর্যন্ত আর মাত্রাবোধ থাকত না! এক মজার ঘটনা হয়েছিল আমার দাদুর কাকীমাকে নিয়েই—সেই বিয়েতে ছিলেন তিনি নিজেই। আলগা তাতার-ধরণের সাজ-পোশাক করেছিলেন সেদিন, সবাইকে পরিবেশন করছিলেন। হাতে এক পাত্র, তা নিয়ে পরিবেশন করেছিলেন। কারো মাথায় চাড়া দিয়ে উঠল শয়তানি—পিছন থেকে কাকীমার গায়ে উছলে ফেলল ভদকা, আর সঙ্গে সঙ্গেই ধরিয়ে দিল আগুন! দাউ দাউ করে জ্বলে উঠেছে আগুন! বেচারা কাকীমা তো ভয়ে দিশেহারা—ছিঁড়ে ছিঁড়ে সারাটা গা থেকেই খুলে ফেললেন সবটা সাজ-পোশাক। আর তখন সে কী

দুমদাম শব্দ, সে কী হৈ-হল্লা, কী হি-হি হো-হো হাসি। যেন এক মেলা! সত্যিই বুড়ো বুড়ীরাও আর কখনো দেখেননি এমন আমোদ-আহ্লাদের বিয়ে।

পিদোর্কা ও পেত্রো বসবাস শুরু করল সম্ভ্রান্ত শ্রেণীর ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলার মতোই। কী না ছিল তাদের, এবং সবকিছুই ছিমছাম ফিটফাট—কিন্তু তাদের জীবনধারা দেখে মাথা নাড়ত সজ্জনেরা। সকলেই একবাক্যে বলতে লাগল—'শয়তানের কাছ থেকে কখনোই কোনো ভালো হতে পারে না।... কোত্থেকে পেয়েছে ওরা এত বস্তা বস্তা সোনা? ঠিক যেদিনই পেত্রো বড়লোক হ'ল, সেদিনই কেন উধাও হ'ল বাসাভ্রুয়াক?'

তারপর একটা মাস যেতে না যেতেই কী যে হ'ল পেত্রোর—একমাত্র ভগবানই জানেন! একঠাঁয়ে বসে থাকে তো বসেই থাকে, কারো সঙ্গেই কথাটি বলে না। সব সময়েই কী যেন ভাবে, মনে হয় কী যেন মনে করতে চায়। পিদোর্কা যখন তার মুখ দিয়ে কথা বলাতে সক্ষম হয়,—সব সে ভুলে থাকে, কথা বলে চলে পিদোর্কার সঙ্গে, পেত্রো এমন কি হাসিখুশি হয়ে ওঠে,—কিন্তু বস্তাগুলির দিকে একবার চোখ পড়েছে কি বলে ওঠে—'দাঁড়াও, দাঁড়াও, আমি সব ভুলে গেছি!' এবং আবারো সে ডুবে যায় গভীর ভাবনায়, আবারো চেষ্টা করে কী যেন মনে আনতে। কখনো বা বহুক্ষণ ধরে বসে আছে তো বসেই আছে—নড়ে না চড়ে না। মনে হয়, এই কয়েক পলকের মধ্যেই মনে করতে পারবে সবকিছুই। কিন্তু তারপরেই আবার সব সরে যায় কোথায়। তার মনে হতে থাকে: যেন বসে আছে এক সরাইয়ে, তাকে এনে দেওয়া হ'ল ভদকা; ভদকা যেন জ্বলতে লাগল—কী বিশ্রী নোংরা! কে যেন এগিয়ে এল, এক চড় মারল তার কাঁধে, আর তার পর সবকিছুই ঢেকে গেল ঘন কুয়াশায়। দরদর ঘাম নামতে লাগল সারা মুখে, আবার বসে রইল ক্লান্ত শান্ত।

পিদোর্কা কী না করতে বাকী রাখল। গাঁয়ের হাতুড়ে ডাক্তারদের পরামর্শ নিল, মোম গলিয়ে জলে ফেলে একটুকরো পোড়াল—কিন্তু কিছুতেই কিছু না। গরমকালটা চলে গেল। কশাকদের অনেকেই চাষ করা, বীজ বোনা শেষ করে ফেলেছে, যারা কিছু বেপরোয়া ছুটে গেছে যুদ্ধে। ঝাঁকে ঝাঁকে হাঁস এখনো দেখা যাচ্ছে অগুণতি, কিন্তু সারস নয় একটিও। লালচে হয়ে উঠেছে মাঠপ্রান্তর। মাঠের এখানে সেখানে দেখা যায় ছোটবড় খড়ের গাদা—উঁচিয়ে আছে কশাকদের টুপির মতো। সড়কে সড়কে দেখা যাচ্ছে গাড়ী-ভর্তি টুকটাকি লাকড়ি আর খণ্ডখণ্ড কাঠ। শক্ত হয়ে উঠেছে জমি—কোথাও কোথাও

ছোঁয়া লেগেছে তুষারের। শুরু হ'ল তুষারপাত, গাছে গাছে কচি-কচি ডালে ডালে তুষার জমে জমে দেখাচ্ছে যেন সব লোমশ খরগোশ। কুয়াশা-ঘন দিনে লালবুক-পাখী 'বুলফিঞ্চ' তুষারের ঢিপির মধ্যে বীজ খুঁজে খুঁজে লাফ মেরে বেড়াচ্ছে—পোলিশ বাবুদের মতো। কাচ্চাবাচ্চারা বড় বড় লাঠি দিয়ে বরফের উপরে উঁচিয়ে-ওঠা কাঠগুলির উপর বাড়ি মারছে, আর তাদের বাবারা কিনা তখনো গুঁড়িসুড়ি শুয়ে আছে চুল্লীর উপরকার খাটে কিংবা পাইপ ধরিয়ে দাঁতে দাঁতে এঁটে ধরে, মাঝে মাঝে বাইরে আসছে আর অভিশাপ দিচ্ছে হারামজাদা ঝড়-তুষারকে—খোলা হাওয়ায় নিশ্বাস নিচ্ছে, কিংবা বাইর-ঘরে মজুত শস্য ঝাড়াই করছে খানিকটা।

তারপর একদিন গলতে শুরু হ'ল বরফ, পাইক মাছেরা লেজের বাড়িতে ভাঙচুর করতে লাগল বরফ,—যেমনটা লোকে বলে আর কি! কিন্তু কোনোই পরিবর্তন নেই পেত্রোর—যে-কে সেই। বরং যতই দিন যেতে লাগল হয়ে উঠল সে আরো মনমরা। একঠাঁয়ে বসেই থাকে তার কুটির-ঘরের মাঝখানে —জায়গাটায় তাকে যেন এঁটেই রাখা হয়েছে। আর তার পায়ের পাশেই সেই সোনার বস্তা! কারো সঙ্গ চায় না, বড় হয়ে উঠেছে চুলদাড়ি, দেখাচ্ছে কী ভয়ানক! সব সময়েই তার একই ভাবনা শুধু: কী যেন মনে করতে চাইছে বারবার, কিন্তু মনে করতে পারছে না; বিরক্ত হয়ে উঠছে—রেগে উঠছে। প্রায়ই সে বসবার জায়গাটা থেকে লাফিয়ে ওঠে পাগলের মতো, হাত দুটো বাড়িয়ে দেয়—দোলাতে থাকে; কোনোকিছুর দিকে দৃষ্টি স্থির—কী যেন আঁকড়ে ধরে কাছে আনতে চায়। ওষ্ঠ দুটি নড়তে থাকে—বহুদিন ভুলে-যাওয়া কোনো শব্দ যেন মুখ ফুটে বলতে চায়; তারপর চুপ করে থাকে, নড়ে না আর। কখনো ক্ষেপে ওঠে হঠাৎ: আঁচড়াতে থাকে কামড়াতে থাকে হাত দুটো —ঠিক যেন উন্মাদ, বিকট বিরক্তিতে দু'হাতে ছিঁড়তেই থাকে গোছা গোছা তালুর চুল! আর তারপর শান্ত হয়ে যায় একসময়—যেন তলিয়ে যায় বিস্মৃতির অতলে; তারপর আবার মনে করতে চেষ্টা করে, আবারো শুরু হয় উন্মাদনা আর যন্ত্রণা। ভগবানের দেওয়া এ কী শাস্তি!

পিদোরকার জীবনটাও আর বেঁচে থাকার মতো নয়। প্রথম প্রথম তো ঘরটায় একা একা থাকতে ভয়ই করত, কিন্তু দিনেদিনে মেনে নিল তার দুর্ভাগ্যকে। হায় বেচারা! কিন্তু কেউই তাকে এখন আর সেই পিদোরকা বলে চিনতেই পারে না: দুইগালে নেই সেই রক্তিমাভা, ওষ্ঠে নেই হাসি—যন্ত্রণায় জ্বলে-পুড়ে

শেষ হয়ে যাচ্ছে। কেঁদে কেঁদে সেই চোখ-দুটি ফুলে উঠে যেন বেরিয়ে আসছে। একবার একজনের বড় মায়া হ'ল তার দশা দেখে, পরামর্শ দিল ভালুক-গিরিদরির ওখানে ডাইনীটার কাছে যেতে,—দুনিয়ায় এমন ব্যাধি নেই ও সারাতে পারে না। পিদোর্‌কা স্থির করল এই শেষ-ব্যবস্থাটাই গ্রহণ করবে। একটু একটু করে সে ডাইনী-বুড়িটাকে শেষপর্যন্ত রাজি করাল তার সঙ্গে সঙ্গে আসতে। সন্ধ্যা পার হয়ে গেছে, আর সেদিনই সেই সেইন্ট-জনের সন্ধ্যারাত। পেত্রো বেঞ্চিতে শুয়ে আছে—হারিয়ে গেছে বিস্মৃতিতে, লক্ষ্যও করেনি আগন্তুককে। আর হঠাৎ কাঁপতে লাগল তার সমস্ত শরীর—ধীরে ধীরে সে উঠে বসল, বুড়ী ডাইনীটার দিকে তাকাল। সব চুল খাড়া হয়ে উঠল—যেন ঝুলতে যাচ্ছে ফাঁসিকাষ্ঠে। তারপর হঠাৎ সে এমন প্রচণ্ড শব্দে হেসে উঠল যে ভয়ে পিদোর্‌কার হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন থেমে যায় আর কি। কী এক ভয়াবহ আনন্দে চিৎকার করে পেত্রো—'হ্যাঁ মনে পড়েছে!' আর বলতে না বলতেই খপ্ করে একটা কুড়ালি হাতে নিয়েই প্রাণপণ শক্তিতে ছুঁড়ে মারল বুড়ীটার উপরে। শক্ত ওককাঠের দরজায় দুই ইঞ্চি গভীরে কেটে বসল কুড়ালিটা: অদৃশ্য হয়ে গেল ডাইনীটা, আর দেখা দিল সাত বছরের একটি ছেলে। গায়ে শাদা শার্ট, মাথাটা ঢাকা—ঘরটার ঠিক মধ্যখানে। উড়ে গেল ঢাকনাটা। 'ইভাস!'—চীৎকার করে উঠল পিদোর্‌কা, ছুটে গেল তার দিকে। কিন্তু একি, সেই ছায়ামূর্তির সর্বাঙ্গে রক্তমাখা—মাথা থেকে পা পর্যন্ত। আর, সেই রক্তের আলোয় ভরে উঠেছে সারাটা ঘর! ভীষণ ভয়ে পিদোর্‌কা ছুটে গেল বাইরের ঘরে, কিন্তু সম্বিৎ ফিরে পেয়েই ভাইকে সাহায্য করতে চাইল। একি, ঘরের দরজাটা বন্ধ হয়ে গেছে ভিতর থেকে! খোলা গেল না কিছুতেই। ছুটে এল পাড়াপড়শীরা, ধাক্কাতে ধাক্কাতে ভেঙেই ফেলল দরজাটা। কিন্তু ভিতরে নেই কেউই! সবি ধোঁয়ায় ধোঁয়াকার। আর, তারি ঠিক মধ্যখানে যেখানটায় দাঁড়িয়ে ছিল পেত্রো—পড়ে আছে একগাদা ছাই, ধোঁয়া উঠছে তখনো। যেখানটায় ছিল সোনার বস্তা, সবাই ছুটে এল সেখানে, কিন্তু সে জায়গায় রয়েছে কিছু ভাঙ্গচুর পাত্রই শুধু! এই অলৌকিক ঘটনাটায় পড়শী কশাকেরা এতই ভয় খেয়ে গেল যে, দাঁড়িয়ে রইল এক-একটি কাঠের পুতুল—যেন মেঝেতে বসানো: মুখ হাঁ-করা, বেরিয়ে আসছে চোখগুলি,—নাড়াতে সাহস পাচ্ছে না চোখের একটি পালকও।

এর পরে কী হয়েছে জানি না। পিদোরকা মানত করল—তীর্থে যাবে। বাবা যা-কিছু সম্পদ রেখে গেছেন তাই একত্র করল, আর তার কয়েকদিনের মধ্যেই অদৃশ্য হ'ল গাঁ থেকে। কেউই বলতে পারল না কোথায় গেছে। পুরানো লোকদের গল্পগুজব থেকে জানা গেল : সে চলে গেছে পেত্রোরই পথে। কিন্তু কিয়েভ থেকে আগত এক কশাক বলেছে—একটা গির্জামঠে সে দেখেছে এক সন্ন্যাসিনীকে, কঙ্কালসার তার চেহারা, দিনরাতই কেবল প্রার্থনা করছে; এবং প্রত্যেকটি লক্ষণ মিলিয়ে গাঁয়ের লোকেরা চিনে ফেলেছে—ও-ই পিদোর্কা। সে আরো বলেছে—কেউই কখনো তাকে একটি কথাও বলতে শোনেনি; সে পায়ে হেঁটে এসেছিল, আর সঙ্গে এনেছিল যীশুমাতার মূর্তির এক বেদীপীঠ, আর তাতে এতসব ঝলমল মণিমুক্তো বসানো যে সেদিকে তাকালে দুচোখে ধাঁধা লেগে যাবে!

কিন্তু এখানেই শেষ নয়। বছরে ঠিক যেদিনটাতে শয়তানটা এসে নিয়ে গিয়েছিল পেত্রোকে, সেদিনই আবার এসে দেখা দিল বাসাভ্রয়াক। অমনি তার চোখের সামনে থেকে পালিয়ে গেল সকলেই! ও যে কোন্ জাতের ঘুঘু জানতে আর বাকী নেই কারো। একমাত্র গা-ঢাকা দেওয়া শয়তান ছাড়া কেই বা মাটির তলার ধনরত্ন নিয়ে আসতে পারে উপরে! আর, যেহেতু অপবিত্র হাত কখনো গুপ্তধন স্পর্শ করতে পারে না, বেপরোয়া ছেলেদের সে তার ফাঁদে ফেলে কাজ হাঁসিল করে।

বছরের এই দিনটিতে প্রত্যেকেই চলে যায় গাঁয়ের ঘরবাড়ী ছেড়ে, ওঠে গিয়ে পাশেরই বড়গাঁয়ে। তা, এমনকি সেখানেও ঐ অভিশপ্ত বাসাভ্রয়াকের নজর থেকে রক্ষা নেই। আমার 'দাদুর কাকীমা বলতেন—ঐ শয়তানটার বিশেষ ক্রোধ ছিল তারি উপরে; তারও কারণটা হ'ল কাকীমা তার পুরানো সরাইটা ভেঙ্গে ফেলেছে।...একদিন গাঁয়ের সব প্রাচীন লোকেরা জড়ো হয়েছিল কাকীমার সেই সরাইয়ে, কথাবার্তা বলছিলেন যে-যার মান-সম্মান বজায় রেখে। —টেবিলের উপর আস্ত একটা ঝলসানো ভেড়া। না, সেটা ছোটখাট একটা বললে সত্যিটা বলা হবে না। সবাই তো গল্পসল্পে মশগুল এটা-সেটা নিয়ে—অলৌকিক কিছু ঘটনা নিয়ে। তখন হঠাৎ তাদের সকলেরি মনে হ'ল : ভেড়াটা মাথা তুলছে! ওটার ধূর্ত দুটো কালোচোখ চকচক করে উঠছে—হ্যাঁ, জ্যান্ত হয়ে উঠল! হঠাৎ গজিয়ে উঠল কালো দু'টো ঝাঁটাকাঁটা গোঁফ,—সকলের দিকে তাকিয়ে গোঁফ মোচড়াচ্ছে! সবাই চমকে দেখে ভেড়ার মাথাটাই হয়ে

গেল বাসাভ্রুয়াকের মুখখানা! আমার দাত্নর কাকীমার মনে হ'ল—এই বুঝি এক্ষুনি ভদকা চাইবে এক গ্লাস! গুরুজন প্রবীণেরা হাতে টুপি তুলে নিয়েই যে-যার বাড়ীর দিকে দে দৌড়! আর একদিন: গির্জা-রক্ষক নিজে সুরার কলসী থেকে দ্বিতীয়বার সুরাপান করতে যেতেই দেখেন—কলসীটা কিনা মাথা নুইয়ে প্রণাম করছে! 'জাহান্নামে, যা শয়তান!'—চেঁচিয়ে উঠলেন, খ্রীষ্টনাম জপ করতে লাগলেন। আর তখনি তাঁর স্ত্রীর হ'ল এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতা: তিনি সবে মস্ত বড় একটা টবে কিছু একটা মিশিয়েছেন, অমনি কিনা লাফিয়ে লাফিয়ে ছুটে যেতে লাগল টবটা! 'থাম্ থাম্!' তা, কোথায় থামা! হাতল দুটো জোড়া বেঁধে নাচতে লাগল সারাটা ঘরময়। তোমরা হাসতে পারো, আমাদের পূর্বপুরুষেরা কিন্তু হাসতেন না। ফাদার আফানসি সারাটা গা ঘুরে ঘুরে ছড়িয়ে দিলেন পবিত্র সলিল—জল-ছিটানী দিয়ে জল ছিটিয়ে, শয়তানকে তাড়াতে লাগলেন প্রতিটি সড়ক ও অলিগলি থেকে। কিন্তু তাহলে কি হবে, আমার দাত্নর কাকীমা বহুদিন অভিযোগ করেছেন—সন্ধ্যা হয়েছে কি, কে যেন দুপদাপ করে ছাতের উপর, আঁচড় কাটে দেয়ালে!

কিন্তু একটা কথা। এই যে এখানে এখন তো সবি দেখছ একেবারে শান্ত,—তবু জানলে এই কিছুদিন আগে আমার বাবাই মনে করে বলেছেন, এবং আমিও মনে করতে পারছি: ঐ সরাইয়ে ধ্বংসস্তূপের কাছ দিয়ে যেতে কোনো সৎলোকই পার পেত না।···কুণ্ডলী পাকিয়ে ধুঁয়ো উঠতে থাকত ভয়াবহ চিমনী থেকে, আর এত উঁচু পর্যন্ত উঠত যে মাথা উঁচিয়ে দেখতে গেলে মাথার টুপিই পড়ে যেত। জ্বলন্ত কাঠের টুকরোগুলি ছড়িয়ে পড়ত সমস্ত প্রান্তর জুড়ে। আর সেই শয়তান—তার নাম উচ্চারণ করার দরকার নেই—সেই বজ্জাতের বাচ্চা তার গহ্বরে বসে কী করুণভাবেই না কাঁদতে থাকত ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে। আর তাই শুনে ধারে-কাছের কাকের ঝাঁক ভয়ে ভয়ে বন ছেড়ে উপরে উঠে যেত—চিৎকার করতে করতে ছড়িয়ে পড়ত সারাটা আকাশে।

# * আইভান তুর্গেনেভ *

১৮১৮—১৮৮৩ খ্রী.

আইভান তুর্গেনেভ তাঁর জীবনকালেই বিশেষ সম্মানের আসন পান ইউরোপের সাহিত্য-সংস্কৃতি জগতে—শুধু ইউরোপেই নয়, সমগ্র বিশ্বেই ইনি সমাদৃত হন লেখকরূপে। বস্তুত, রুশদেশের বাইরে ইউরোপে আমেরিকায় এবং অন্যত্রও ইনিই প্রথম পরিচিত রুশী লেখক—মহান তলস্তয়েরও পুরোগামী।

তুর্গেনেভ পাশ্চাত্য শিক্ষা-সংস্কৃতির উজ্জ্বল রূপকে মনেপ্রাণে বরণ করেছিলেন—দেখেছিলেন প্রমুক্ত-উদার দৃষ্টিতে, এবং সেই সঙ্গেই, নিবিড় আলিঙ্গনে জড়িয়ে ধরেছিলেন স্বদেশের সাহিত্য-সংস্কৃতিকে—তার ভাষাকে ও জীবনকে। বস্তুত, সাহিত্যের উপরে ছিল তাঁর প্রবল আকর্ষণ: লিখেছেনও অজস্র, প্রধানত ছোট-গল্প। সরকারী চাকুরী ছেড়ে দিয়ে সারাটা জীবনই সফল করে তোলেন অনলস সাহিত্য-সাধনায়। পণ্ডিত লোক ছিলেন। ভালো ইংরেজী জানতেন, লিখতেও পারতেন সুন্দর। বাল্যশিক্ষা নিজগৃহে, পরে পড়াশোনা করেন মস্কো ও পিটার্সবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে, এবং তারপর বার্লিনে জার্মানীতে; শেষ বয়সে ছিলেন ফ্রান্সে।

তুর্গেনেভের ছেলেবেলা কেটেছে মাতা-পিতার মধ্যে বিরুদ্ধ-

সম্পর্কের বিরূপ পরিবেশে—মায়ের আদর পাননি, অত্যাচার পেয়েছেন যথেষ্টই। আর্থিক অবস্থা অবশ্যি ভালোই ছিল, পরিবারও ছিল সম্ভ্রান্ত জমিদার পরিবার। লেখক যুবক বয়সে নিজেদের জমিদারীর মধ্যে ঘুরে বেড়াবার সময় ডায়েরীর মতো ক'রে লেখেন 'শিকারীর ভ্রমণ-চিত্র'—এসব চমৎকার ছোটগল্পও বটে। 'আকুলিনা' ও 'একটি ফুলের গুচ্ছ' গল্পটি এই বই থেকেই নেওয়া হয়েছে। বইটি লেখকের এক বিশিষ্ট রচনা, এবং তাঁর প্রথম নামকরা বই। এখানে নিপুণ তুলির টানে আঁকা হয়েছে বন-প্রান্তর ও গাঁয়ের মানুষের প্রাণবন্ত প্রতিকৃতি। এই বইর জন্যেই কিন্তু লেখককে নির্বাসন দণ্ড গ্রহণ করতে হয় নিজেদের জমিদারীর মধ্যে দক্ষিণ রাশিয়ায়। লেখকের সবচেয়ে বিখ্যাত উপন্যাস 'ভার্জিন সয়েল' বা 'কুমারী-মৃত্তিকা'—অন্যান্য উপন্যাসের মধ্যে কয়েকটি হ'ল 'রুদিন' 'পিতা ও পুত্র', 'ধোঁয়া'। ভালো গল্পও সংখ্যায় অনেক, যেমন—ঠক্ ঠক্ ঠক্*, জীবন্ত ধ্বংসাবশেষ*, বিজয়ীপ্রেমের সঙ্গীত*, মফঃস্বলের ডাক্তার। ভৌতিক ও তান্ত্রিক বিষয়ের গল্পও আছে। লেখকের একটি বিশিষ্ট গ্রন্থ হ'ল 'গদ্যে কবিতা' [ বইটি ছোট এবং দুর্লভ; লেখাগুলি কবিতা নয়, কবিতার মতো ভাবধর্মী এবং ভাষা গদ্য-কবিতার মতো। এই দুর্লভ গ্রন্থটি থেকেই এখানে বিশেষ কয়েকটি লেখা তুলে ধরা হ'ল। লেখাগুলির সহজ-ভাষা ও প্রকাশ-ভঙ্গীতেই প্রকাশ পেয়েছে নিখুঁত ভাব-সৌন্দর্য। আইভান তুর্গেনেভ রুশভাষাকে ভালবাসতেন প্রাণের মতো—তা থেকে শক্তি আহরণ করতেন সাধকের মতো। তিনি তাঁর 'সিনোলিয়া'-তে বলেছেন: যেদেশের ভাষা এত মহান, সে জাতি মহান না হয়ে পারে না।

---

*সম্পাদক-অনুবাদক কর্তৃক পূর্বেই পরিবেশিত

## ॥ প্রবেশ-দ্বার ॥

সামনেই এক প্রকাণ্ড অট্টালিকা। সম্মুখ-ভাগে প্রাচীরের মধ্যখানে অপ্রশস্ত এক দরজা—খোলা। দরজার ভিতর দিকে ঘন কুয়াশা—থমথমে। সমুচ্চ গোবরাটের সম্মুখে দাঁড়িয়ে আছে একটি মেয়ে—এক রুশকন্যা।

অট্টালিকার গভীর অভ্যন্তরের ঘন কুয়াশা থেকে বয়ে আসছে তুষার-শীতল নিশ্বাস, আর তার সঙ্গে এক হিম-শুষ্ক কণ্ঠস্বর :

'কে তুমি, পার হতে চাও এই দ্বার-পথ,—জানো কি, কী আছে তোমার ভাগ্যে ?'

'জানি আমি।'—বলল সেই মেয়েটি।

'বুভুক্ষা, প্রচণ্ড শীত, ঘৃণা, বিদ্রূপ, অপমান, কারাগার, ব্যাধি,—এমন কি মৃত্যু ?'

'জানি।'

'সমাজ থেকে বহিষ্কার, দুঃসহ নিঃসঙ্গতা ?'

'জানি। আমি প্রস্তুত। সহ্য করব সমস্ত যন্ত্রণা, সমস্ত নির্মম আঘাত।'

'শুধু তোমার শত্রুদের কাছ থেকেই নয়, তোমার আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবের কাছ থেকেও ?'

'হাঁ, তাদের কাছ থেকেও।'

'বেশ, নিজেকে বিসর্জন দিতে প্রস্তুত ?'

'প্রস্তুত।'

'নিজেকে বিসর্জন দিতে হবে একেবারেই অজ্ঞাতভাবে। নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে তুমি—কেউই জানতেও পাবে না—ভক্তি-শ্রদ্ধা জানাবে কার উদ্দেশে ?'

'কৃতজ্ঞতা, বা করুণা চাইনা আমি—নাম চাই না।'

'মারাত্মক কাজ করতে প্রস্তুত ?'

'হাঁ, তা করতেও প্রস্তুত।'

খানিকক্ষণ নিস্তব্ধতা। তারপর আবার জিজ্ঞাসা স্বরু করল সেই কণ্ঠস্বর—'জানিস কি, এখন তোর যাতে বিশ্বাস একদিন তা শিথিল হতেও পারে, তুই-ই

ভাবতে পারিস—ভুল করেছিলি, বৃথাই বিসর্জন দিয়েছিলি তোর তরুণ জীবন ?'

'হাঁ, তা-ও জানি আমি। তবু আমি প্রবেশ করতে চাই।'

'প্রবেশ করো!'

—মেয়েটি পার হ'ল প্রবেশ-দ্বার, আর তার পিছুপিছু নেমে এল একটা ভারী যবনিকা।

পিছন থেকে শোনা গেল কার কর্কশ কণ্ঠস্বর—'মূর্খ!'

আর কোথাও থেকে ধ্বনিত হ'ল—'আদর্শ!'

---

* তুর্গেনেভের বিপ্লব-পূর্ব রচনাবলীর মধ্যে এই বিশিষ্ট রচনাটিকে বহুদিন স্থান দেওয়া যায়নি সরকারী নিষেধাজ্ঞার জন্যে, পরে ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয় তখনকার এক সংগুপ্ত পত্রিকা 'গণ-সঙ্কল্প'-এ।

## ॥ পাখী ॥

শিকার করে ফিরছিলাম, এক ফলের বাগানের পাশ দিয়ে। আমার কুকুরটা ছুটছিল আগে আগে। হঠাৎ সে হাঁটতে লাগল আস্তে আস্তে, এগোতে লাগল গুঁড়ি মেরে। গন্ধ পেয়েছে শিকারের।

নিচের দিকে তাকিয়ে দেখি পাঁচিলের পাশেই পড়ে আছে একটা চড়ুই-ছানা। ঠোঁটের দু'পাশটিতে কেমন সুন্দর হলদে রেখা, মাথার উপর কেমন কচিকচি লোম।

পাঁচিলের পাশে পাশে একসারি বার্চগাছ, দুলছিল ঝোড়ো হাওয়ায়,—ছানাটি বাসা থেকে পড়ে গেছে। মাটির উপরে চুপ করে রয়েছে অসহায়ের মতো, তার অদৃশ্য-প্রায় নবজাত ডানা দুটি ঝাপটাচ্ছে শুধু।

আমার কুকুরটা ধীরে ধীরে এগিয়ে যাচ্ছে ওই দিকেই। আর হঠাৎ, কাছের গাছটা থেকে তীব্র বেগে নিচে নেমে এল কালোরঙের এক বুড়ো চড়ুই। নিজেকে সে বোঁ করে ছুঁড়ে মারল কুকুরটার নাকের ডগার উপরে,—ঠিক এক টুকরো পাথরের মতোই! পাগলের মতো, দিশেহারার মতো বারংবার সে ঝাঁপিয়ে পড়ছিল শিকারী কুকুরটার ঝকঝকে শাদা বড়-বড় ধারালো দাঁতগুলির উপরে—তার প্রকাণ্ড হাঁ-করা মুখের সামনে; আর হতাশ-যন্ত্রণায় আর্তনাদ করছিল অবিরাম।

শিশু-সন্তানের প্রাণ বাঁচাতে চাইছিল—সব আক্রমণই ঠেকিয়ে রাখছিল নিজের দেহ দিয়ে। চড়ুই-ছানাটি ভয়ে ধুঁকছিল, তার মায়ের ক্ষীণস্বর ক্রমেই তীব্র থেকে তীব্রতর—কর্কশ থেকে আরো কর্কশ হয়ে উঠল, আছাড় খেয়ে পড়তে লাগল চতুর্দিকে। সে আছন্ন হয়ে পড়েছে নিদারুণ এক আশঙ্কায়,—বলি-স্বরূপ এগিয়ে দিচ্ছে নিজেকেই।

তার কাছে কুকুরটাকে মনে হয়েছে এক ভয়ঙ্কর জানোয়ার; তবু, তবুও তো নিজে সে নিশ্চিন্ত বসে থাকতে পারেনি নিরাপদ বৃক্ষশাখায়; তার ইচ্ছা-অনিচ্ছার চেয়েও বৃহত্তর এক শক্তিই তাকে ঠেলে পাঠিয়েছে নিচে।

কুকুরটা হঠাৎ থমকে দাঁড়াল, তারপর কিনা ফিরে চলল। সেও স্পষ্টতই বুঝতে পারছে এই শক্তির কী মহিমা!

কুকুরটাকে ডাক দিলাম, সে যেন ঘাবড়ে গেছে। মনে কেমন এক শ্রদ্ধা নিয়ে ফিরে এলাম।

না, এ শুনে হাসবে না একটুও। ঐ বীর পাখীটির সামনে—তার ভালোবাসার শক্তিমান মূর্তির সামনে—সত্যি সত্যিই আমার মাথাটা নুয়ে এল গভীর শ্রদ্ধায়।

'ভালোবাসা'!—ভাবছিলাম—'ভালোবাসা তো ঢের ঢের শক্তিমান মৃত্যুর চেয়েও, মৃত্যু যন্ত্রণার চেয়েও। জীবন পরিপুষ্ট হয়ে ওঠে—প্রদীপ্ত হয়ে ওঠে শুধু ভালোবাসার জোরেই—এই ভালোবাসার জোরেই।

## ॥ ভিখারী ॥

রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম। আমার সামনে এসে দাঁড়াল শীর্ণ চেহারার এক বুড়ো,—ভিখারী। ছানিপড়া দুই চোখে জল নামছে, নীলরঙ্ শুকনো ওষ্ঠ, ছেঁড়া কাপড়, সর্বাঙ্গে কদাকার ঘা। নির্মম দারিদ্র্য এই হতভাগ্যের জীবনকে যেন এক-এক গ্রাসে কামড়ে খাচ্ছে।

ফুলে-ওঠা নোংরা হাতখানি সে বাড়িয়ে দিল। ভিক্ষা চাইছিল, অভ্যস্ত আর্ত-স্বরে। এ-পকেট ও-পকেট হাতড়াতে লাগলাম। কিন্তু, খুচরো কি নোট বা পকেট-ঘড়ি—এমন কি রুমালটিও খুঁজে পেলাম না। সঙ্গে কিছুই নেই।

ভিখারীটি কিন্তু দাঁড়িয়ে আছে তখনো, কিছু আশা করছে। বাড়ানো হাতখানি তার কাঁপছে।

বিস্মিত বিমূঢ়ের মতোই আমি স্নেহভরে তার হাতখানি তুলে নিলাম—আমারি হাতের মধ্যে, বললাম—'রাগ ক'রো না ভাই, সঙ্গে কিচ্ছুটি নেই!'

ভিখারীটি তার ছানিপড়া চোখ দুটি তুলে আমার মুখে তাকাল, শুকনো ওষ্ঠে ফুটে উঠল ক্ষীণ একটু হাসি। আমার আঙ্গুলগুলি হাতের মধ্যে আঁকড়ে ধ'রে, আলগোছে সে বলছিল—'তাতে কি! আপনাকে এজন্যেও ধন্যবাদ, এও তো ভিক্ষা!'

মনে হ'ল, আমিও ভিক্ষা পেয়েছি তার কাছে!

## ॥ দেশ-গাঁয়ে ॥

তখন বর্ষার শেষ······তিন হাজার মাইল জুড়ে আমার চারদিকে বাহু প্রসারিত করে দিয়েছে রাশিয়া—জননী রাশিয়া।

দিগন্তবিস্তৃত আকাশ নেয়ে উঠেছে ঘন নীলিমায়, তার বুকে ভেসে বেড়াচ্ছে একটুকরো শাদামেঘ, মিলিয়ে যাচ্ছে ধীরে ধীরে। চারদিকে নিঝুম শান্তি, আমেজী আবহাওয়া······হাওয়ায় হাওয়ায় ভেসে আসছে সুরভি নিশ্বাস,—ঠিক যেন দুধের ফেনার গন্ধের মতো!

কলরব করছে কাকেরা, কূজন করছে বনঘুঘু, ঘুরে ঘুরে উপরে উঠছে চঞ্চল চাতকের দল। ঘোড়ার দল চরছে মাঠে মাঠে, মাঝে মাঝে নাক ঝাড়ছে সশব্দে।

গন্ধ আসছে ধুঁয়োর আর শুকনো খড়ের।

শন-ক্ষেতগুলি এর ভেতরেই বেড়ে উঠেছে বেশ, দিগ্বিদিক মাতাল করে তুলেছে ভুরভুরে মিঠে গন্ধে।

সামনেই ঢালু গিরি-সঙ্কট। দু'পারে সারি বেঁধে দাঁড়িয়ে রয়েছে ঝাঁকড়া-মাথা উইলো গাছগুলি। একটি মুখরা ঝর্ণা ছুটে চলেছে নিচে—গিরি-সঙ্কটের মধ্য দিয়ে। ফেন-চঞ্চল ফুলে-ওঠা জলের মধ্য দিয়ে দেখা যায় ছোট ছোট নুড়িরা জলের তলায় থরথর করে কাঁপছে! দূর-দিগন্তে নিবিড় আলিঙ্গনে বাঁধা পড়ছে আকাশ ও প্রান্তর; সেখানে রোদে ঝলমল করছে. প্রশস্ত নদীর নীল রেখা!

গিরি-সঙ্কটের এপারে দাঁড়িয়ে রয়েছে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন গোলাবাড়ীগুলি, শস্যের গোলাগুলি, দোরে দোরে তালা আঁটা। ওপারে কয়েকটি কুটির। সব কয়টিরই গাছের খুঁটি, ছাউনি তক্তার। চালের উপরে উঁচিয়ে রয়েছে এক-একটি বাঁশ, মাথায় মাথায় পাখীদের জন্যে পাতা রয়েছে বাক্স। বাড়ীর দোরে দোরে দাঁড়িয়ে আছে এক-একটি ঘোড়া, ঘাড় বেয়ে নেমেছে দীর্ঘ কেশর। গোলাকার গবাক্ষের কাচের চোখে ঝলমল ঝলমল করছে সাত রঙা রামধনু। জানালার কবাটে আঁকা রয়েছে ফুলদানী আর ফুলের গোছা। প্রত্যেক বাড়ীর সামনেই পাতা এক-একটি বেঞ্চি,—বিশ্রামের আহ্বান জানাচ্ছে সমাদরে। মাচার উপরে কুণ্ডলী পাকিয়ে রয়েছে একটি আদুরে বেড়াল, বারবার সে তার স্বচ্ছ-পাতলা কান দুটি খাড়া ক'রে কি যেন লক্ষ্য করছে। উঁচু চৌকাঠ পেরোতেই ছায়াভরা শীতল অন্তঃপুর।

গিরি-সঙ্কটের শেষপ্রান্তে শুয়ে আছি ঘোড়ার লোমের কম্বলের উপর। আমার চারদিকেই নতুন-কাটা খড়ের গাদা, তার ঝাঁঝালো সৌরভ নাকে যেন ঝাপট মারছে। গৃহস্থ কৃষকেরা আরো একটুখানি শুকিয়ে নেবার জন্যে তা ছড়িয়ে দিয়েছে উঠানে রোদে—এর পরেই সোজা গাদাঘরে। খড়ের গদির উপরে শুয়ে থাকতে কী যে আরাম! প্রতিটি গাদার মধ্য থেকেই উঁকি মারছে শিশুদের কচিকচি মুখ। লালঝুঁটিয়ালা মোরগেরা খড়ের ভিতরে খুঁজে ফিরছে পোকামাকড়। একটা বাচ্চা কুকুর গড়াগড়ি দিচ্ছে আহ্লাদে।

ঝাঁকড়া-মাথা কিষাণ ছেলেরা খিলখিল হাসছে, উজ্জ্বল দাঁতগুলি ঝিকমিক করে উঠেছে রোদে।

ঘরের জানালা দিয়ে গোলগাল,হাসিহাসি মুখখানি বাড়িয়ে দিয়ে হাসছে এক কিষাণ-বৌ।

ছেলেদের হৈ-হল্লা দেখে হাসছে, না হাসছে খড়ের গাদার উপরে শিশুদের লুকোচুরি খেলা দেখে?

একটি মেয়ে কুয়ো থেকে মজবুত হাতে টেনে তুলছে মস্ত বড় একটা কলসী, ছলাৎ ছলাৎ উছলে পড়ছে জল। ঝুলতে ঝুলতে কলসীটা কাঁপছে, দড়িটাও দুলছে—টুপ টুপ করে এক এক ফোঁটা জল পড়ছে কুয়োর মধ্যে।

আমার সামনেই ঐ যে দাঁড়িয়ে রয়েছে এক বুড়ী। গোল-গোল মুক্তো-কাচের তিন-তিন ছাড়া মালা দুলছে তার শীর্ণ গলায়। তার ধুসর-কেশ মাথাটিতে জড়ানো রয়েছে লাল চেক-কাটা হলদে রঙের রুমাল, রুমালটা ঝুলে

নেমেছে বুড়ীর চোখের উপরে।

বুড়ীর চোখের হাসিটুকু কী সুন্দর, কেমন এক দরদে ভরা। তার শীর্ণ-শুষ্ক মুখখানিতে ফুটে রয়েছে কী মধুর একটি সহৃদয় হাসি। বয়স সত্তরের কম হবে না, তবু এখনো দেখে বোঝা যায় কী অপরূপ সুন্দরী ছিল সে।

রোদে-গরম হাতখানি বাড়িয়ে, সে আমাকে এক ঘটি ধারোষ্ণ দুধ খেতে দিল। ঘটিটার কানায় কানায় ফোঁটা-ফোঁটা দুধ লেগে রয়েছে মুক্তোমালার মতো; আর একহাতে সে বাড়িয়ে দিয়েছে মস্ত বড় একখানা সদ্য-সেঁকা রুটি। এখনো গরম!

'তুমি আমার অতিথি, আমার দেবতা! পেট ভরে খাও, ভগবান তৃপ্ত হবেন।'

······হঠাৎ ডানা ঝটপটিয়ে ডেকে ওঠে একটা মোরগ, গোয়ালঘর থেকে শান্ত স্বরে সাড়া দেয় বাছুর।

'আঃ, কী সুন্দর ওটের ক্ষেত!'—আমার কোচোয়ানের গলার স্বরে খুশি উপচে পড়ে।

কী আরাম, কী আনন্দ, কী শান্তি! কী অফুরন্ত রত্নভাণ্ডার! রাশিয়া—রাশিয়ার উদার পল্লীর এ কী আশ্চর্য রূপ! কী পবিত্র শান্তি, কী গভীর সান্ত্বনা!

হঠাৎ ভাবতে লাগলাম: আচ্ছা, বাইজান্টিয়ামে সেইন্ট-সোফিয়া গির্জার বিশ্ব-বিনিন্দিত যে পবিত্র ক্রুশ, অথবা আর যা-সব বাজে শহুরে মাল নিয়ে আমরা মাতামাতি করে থাকি,—তা, তা আমাদের জীবনে এমন কী একটা!

## ॥ আকুলিনা ও একগুচ্ছ ফুল ॥

তখন শরতকাল, সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি। আমি একটা বার্চ বনে বসে আছি। ভোর থেকেই গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি হচ্ছে কুয়াশার মতো, থেকে থেকে ফুটে উঠছে রোদ। আবহাওয়া অস্থির। এক-এক সময় সারাটা আকাশ ঢেকে যাচ্ছে শুভ্র-কোমল মেঘে, আবার ক্ষণেকের জন্যে নানা জায়গা হয়ে উঠছে মেঘমুক্ত; তখন সেই ছিন্ন মেঘের আড়ালে ফুটে উঠছে নীলোজ্জ্বল কোমল-নয়নের মতো নভস্তল। বসে বসে আমি চারদিকটা তাকিয়ে দেখছি, আর কান পেতে শুনছি।

মাথার উপরে পল্লবদলের অস্ফুট মর্মর। শুধু তাই শুনেই বলা যায়, তখন কোন্ ঋতু। সেই মর্মর-গুঞ্জন বসন্তের আনন্দময় স্মিত শিহরণ নয়, গ্রীষ্মের অস্ফুট কানাকানি বা দীর্ঘ আলাপও নয়, আবার বিলম্বিত শরতের ভাঙা-ভাঙা কথাও নয়,—এ তার অস্ফুট তন্দ্রালস ভাষা। গাছের মাথায় মাথায় মৃদু-মর্মরে বয়ে চলেছে মন্থর বাতাস। মেঘের আড়ালে লুকোচ্ছে ও বেরিয়ে আসছে সূর্য। আর এদিকে ধারা-সিক্ত বনের অন্তঃস্থলেও দেখা যাচ্ছে কত না বিচিত্র পরিবর্তন—কখনো-বা উজ্জ্বল, যেন হঠাৎ হেসে উঠছে তার অন্তরের সবকিছুই। মাঝে মাঝে সহসা ঝল্‌কে উঠছে লীলায়িত বার্চগাছগুলির শীর্ষ-দেশ—উজ্জ্বল-শুভ্র রেশমের মতো। মাটিতে বিছানো ছোট-ছোট পাতা যাদুর মতো রঙিয়ে উঠছে হলদে-সোনালি রঙে। দৃষ্টির সামনে জটলা বেঁধে আছে তরঙ্গায়িত দীর্ঘ ব্রাকেনের সুন্দর শাখাগুলি; পাকা আঙুরের মতো তাদের রঙ্! আবার কখনো-বা সবকিছুর উপরেই এসে পড়ছে নীলাভ ছায়া, মিলিয়ে যাচ্ছে উজ্জ্বল রঙ্‌বাহার। এবারে বার্চগাছগুলি দেখাচ্ছে আবছা-শাদা,—শীতের ম্লান রোদ ছড়িয়ে পড়ার আগে শেষ-রাতের তাজা তুষারের মতো।

স্পষ্টভাবে বিবর্ণ হ'য়ে উঠলেও বার্চগাছগুলির প্রায় সব পাতাই তখনো সবুজ; কেবল এখানে ওখানে দেখা যাচ্ছে দু-একটি কচিপাতা লাল বা সোনালি। বৃষ্টি-ভেজা স্বচ্ছ সুকোমল শাখাজালের ফাঁকে ফাঁকে সূর্য-কিরণ এসে পড়েছে সেই কচি পাতার উপর; তখন পাতাটি যেভাবে জ্বলজ্বল করে উঠছে তা সত্যিই চেয়ে দেখবার মতো। একটি পাখীর ডাকও শোনা যাচ্ছে না কোথাও, সবাই

মিলে অদৃশ্য হ'য়ে আছে ; মাঝে মাঝে কখনো বা ঘণ্টাধ্বনির মতো বেজে উঠছে টম্‌টিটে পাখীর আওয়াজ। হ্যাঁ, বার্চের এই বন-ঝোপটার মধ্যে গিয়ে বসবার আগে আসছিলাম আমি দীর্ঘ আসপেন বনের মধ্য দিয়ে। সঙ্গে আমার কুকুরটা।

এখানে সত্যিই বলছি, ম্লান শুভ্র-দেহ ও সবুজ পাতাভরা আসপেন গাছ-গুলিকে আমি তেমন পছন্দ করি না।······এদের গোলাকার বিপর্যস্ত পাতাগুলির শিহরণও ভালো লাগে না। তবে, ছোট ছোট ঝোপঝাড় থেকে সোজা দাঁড়িয়ে উঠে এরা যখন গ্রীষ্মের কোনো বেলাশেষে অস্তযাত্রী স্ূর্যের রশ্মিজালের দিকে মুখ ক'রে, অফুরন্ত আভায় উজ্জ্বল হ'য়ে ওঠে—গোড়া থেকে আগা পর্যন্ত, আর কাঁপতে থাকে শুধু—তখনি এদের লাগে সুন্দর। আবার কোনো ঝকঝকে দিনে বায়ু-হিল্লোলে যখন এরা তরঙ্গায়িত ও মর্মরিত হ'য়ে নীল আকাশের সঙ্গে কানাকানি করে, এবং এর প্রত্যেকটি পাতাই বাঁধন ছাড়া হ'তে প্রাণপণ চেষ্টা করে সুদূরে উড়ে যাবার বাসনায়—তখনও একে লাগে সুন্দর। কিন্তু সাধারণত, গাছটাকে আমি পছন্দ করি না। তাই এখানে না থেমে বার্চবনে চলে আসি, আরাম ক'রে বসি একটা গাছের তলায়।······তারপর চারদিকের দৃশ্যের মধ্যে ডুবে গিয়ে কখন ঘুমিয়ে পড়ি।······কতক্ষণ ঘুমিয়ে ছিলাম বলতে পারি না ; যখন চোখ মেললাম, বনের সারাপ্রাণ স্ূর্যালোকে ভরে গেছে, আনন্দে মর্মরিত পল্লবদলের উপর দিয়ে ঝলমল করছে গাঢ়-নীল আকাশ ; প্রবল হাওয়ার তোড়ে কোথায় উড়ে গেছে মেঘেরা! আবহাওয়াই বদলে গেছে······বাতাসে যেন শুষ্ক সজীবতা। মনে হচ্ছে বাদল-দিনের শেষে আজকের সন্ধ্যাটি হবে শান্ত সমুজ্জ্বল।

আমি উঠে যাচ্ছি আবার শিকার খুঁজতে, এমন সময় সহসা আমার চোখ পড়ল একটি নিশ্চল মনুষ্যমূর্তির উপর। লক্ষ্য করে দেখলাম এক চাষী-তরুণী ; ব'সে আছে হাত বিশেক দূরে। চিন্তায় তার মাথা আনত, হাত দুখানি এলিয়ে পড়েছে কোলের উপর ; আধোখোলা একটি মুঠোতে ধরা রয়েছে একগোছা বুনোফুল—ফুলগুলি হাওয়ার বেগে তার চৌখুপী পেটিকোটটির উপর কাঁপছে। গলা ও হাত পর্যন্ত আঁটা গায়ের ধবধবে-শাদা জামাটি তার দেহখানিকে জড়িয়ে আছে ভাঁজে ভাঁজে, হলুদ-রঙ্‌ দু'ছড়া গুটির মালা তার গলা থেকে নেমে পড়েছে বুকের উপর। অপরূপ সুন্দরী সে। তার সোনালি রঙ

সুন্দর কেশভার কপালের উপর নামিয়ে এনে সযত্নে বাঁধা আধো-চাঁদের মতো, তার উপরে বাঁধা গাঢ়লাল একটি ফিতে। তার মুখের রঙ্ ঈষৎ সোনালি। আমি তার চোখ দুটি দেখতে পেলাম না,—কেন না চোখদুটি সে একবারো উপরে তোলেনি। দেখতে পেলাম তার ভুরু-জোড়া ও চোখের দীর্ঘ পালকগুলি। সেগুলি ভিজা। তার গালেও রোদে চিকচিক্ করছে শুষ্কপ্রায় অশ্রুরেখা—রেখাটি নেমে এসেছে তার ব্যথা-বিবর্ণ ওষ্ঠ পর্যন্ত। এমন কি, কিছুটা খাটো ও মোটা নাকটিও তার মুখের সৌন্দর্য নষ্ট করতে পারেনি। তার ছোট্ট মাথাটি মোটের উপর সুন্দরই। তার মুখখানির ভাবেই আমি বিশেষ করে আকৃষ্ট হয়ে রইলাম। এমন সাদাসিধে, সরল-শান্ত, এমন বিষণ্ণ, আর আপন বেদনায় ও শিশুসুলভ বিস্ময়ে এমন পরিপূর্ণ! পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছিল, আর কারো প্রতীক্ষা করছে সে। বনের মধ্যে কি যেন অস্ফুটভাবে মট্‌মট্ শব্দ করল। অমনি সে মাথা তুলে তাকাল চারদিকটায়। স্বচ্ছ ছায়ায় তার দুটি চোখ এবার ক্ষণিকের জন্যে দেখতে পেলাম: আয়ত, উজ্জ্বল, ভীরু দুটি চোখ—ঠিক হরিণ-শিশুর মতো! যেদিক থেকে অস্পষ্ট শব্দটি এসেছে, সেদিক থেকে চোখ দুটি আর না তুলে কয়েক পলক সে কান পেতে শুনল। তারপর একটি গভীর দীর্ঘশ্বাস পড়ল; ধীরে ধীরে মাথাটি ঘুরিয়ে ফুলগুলি গোছাতে লাগল নুয়ে প'ড়ে। তার চোখের পাতায় ফুটে উঠল রক্তিমাভা, ওষ্ঠ দুটি যেন অস্পষ্টভাবে সঙ্কুচিত হ'ল, তার চোখের ঘন পালকরাজি বেয়ে নতুন করে অশ্রু গড়িয়ে প'ড়ে গালের উপর চিক চিক করতে লাগল। অনেকক্ষণ কেটে গেল এইভাবে। বেচারী মেয়েটি মাঝে মাঝেই হতাশায় হাত দুখানি কেবল নাড়াচাড়া করছিল, কিন্তু নিজে সে ছিল একেবারেই নিস্পন্দ নীরব।

বনের মধ্যে আবার মট্‌মট্ শব্দ হ'ল। এবারে চমকে উঠল সে। শব্দটা থামল না, ক্রমেই স্পষ্ট হয়ে আসছে, কাছে আরো কাছে। এখন স্পষ্টই শোনা যাচ্ছে দৃঢ় দুটি দ্রুত পায়ের শব্দ। মেয়েটি সোজা হয়ে বসল,—মনে হ'ল যেন ভয় পেয়ে গেছে। তার স্থির চোখ দুটি চঞ্চল ও উজ্জ্বল হয়ে উঠল কিসের আশায়। ঝোপের ভিতর থেকে তখন তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এল একজন লোক। তার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে মেয়েটি হঠাৎ রাঙা হয়ে উঠল, মুখে ফুটে উঠল ছোট্ট একটি ফুটি-ফুটি হাসি। উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করতে গেল, কিন্তু বিবর্ণ ও বিহ্বল হয়ে বসে পড়ল। লোকটি তার পাশে স্থির হয়ে দাঁড়ালে পর সে তার চোখদুটি তুলে চাইল—মিনতি-কম্পিত দৃষ্টিতে।

আমি যেখানে লুকিয়ে ছিলাম, সেখান থেকে লোকটির দিকে তাকালাম। স্বীকার করছি, লোকটিকে আমার মোটেই ভালো লাগেনি। তার বাইরের চেহারা দেখে বলা যায়—সে কোনো ধনী যুবকের উদ্ধত-প্রকৃতি খানসামাই হবে। তার বেশবাসে ফুটে উঠছে চাল আর চালিয়াতি। গায়ে তার তামাটে রঙের একটা কোট—নিঃসন্দেহ যে, গলিয়ে এনেছে তার মনিবের বাক্স থেকেই। কোটটা গলা পর্যন্ত আঁটা। মাথায় তার সোনালি ফিতে-ঘেরা মখমলের টুপি ; সেটা সামনের দিকে টেনে এনে ভুরু পর্যন্ত নামানো। তার শাদা সার্টের গোল ও শক্ত কলারটা তার কান দুটোকে ঠেলে তুলে কেটে বসেছে গালের উপর ; জামার হাতার কলপ-দেওয়া স্কার্ফ দুটো ঢেকে রেখেছে তার লালচে ও বাঁকা আঙুলগুলো, আঙুলগুলিতে আবার পীতাভ পীরোজা-মণি বসানো সোনা-রূপোর অনেকগুলি আঙটি। নির্লজ্জের মতো তার লাল-তাজা মুখখানা। আমার যতদূর ধারণা পুরুষের মনে তা অপ্রীতিই জাগিয়ে তোলে, কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় যে মেয়েদের কাছে তা ভালো লাগে প্রায়ই। তার রুক্ষ চেহারায় সে স্পষ্টতই চেষ্টা করছিল অবজ্ঞা ও বিরক্তির ভাব ফুটিয়ে তুলতে। অনবরত সে তার ছোট-ছোট চোখ দুটো পাকাচ্ছিল। এবার ভুরু কোঁচকাল, মুখখানা বাঁকিয়ে হাই তোলার ভাণ করল এবং অমনোযোগের সঙ্গে ও কতকটা কৃত্রিম ঔদাস্যে তার কোঁকড়ানো চুলগুলিকে ঠেলে দিল পিছনের দিকে, পুরু ঠোঁটের উপরকার হলুদ-রঙের গোঁফগুলি ধরে একটু টানল : এককথায় সে যা-সব হাবভাব দেখাতে লাগল তা অসহ্য। চাষী তরুণীটিকে তার প্রতীক্ষায় বসে থাকতে দেখামাত্রই সে এমনি-সব হাবভাব করতে লাগল। মন্থর পায়ে দম্ভভরে সে মেয়েটির কাছে এগোল, কিছুকাল দাঁড়িয়ে রইল, পকেটে হাত দুটি পুরল এবং দেখি-কি-না-দেখি করে মেয়েটির দিকে একবার উদাস দৃষ্টি বুলিয়ে মাটিতে বসে পড়ল। এবং ওইভাবেই সামনের দিকে উদাস চোখ মেলে, পা দোলাতে দোলাতে ও হাই তুলতে তুলতে, সে বলতে সুরু করল—'তুমি কি অনেকক্ষণ হয় এসেছ?'

মেয়েটি তখনি উত্তর দিতে পারল না। অবশেষে শোনা-যায়-কি-না-যায় এমন অস্ফুট স্বরে বলল—'হ্যাঁ, অনেকক্ষণ ভিক্তর!'

'ও!'—ভারিক্কী চালে লোকটি তার ঘন-চুলভরা মাথাটা থেকে টুপিটা খুলে পদস্থ লোকের মতোই চারদিকটা দেখে নিল একবার, এবং আবার টুপি দিয়ে সযত্ন-অবহেলায় ঢেকে রাখল তার দামী মাথাটা। তারপর বলল—'আর, আমি

এবিষয়ে একেবারে ভুলেই গিছলাম। তা ছাড়া, বৃষ্টিও হচ্ছিল।' আবারো হাই তুলে বলল—'অনেক কিছু করতে হয় আমাদের, সবকিছু দেখতে দেখতেই ব্যস্, সময়টি আর াওয়া যায় না ; আর কর্তা তো বক্‌ছে সব সময়েই। কাল রওনা হচ্ছি আমরা……'

মেয়েটি বলল—'কালই ?' তার শঙ্কিত চোখ দুটি সে লোকটির উপর স্থির করে রাখল।

'হ্যাঁ, কাল…'

—মেয়েটির সারাটা দেহ তখন কাঁপতে কাঁপতে ভেঙে পড়ছিল। এ দেখে বিরক্তির ঝাঁঝ নিয়েই আবার সে বলে উঠল—'চুপ্, চুপ্, একেবারে চুপ, আকুলিনা! কান্নাটা কিসের ? তুমি তো জানোই, ওটা আমি হজম করতে পারি না।' সে তার মোটা নাকটা সঙ্কুচিত করল—'চুপ না করলে, এক্ষুনি চলে যাব……কী সব বোকামি,—কি রকম নাকে কান্না !'

জোর করে তাড়াতাড়ি অশ্রু চেপে রেখে, আকুলিনা বলে উঠল—'এই যে, আমি আর কাঁদব না।' কিছুক্ষণ নীরব থেকে বলল—'তুমি কালই চলে যাচ্ছ ? ভগবান কখন যে আবার আমাদের দেখা করিয়ে দেবেন !'

'আবার আমাদের দেখা হবে, আবার হবে। সামনের বছর যদি না হয়, পরে হবে। মনে হচ্ছে, কর্তা পিটার্সবুর্গে সামরিক কাজে ঢুকবেন।' —কথাগুলি সে উচ্চারণ করতে লাগল হালকা ভাবে, অনুকম্পার সঙ্গে—'এবং হয়তো আমরা আরো দূরে যাব।'

আকুলিনা ব্যথিত স্বরে বলল—'আমাকে তুমি ভুলে যাবে, ভিক্তর ?'

'—না, তা কেন ? তোমাকে ভুলব না। কেবল, তুমি একটু বুদ্ধিমতী হও, বোকার মতো কাজ করে ব'সো না,…তোমার বাবার কথা মতো চলবে… আমি তোমাকে ভুলতে পারি ?'—অনাসক্তভাবে সে হাত-পা ছড়িয়ে হাই তুলল আবার।

মিনতিভরা নরম গলায় বলতে লাগল মেয়েটি—'আমাকে ভুলো না, ভিক্তর ! আমার মনে হয়, আমি তোমায় যত ভালবাসি, আর কেউই তোমায় তেমন ভালোবাসতে পারবে না। তোমায় আমি সব দিয়েছি…তুমি আমাকে বাবার কথা মতো চলতে বলছ…কিন্তু কী করে আমি বাবার কথা শুনে চলতে পারি ?…'

'কেন নয় ?'—চিৎ হয়ে হাতের উপর মাথা রেখে শুয়ে শুয়ে, কথাটা যেন পেটের ভেতর থেকে বার করল।

'কিন্তু, কেমন করে পারি আমি? সবি তো জানো তুমি, ভিক্তর!'—এবার সে কেঁদে ফেলল।

ভিক্তর কিন্তু ঘড়িটার ষ্টিল-চেনটা নিয়ে আঙ্গুল দিয়ে খেলা করতে লাগল, তারপর বলল—'দেখো আকুলিনা, বোকা নও তুমি, কাজেই যা-তা ব কো না। আমি তোমার মঙ্গল কামনা করি, আমার কথাটা বুঝছ? তুমি বোকা নও, বলতে গেলে একেবারে গেঁয়োও নও। তোমার মা তো চাষী ছিল না বরাবর। তুমি অবশ্যি কোনোই শিক্ষা পাওনি—তা, তা যেমন-যেমন বলা হবে তেমনিই চলবে বৈকি।'

'কিন্তু সে যে ভয়ানক, ভিক্তর।'

'ও বাজে কথা হে! ভয় খাবার কিচ্ছু নেই এতে।' তার আরো কাছে সরে এসে আবার সে বলল—'তোমার হাতে ওটা কি? ফুল?'

'হ্যাঁ'—আকুলিনা নিরুৎসাহের মতোই উত্তর দেয়—'আমি কতগুলো সুগন্ধি বনফুল আর গাছ তুলেছিলাম।'—এবার একটু খুশি হয়েই বলে যেতে লাগল, 'এই গাছগুলি বাছুরের খাবার বেশ ভালো। আর এগুলো হচ্ছে কুড়িগাঁদা। দেখো, কী সুন্দর ফুল! আগে কখনো আমি এমন ফুল দেখিনি। এগুলো হচ্ছে 'আমায় ভুলো না' (ফরগেট-মি-নট) আর, 'মা-মণি' (মাদার-ডার্লিং)—এগুলো আমি তোমার জন্যেই তুলেছি।'—সে ঘাস দিয়ে বাঁধা একগোছা নীলফুল দেখিয়ে বলল—'এগুলি ভাল লাগে তোমার?'

ভিক্তর আলসভরে হাত বাড়িয়ে ফুলগুলি একবার নিল, উদাসীন ভাবে গন্ধ শুঁকল, উপর দিকে চেয়ে চেয়ে সেগুলিকে আঙ্গুলে ঘোরাতে লাগল। আকুলিনা ওকে চেয়ে চেয়ে দেখছিল শুধু…… তার ব্যথাভরা চোখ দুটিতে কী কোমল অনুরাগ আর গভীর ভালোবাসা, আর কী একান্ত আত্মসমর্পণ! ভিক্তরকে ভয় করে সে, তাই কাঁদতে সাহস পাচ্ছিল না। ভিক্তরকে বিদায়-সম্ভাষণ জানাচ্ছে আকুলিনা, পঞ্চমুখে তার গুণগান করছে,—আর ভিক্তর কিনা বাদশার মতো আরামে শুয়ে শুয়ে চমৎকার সহিষ্ণুতা ও অনুকম্পা নিয়ে আস্বাদ করছে আকুলিনার প্রশংসা-বাণী। যথার্থই স্বীকার করছি, আমি তার লাল মুখখানার দিকে ক্রুদ্ধ চোখে চেয়ে ছিলাম। দেখতে পেলাম তার চোখে-মুখে অবজ্ঞাভরা যে উদাসীনতা তার অন্তরালে রয়েছে ফাঁপা অহঙ্কার, আর সেটাই কিনা ফেঁপে উঠছে ধীরে ধীরে। আর সেইক্ষণেই আকুলিনার মুখখানি দেখাচ্ছিল কী মিষ্টি! তার কামনা-করুণ সোহাগভরা সমস্ত প্রাণখানি উন্মুখ

হয়ে রইল ভিক্তরের সামনে। আর সে…সেই লোকটি তখন ফুলগুলি ঘাসের উপর ফেলে রেখে তার কোটের পাশ-পকেট থেকে পিতল-ফ্রেমের একটা চশমা বার করে চোখে পরতে লাগল। ভ্রুকুটি করে নাক ও গাল দুটি ফুলিয়ে ফুলিয়ে সেটা চোখে লাগাবার যতই চেষ্টা করছে সেটা ততই তার হাতের উপর গড়িয়ে পড়ছে।

'কি ওটা?'—আকুলিনা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে।

গাম্ভীর্যের সঙ্গে উত্তর এলো,—'চশমা!'

'কিসের?'

'কেন, ভালো করে দেখবার?'

'আমাকে দেখাও।'

ভিক্তর এবার ভ্রুকুটি করল, কিন্তু তাকে দিল ওটা।

'সাবধান, ভেঙো না; চোখে দিয়ে দেখো।'

'ভয় নেই, আমি ভাঙব না!'

আকুলিনা চশমাটি চোখে পরল। 'আমি যে কিছুই দেখতে পাচ্ছিনা।' —সরল মনেই বলল।

'কিন্তু প্রথমে তোমাকে এক চোখ বন্ধ করতে হবে যে।'—জবাবটি দিল সে অসন্তুষ্ট এক শিক্ষকের মতোই।

যে চোখটির সামনে কাচখানা ধরা আকুলিনা কিন্তু সেই চোখটাই বন্ধ করল।

'ওটা না, ওটা না, আচ্ছা বোকা! ঐটে!'—এই বলে সে আকুলিনাকে ভুল শোধরাবার সুযোগ না দিয়েই চশমাটা নিয়ে নিল। আকুলিনা একটু রাঙা হয়ে উঠল এবং একটু হেসে মুখখানি ফেরাল।

'এ দেখছি, আমাদের মতো লোকের জন্যে নয়।'

'আমারও মনে হয় তাই, বাস্তবিকই!'

বেচারী নীরব হয়ে গেল। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল! তারপর হঠাৎ সে বলে উঠল—'তুমি ছাড়া আমার কি হবে, ভিক্তর!'

ভিক্তর কাচখানা কোটের খুঁটে মুছে আবার পকেটে রাখল, তারপর বলল, 'হাঁ, হাঁ, প্রথমে তোমার কষ্ট হবে বৈকি।' অনুকম্পাভরে সে হাত দিয়ে একবার নাড়া দিল আকুলিনার কাঁধটায়। আকুলিনা ধীরে ধীরে তার হাতখানি নিয়ে একটি চুমু খেল ভীরুর মতো।

ভিক্তর তৃপ্তির হাসি হেসে বলে যাচ্ছিল, 'তুমি ভালো মেয়ে—তা নিশ্চয়ই, কিন্তু কি করা যাবে ? নিজেই তুমি দেখতে পাচ্ছ—আমি আর মনিব এখানে থাকতে পারি না। শিগগিরি শীত এসে পড়ছে। পাড়াগেঁয়ে শীত, জানো তুমি—স্রেফ্ বিরক্তিকর। কিন্তু পিটার্সবুর্গে সবি এক্কেবারে অন্যরকম। সেখানে এমন-সব আশ্চর্য জিনিষ আছে, তোমার মতো বোকা মেয়ে কখনো তা' স্বপ্নেও ভাবতে পারবে না। কত্সব গাড়ীঘোড়া, রাস্তাঘাট, মেলামেশার জায়গা, আর সভ্যতা···এক্কেবারেই আশ্চর্য···'

আকুলিনা আগ্রহে ঝুঁকে পড়ে শুনে যাচ্ছিল—তার ঠোঁট দুখানি ঈষৎ ফাঁক হ'য়ে আছে, ঠিক একটি শিশুর মতো !

মাটির উপর পাশ ফিরে শুয়ে আবার সেই লোকটি বলতে লাগল,—'কিন্তু, এসব কথা বলে আমার লাভ কি ? তুমি এর কিছুই বুঝতে পারবে না।'

'কেন ও কথা বলছ, ভিক্তর ! আমি বুঝি, আমি সব বুঝি।'

'ও আমার বোঝা রে ! কী বুদ্ধিমতী মেয়ে।'

আকুলিনা চোখদুটি নামাল ও ধীরে ধীরে বলতে লাগল—'তুমি এক সময় আমার সাথে এমনভাবে কথা বলতে না, ভিক্তর !'

'এক সময় ? ···এক সময় ! ও !'—যেন ক্রুদ্ধ হয়েই মন্তব্য করল।

দুজনেই নীরব।

ভিক্তর বলল—'আর তো দেরী করার সময় নেই !' এবং কথাটা শেষ হ'তে না হ'তেই সে কনুইয়ে ভর দিয়ে উঠতে যাচ্ছিল।

আকুলিনা মিনতি করে বলল—'আর একটু থাকো !'

'কিসের জন্যে ?······তোমাকে আমি আগেই তো বিদায়-সম্ভাষণ জানিয়েছি।'

'আর একটু সময় থাকো !'—আকুলিনা আবারো বলল।

ভিক্তর আবার শুয়ে পড়ে শিষ দিতে লাগল। আকুলিনা এক পলকের জন্যেও তার দিক থেকে চোখ ফেরাল না। এদিকে আমি দেখছিলাম : ক্রমে ক্রমে সে ভাবে অভিভূত হয়ে পড়ছে। তার ওষ্ঠ দুটি সঙ্কুচিত হয়ে উঠল, বিবর্ণ গাল দুটি কেমন আলোকিত হয়ে উঠল অস্পষ্ট রকম। শেষে ভাঙা-ভাঙা কথায় বলতে লাগল—'ভিক্তর, তোমার পক্ষে এটা খুবি অন্যায়···খুবি ! সত্যিই তাই।'

'কি অন্যায় ?'—ভ্রূকুটি করে জিজ্ঞেস করল লোকটি, এবং শরীরটাকে একটু তুলে ধরে আকুলিনার দিকে ফিরল।

'এটা খুবি খারাপ। বিদায়-বেলায় তুমি অন্তত একটা স্নেহমাখা কথাও তো বলতে পারতে—এই হতভাগিনীকে যা-খুশি একটা কথাও তো বলতে পারতে……'

'কিন্তু তোমাকে আমার কী বলতে হবে?'

'তা আমি জানি না ভিক্তর, তুমিই সবচেয়ে ভালো জানো। তুমি চলে যাচ্ছ, শুধু একটি কথা! আমি কী করেছি যে তুমি আমার সঙ্গে এরকম ব্যবহার করছ?'

'একটা অদ্ভুত জীব তুমি! আমি তার কি করতে পারি?'

'অন্তত, একটা কথা বলো, ভিক্তর।'

ভিক্তর বিরক্ত হয়ে মন্তব্য করল—'ও ঠিক একই সুর ধরে আছে!' উঠেই দাঁড়াল সে।

কষ্টেসৃষ্টে অশ্রু চেপে আকুলিনা তাড়াতাড়ি বলল—'রাগ ক'রো না, ভিক্তর!'

'আমি রাগ করিনি, তুমিই কেবল বোকামি করছ—তুমি কী চাও? তুমি জানো যে আমি তোমায় বিয়ে করতে পারি না, পারি? তবে তুমি কি চাও? আচ্ছা তো!'—এই ব'লেই সে যেন উত্তরের আশায় মুখখানা বাড়িয়ে রাখল ও আঙ্গুলগুলি ছড়িয়ে দিল।

আকুলিনা থেমে থেমে বলতে লাগল—'আমি কিছু চাই না, কিছুই না।' সাহসে ভর করে সে তার কাঁপতে-থাকা হাত দুখানি মিনতির মতো তার দিকে বাড়িয়ে, বলল—'কেবল যাবার বেলায় একটি কথা!' তার দুচোখ দিয়ে ঝরঝর অশ্রু গড়িয়ে নামতে লাগল গালের উপর।

টুপিটা চোখের উপরে নামিয়ে দিয়ে ভিক্তর শান্তভাবে বলল—'তার অর্থ, এখন কাঁদার পালা।'

দু'হাতে মুখ ঢেকে ফুলে ফুলে কাঁদতে কাঁদতে আকুলিনা বলল—'আমি কিছুই চাই না! কিন্তু সারা দুনিয়ায় আমার জন্যে আছে কী, ভবিষ্যতের জন্যেই বা রইল কি আমার? আমার কি হবে? হতভাগিনী আমি, আমার কী হবে? ওরা আমার যা-খুশি একটা বিয়ে দিয়ে দেবে—হতভাগিনী পরিত্যক্ত আমি, সবি আমার কপাল!'

ভিক্তর চাপা-গলায় বলল—'বলে যাও, বলে যাও!'—দাঁড়িয়ে পড়ে সে অসহিষ্ণু ভাবে নড়চড়া করতে লাগল।

'তুমি আমাকে একটা কথাও তো বলতে পারতে, একটা কথা,—বলতে পারতে: আকুলিনা—আমি তোমায়...'—হঠাৎ বুক-ভাঙা কান্না এসে তার কথাটা শেষ হতে দিল না; ঘাসের উপর উপুড় হয়ে পড়ে সে গভীর বেদনায় ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল শুধু। তার সারাটা দেহ কাঁপছে থর থর ক'রে, গলা ফুলে ফুলে উঠছে—অবরুদ্ধ নিবিড় ব্যথা অবশেষে বাঁধ ভেঙে বেরিয়ে এল অবিরল ধারায়। ভিক্তর ক্ষণেক দাঁড়িয়ে রইল, কাঁধ দুটি সঙ্কুচিত করল, তারপর লম্বা লম্বা পা ফেলে চলে গেল।

কয়েক পলক কেটে গেল। আকুলিনা প্রকৃতিস্থ হয়ে মাথা তুলল এবং হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে চারধারে তাকাতে তাকাতে হাত দুটি মোচড়াতে লাগল। ভিক্তরের পিছু-পিছু সে ছুটে যাবার চেষ্টা করল, কিন্তু পা দুটি তার অবশ হয়ে এল, হাঁটুতে ভর করে বসে পড়ল। তার কাছে আমি তখন ছুটে না গিয়ে আর পারলাম না, কিন্তু আমাকে দেখতে না দেখতেই সে সভয়ে আর্তনাদ করে উঠল—অপ্রাকৃতিক এক শক্তিতেই যেন দাঁড়িয়ে পড়ল এবং ফুলগুলি মাটিতে ছড়িয়ে রেখে অদৃশ্য হয়ে গেল গাছগুলির আড়ালে।

আমি মিনিটখানেক দাঁড়িয়ে রইলাম নিস্পন্দ নির্বাক, তারপর ফুলগুলি কুড়িয়ে নিয়ে বনের বাইরে চলে এলাম উন্মুক্ত প্রান্তরে।

সূর্য তখন নির্মল-ম্লান আকাশে নেমে এসেছে অনেকখানি। রশ্মিজালও যেন নিস্তেজ-শীতল, নিভু-নিভু! একাকার-করা এক নরম আলোয় ঢেকে আছে সমস্ত দিক-দিগন্ত। আধঘণ্টার মধ্যেই সূর্য অস্ত যাবে, বেলাশেষের দীপ্তি নেই বললেই হয়। দমকা হাওয়া ছুটে আসছে—সাগ্রহ অভ্যর্থনার মতো; আর তার আগে আগে দূতের মতো উড়ে উড়ে যাচ্ছে ছোট ছোট রাশি-রাশি কুঞ্চিত পাতা—সোজা ঝোপের ধার দিয়ে, রাস্তাটা পার হ'য়ে। মাঠের পারে ঝোপ-সারি প্রাচীরের মতো দাঁড়িয়ে, ছোট ছোট আলোক-কণায় সেখানটা উজ্জ্বল হয়ে আছে স্পষ্ট, কিন্তু ঝলমল করছে না। লালচে গাছগুলিতে, ঘাসের পাতায়, চারপাশে খড়ের বনে বনে ঝলমল করছে আর কাঁপছে শরতের অসংখ্য মাকড়শা-জাল।

আমি দাঁড়িয়ে রইলাম...প্রাণে ব্যথা লাগতে লাগল। প্রকৃতির উজ্জ্বল-হিম হাসির তলায় একমনে দাঁড়িয়ে; শঙ্কাও লাগছিল আসন্ন শীতের। কর্কশ-গম্ভীর শব্দে বাতাসকে ডানায় ডানায় ঝাপটা মারতে মারতে—মাথার অনেক উপর

দিয়ে উড়ে যাচ্ছিল একটা সতর্ক কাক। মাথা ঘুরিয়ে আমাকে সে পাশ থেকে দেখে নিল, ডানা ঝটপট করল, এবং হঠাৎ ডাকতে ডাকতে অদৃশ্য হয়ে গেল বনের আড়ালে। শস্য-মাড়ানো এক আঙিনা থেকে মস্ত বড় একঝাঁক পায়রা উড়ে এল খুশির ডানায় এবং সারি বেঁধে ঘুরপাক খেতে খেতে হঠাৎ এক ঝট্‌কায় ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে। সমস্তই শরতের লক্ষণ! কে যেন পাহাড়ের রুক্ষ পাশ-পথ দিয়ে গাড়ী হাঁকিয়ে আসছিল—তার শূন্য গাড়ীতে শব্দ হচ্ছিল ঘড় ঘড় ঘড়!

এবারে ঘরের মুখে ফিরে চললাম। কিন্তু হতভাগিনী আকুলিনার অশ্রুমলিন মুখখানি আমার বুকের মধ্যে জেগে রইল বহুদিন পর্যন্ত! তার ফুলগুলি অনেকদিন হয় শুকিয়ে গেলেও সযত্নে আমার কাছেই রয়ে গেছে আজো।

## ✽ ফিয়দর দস্তয়েভ্স্কি ✽

### ১৮২১—১৮৮১ খ্রী.

রুশ সাহিত্যের এবং বিশ্ব-সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ লেখকদের মধ্যে দুজন হলেন রুশবিপ্লবের আগেকার—ফিয়দর দস্তয়েভ্স্কি এবং লিয় তলস্তয়।

দস্তয়েভ্স্কি তলস্তয়ের পুরোগামী। বহুমুখী চিন্তা-চেতনার গভীরতায়, তেমনি বিশালতায় এঁরা দুজন অতুলনীয়--তেমনি অতিচারী আদর্শবোধে ও মর্তচারী জীবন-যন্ত্রণায়। দস্তয়েভ্স্কি আপন বাল্যজীবনের বিরুদ্ধ পরিবারিক পরিবেশে ও পরবর্তী শারীরিক-মানসিক ও রাজনৈতিক নির্যাতনের মধ্যেও মাথা উঁচ রেখেছেন, —মানবিক-বোধ ও আদর্শ-বোধকে কখনো কোনো অবস্থায়ই ত্যাগ করেননি। জীবন সম্পর্কে এমন তীব্র অভিজ্ঞতার যন্ত্রণা খুব কম লেখকই অনুভব করেছেন, এবং লিখেছেন এমন আশ্চর্য নিষ্ঠার সঙ্গে। দরিদ্র মানুষের প্রতি লেখকের দরদ সুগভীর, কিন্তু সমাজবাদ আদর্শ হলেও মানুষের অন্তর্নিহিত নীতিবোধের ও ধর্মবোধের শেষ-বিজয়ে এবং দারিদ্র্য-যন্ত্রণার মধ্যেই আধ্যাত্মিক মহৎ পরিণামের কথাটাকেই বেশী বড় করে তুলেছেন। তবু, মানুষের দুঃখবেদনার ও মর্মযন্ত্রণার শিল্পীরূপে দস্তয়েভ্স্কি মহান ও অনন্য।

লেখক জন্মেছেন জমিদার পরিবারে ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে, বাবা ছিলেন বদরাগী ও রুক্ষপ্রকৃতি; খুন হয়েছেন প্রজাদের হাতে। মা বড়ই অপমান ও নির্যাতন ভোগ করতেন পারিবারিক জীবনে। বালক দস্তয়েভ্স্কির মনের উপর এবং ভবিষ্যৎ জীবনের উপরেও এসব অস্বাস্থ্যকর প্রভাব ফেলেছে। বাল্যকাল থেকে সারাটা জীবনই ইনি দুঃসহ কষ্টও পেয়েছেন ফিট-রোগে।

দস্তয়েভ্স্কি ছয় বৎসর অধ্যয়ন করে সামরিক যান্ত্রিক-স্থপতি বিদ্যালয় থেকে স্নাতক হন, কিন্তু সামরিক বিভাগে কাজ করেননি—সাহিত্য-রচনায় ব্রতী হন একমন। ২৪ বছর বয়সে প্রথম উপন্যাস 'দরিদ্র জনগণ' প্রকাশিত হলে সর্বোচ্চ সাহিত্য-সমাজে সাদরে স্থান লাভ করেন; ফরাসী ও ইংরেজী শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকদের এবং বিশেষত বাইবেল নিষ্ঠাভরে অধ্যয়ন করেন; লেখকের বিভিন্ন উপন্যাসে তার প্রভাবও পড়ে। প্রকাশিত হয় 'কারমাজভ ভ্রাতৃবৃন্দ' ও 'মূর্খ' উপন্যাস, এবং একটি ছোটগল্প-গ্রন্থ। এই সংগ্রহ-গ্রন্থের গল্পটিতে দেখা যাবে দস্তয়েভ্স্কির বাস্তব-চেতনার সঙ্গেই অতিচারী আদর্শবোধের মিলন।

সংগুপ্ত বিপ্লবী সংগঠনের সদস্যরূপে অন্যান্যদের সঙ্গেই বন্দী হন দস্তয়েভ্স্কি, বয়স তখন আটাশ। তাঁকে পাঠানো হয় বহুদূরে বন্দী-শালায়, শৃঙ্খলিত অবস্থায়ই কঠোর সশ্রম জীবন কাটাতে হয় সুদীর্ঘ চার বৎসর। মুক্তি পেয়ে সামরিক বিভাগে কাজ করেন উচ্চপদস্থ অফিসার রূপে। পাঁচ বৎসর পরে পিটার্সবুর্গে ফিরে এসে সাহিত্য রচনায় ব্রতী হন,—কিন্তু অভাবে ও ঋণভারে বিপর্যস্ত দস্তয়েভ্স্কি দিশেহারা হয়ে পড়েন, মগ্ন হয়ে পড়েন জুয়াখেলার উত্থানে ও পতনে। এই সময়ের কথায়ই লেখা হয় উপন্যাস 'জুয়ারী'—মাত্র ছাব্বিশ দিনের মধ্যে। এই সময়েই বিয়ে করেন। কিছুদিনের মধ্যে এই স্ত্রী মারা গেলে বিয়ে করেন তাঁর সহকারিণী আন্না স্নিৎকিন-কে এবং সাহিত্য-জীবনেও পান এক সহধর্মিণীকে।

১৮৫৯—১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দ-কালে রাজনৈতিক বিপ্লবের পরিবেশে প্রধানত পত্র-পত্রিকায় প্রচারধর্মী কাজে ব্যস্ত থাকেন; এসময়ের শ্রেষ্ঠ সাহিত্য-গ্রন্থ হ'ল 'এক লেখকের রোজনামচা।' অন্যান্য বিখ্যাত উপন্যাস 'অপরাধ ও শাস্তি', 'দ্বৈত' 'মৃতের ঘর থেকে কিছু সংবাদ' 'অবহেলিত ও অপমানিত'।

সামন্ততন্ত্রের পতন ও ধনতন্ত্রের জাগরণ-কালে রুশদেশে যেসব সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তন ঘটে তার সঙ্গে বিশেষভাবেই জড়িত ছিল লেখক দস্তয়েভ্স্কির জীবন ও সাহিত্য। তাঁর ঘটনাবহুল জীবনের অবসান ঘটে ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে, বয়স তখন ষাট বৎসর।

## ॥ উৎসবের দিনে এক ভিখারী-ছেলে ॥

আমি এক উপন্যাসিক এবং আমার বিশ্বাস এ গল্পটা আমি তৈরী করেছি। যখন বলছি 'আমার বিশ্বাস', এটা নিশ্চিত যে আমিই তৈরী করেছি। কিন্তু যেভাবেই হ'ক আমি অনুভব না করে তো পারি না—এটা সত্যিসত্যিই ঘটেছিল কোথাও, আর তা কোনও এক বড়দিনের উৎসব-সন্ধ্যায়—কোনো এক বড় শহরে, এবং ভয়ঙ্কর এক তুষার-ঝরা দিনে।

আমি দেখতে পাচ্ছি একটি ছেলেকে—বছর ছয়েক বয়স, কিংবা তার চেয়েও ছোট। ছেলেটি সেদিন ভোরে ঘুম থেকে জেগে উঠেছে এক হিম-অন্ধকার কুঠরীতে। গায়ে আলগা একটা জামা, ঠাণ্ডায় কাঁপছে। তার মুখ থেকে নিশ্বাস বেরুছে বাষ্পের মতো ; একটা বাক্সের কিনারায় বসে বসে মুখ দিয়ে সে ওরকম বাষ্প বার করছে, আর তা মিলিয়ে-যাওয়াটা দেখছে,—বেশ মজাই পাচ্ছে। কিন্তু যা খিদে পেয়েছে ভয়ানক। তার রুগ্না মা শুয়ে আছে একটা খাটিয়ায় অন্ধকারে, পাতলা একটা মাদুরের উপর, বালিশের বদলে কিছু-একটা দলা-পাকানো। স্ত্রীলোকটি এখানে এল কী ক'রে? সম্ভবত, কোনো মফস্বল শহর থেকে এসেছিল ছেলেকে নিয়ে, তারপর অসুখে পড়েছে হঠাৎ। বাড়ীওয়ালী—যে কিনা বাড়ীটার কোণ-কানচাও ভাড়া খাটাত, তাকে থানায় ধরে নিয়ে গেছে দু'দিন আগে। ভাড়াটেরা বাইরে গেছে যে যার কাজে, একজন কেবল বাড়ীতে আছে তো মাতাল হয়ে পড়ে আছে বেহুঁশ এই চব্বিশ ঘণ্টা—বড়দিনের ছুটিকে আগাম বরণ করছে! আর এক কোণে শুয়ে শুয়ে বাত-যাতনায় গোঙাচ্ছে এক আশী বছরের বুড়ী—এককালে ছিল সে শিশুদের ধাত্রী, আর এখন মরে যাচ্ছে প'ড়ে প'ড়ে নিঃসঙ্গ। ছেলেটাকে দেখে সে গজগজ করছিল, গালিগালাজ দিচ্ছিল ; ছেলেটা তাই ভয় পাচ্ছিল ঐ বুড়ীর কোণটার দিকে যেতে। বাইরে হলঘরটায় সে খাবার জলটা পেয়েছে, কিন্তু একটুকরো খাবারও পাচ্ছে না কোথাও : বারবার চেষ্টা করেছে তার মাকে জাগাতে। এখন অন্ধকারে তার কেমন ভয় করছে। কখন নেমে এসেছে সন্ধ্যা, কিন্তু কেউই জ্বালছে না আলো। মায়ের মুখে হাত বুলিয়ে দেখল, কিন্তু মা কেন যে একটুও নড়ছে না

কিছুই সে বুঝে উঠছে না। আর, মায়ের গাটাই বা দেয়ালের মতো এত ঠাণ্ডা কেন? ওঃ জায়গাটা কী ঠাণ্ডা,—ভাবছে সে; কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল, মায়ের কাঁধটা থেকে হাতখানা সরাতেও ভুলে গেল। এবার সে তার ছোট ছোট আঙুলগুলির উপর নিশ্বাস ফেলতে লাগল—গরম করবার জন্যে। তার ছেঁড়াখোঁড়া ঝালুম-ঝুলুম টুপিটা খাটিয়ার উপর থেকে হাতড়ে নিয়ে আলগোছে পথ হাতড়ে হাতড়ে বেরিয়ে পড়ল আস্তানা থেকে। খুব জলদিই সে চলে যেত; তা, পাশের বাড়ীর সিঁড়ির মুখেই প্রকাণ্ড কুকুরটা সারাটা দিন যা গর্জন করে, বড়ই ভয় হয় তার। সবে এখন কুকুরটা নেই, আর সেও বেরিয়ে এসেছে রাস্তায়।

আঃ ভগবান! এ কী বড় শহর! এরকমটা তো সে আর কখনোই দেখেনি। যে মফঃস্বল শহর থেকে সে এসেছে, সেখানে রাত তো কালিগোলা অন্ধকার, সারাটা রাস্তায় কিনা একটি মাত্র আলো! ছোট-ছোট নিচু নিচু কাঠের বাড়ীঘর ও জানালা তো সবসময়েই বন্ধ, সন্ধ্যা শুরু হতেই রাস্তায় লোকজন নেই! সবাই থাকে বন্ধ ঘরে। সারাটা রাত কেবল সে কী ঘেউ ঘেউ আর চিৎকার—শত শত হাজার হাজার কুকুরের। সেখানে কিন্তু ঠাণ্ডা লাগেনি তার, খাবারও ছিল যথেষ্ট। আর এখানে···হা ভগবান! যদি সে খেতে পেত একটু-কিছু! কিন্তু চারদিকে এ কী গোলমাল হৈ হল্লা! কী ঝলসানো আলো, আর লোকের কী ভিড়!···ঘোড়া, গাড়ী···আর কী ঠাণ্ডা, কী বিষম ঠাণ্ডা! ঘোড়াগুলি থেকে থেকে বাষ্প উঠছে কুণ্ডলী পাকিয়ে—ঘোড়াগুলির মুখের ও নাকের উষ্ণ নিশ্বাস থেকে। ঝরে-পড়া তুলোর মতো তুষারের মধ্যে দিয়েই শোনা যাচ্ছে পাথরের উপর ঘোড়ার খুরের খটাখট আওয়াজ। আর কী ঠেলাঠেলি ধ্বস্তাধ্বস্তি···কিন্তু, হে ভগবান, ছেলেটা ছটফট করছে এক টুকরো খাবারের জন্যে। আর তখনি, তার সরু-সরু ছোট-ছোট আঙুলগুলি ভয়ানক টাটাতে শুরু হ'ল। এক পুলিশ তার পাশ দিয়ে চলে গেল, মাথাটা ঘুরিয়ে চলে গেল—ছেলেটাকে না দেখে তাই।

এবারে আর একটা সড়ক। কী চওড়া! পথের লোকজন নিশ্চয়ই চাপা না পড়ে যায় না। কিরকম দ্রুত হাঁটছে, ছুটছে, চেঁচাচ্ছে! আর আলো কী আলো! বাঃ রে, এটা কি? প্রকাণ্ড একটা জানালা। কাচের পিছনেই একটা গাছ, কী লম্বা। উঁচু একেবারে ছাত পর্যন্ত! হ্যাঁ, 'খ্রীষ্টমাস ট্রি'—বড়দিনের উৎসবের গাছ, ডালে ডালে কত না ছোট-ছোট আলো, রঙীন কাগজ,

আপেল, আর ছোট-ছোট পতুল আর অনেক-অনেক ঘোড়া! ঘরের মধ্যে শিশুরা—কী পরিষ্কার আর কী সুন্দর সুন্দর পোশাক-পরা: ছুটছে, খেলছে, হাসছে, খাওয়া-দাওয়া করছে। এবারে ছোট্ট একটি মেয়ে নাচ সুরু করেছে ছোট্ট একটি ছেলের সঙ্গে—মেয়েটি কী যে সুন্দর! কাচের ভিতর দিয়েও গানবাজনা শোনা যাচ্ছে বেশ। রাস্তার ছেলেটি তো অবাক, এসব দেখতে দেখতে সেও হাসছে। তার পায়ের আঙুলগুলি কিন্তু আবার টাটাতে সুরু করেছে, হাতের আঙুলগুলি ঠাণ্ডায় লাল হয়ে উঠেছে—শক্ত হয়ে উঠেছে—বাঁকাতে পারছে না, নাড়ালেও লাগছে। হঠাৎ সে যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে উঠল,—কাঁদতে কাঁদতেই ছুটতে শুরু করল। কিন্তু, ঐ যে আরেকটা জানালা, পিছনেই ঘরের মধ্যে আর একটি গাছ, টেবিলে টেবিলে কেকের পর কেকের মেলা,—কত না রকম-সকম তাদের: লাল, হলদে—উপরে ক্রীম-ফল লাগানো! ঝলমল পোষাক-পরা চারজন অল্পবয়সী মেয়ে বসে আছে সেখানে, যারা অতিথি এসেছে দিয়ে দিচ্ছে তাদের হাতে হাতে, দোরটা বারবার খুলছে আর লোকজন ঢুকছে বাইরে থেকে, ছোট্ট ছেলেটি চুপিচুপি এগিয়ে গেল দরজার দিকে—হঠাৎ খুলে নিয়ে ঢুকে গেল ভিতরে। ওঃ ভগবান! চেঁচিয়ে উঠল সবাই—কী ভয়ানক! কী রকম হাতের ভঙ্গী করল তাড়িয়ে দেবার জন্যে। একজন মহিলা দ্রুত ওর কাছে এগিয়ে এসে হাতে দিল একটা তামার পয়সা,—নিজ হাতেই খুলেও দিল দরজাটা। ওঃ, কী ভয় হচ্ছে ছেলেটার! পয়সাটা পড়ে গেল হাত থেকে, সিঁড়ি বেয়ে গড়িয়ে নামল ঝন্‌ঝন্ শব্দে। সে তো ধরতেই পারছিল না শক্ত আঙুলগুলি বাঁকিয়ে। যতটা দ্রুত হয় ছুটে পালিয়ে গেল দিশেহারা, জানে না কোন্‌দিকে যাচ্ছে। চেঁচিয়ে কাঁদতে ইচ্ছে হচ্ছে,—কিন্তু বড় ভয় হচ্ছে তার। শুধু ছুটছেই, আর হাত দুটো গরম করবার জন্যে তার উপর নিশ্বাস ফেলছে। বড় দুঃখ হচ্ছে, নিজেকেই এত অদ্ভুত মনে হচ্ছে—এত একলা, এত সবহারা! তখনি হঠাৎ···ওই ওটা কি? একটা জানালার সামনে অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল, কাচের পিছনেই তিনটি পুতুল লাল ও সবুজ গাউন পরা,—যেভাবে তাকিয়ে আছে জ্যান্ত যেন! বেঁটে এক বুড়ো সেখানে ব'সে, বাজাচ্ছে মস্ত-বড় একটা বাঁশী, আর দুজন পাশে দাঁড়িয়ে বাজাচ্ছে ছোট্ট দুটো—দুজনেই তালে তালে মাথা দোলাচ্ছে আর সেইসঙ্গে ঠোঁট নাড়ছে। কথা বলছে ওরা ঠিকই, কিন্তু জানালার মধ্য দিয়ে শোনা যাচ্ছে না। ছেলেটা প্রথমটায় ভেবেছিল ওরা বুঝি সত্যসত্যিই, জ্যান্ত! যখন বুঝল, ওরা পুতুল—হাসতে লাগল। কখনো তো এরকম পুতুল দেখেনি,

এমনটা যে থাকতে পারে ভাবেইনি কখনো। তার ভিতর থেকে ঠেলে ঠেলে উঠছিল কান্না, কিন্তু সে কিনা হাসছে—পুতুলগুলি মজার, এতটা মজার! আর তখনি মনে হ'ল আচমকা কে যেন ঘাড় ধরল পিছন থেকে। বড়সড় এক শয়তান ছোঁড়া দাঁড়িয়ে ছিল পিছনেই ; হঠাৎ সে এক ঘা মারল তার মাথার উপরে, টুপিটা কেড়ে নিয়েই মারল এক লাথি। ছেলেটি হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল পথের উপর। চেঁচিয়ে উঠল সবাই। ভয়ে অচেতন-প্রায় কোনোরকমে উঠে দাঁড়িয়েই ছুটতে লাগল—ছুটতে লাগল পাগলের মতো। নিজের অজ্ঞান্তেই কখন এক ফটক দিয়ে ঢুকে গেল ভেতরের আঙ্গিনায়—কুঁকড়ে বসল গিয়ে একগাদা কাঠের পিছনে। হ্যাঁ, নিরাপদ এখানে! বেশ অন্ধকার, 'ওরা' খুঁজেও পাবে না।

দলা পাকিয়ে বসেছে, ভয়ে সে জোরে নিশ্বাস ফেলতেও পারছে না। হঠাৎ—একেবারেই হঠাৎ মনে হ'ল, বেশ আরাম তো এখানে! হাত-পায়ের কামড়ানোটা বন্ধ হয়ে এল, এমন গরম হয়ে উঠল যেন রয়েছে সে চুল্লীর কাছে। তার পরেই চমকে উঠল। ঘুমিয়েই পড়ছিল আর কি! তা, এখানেই ঘুমুলে তো বেশ হয়। 'এখানেই কিছুক্ষণ ঘুমিয়ে নেব, তারপর আবার যাব ঐ পুতুলগুলি দেখতে!'—বলতে বলতে আপন মনেই হাসছিল আর ভাবছিল—'ওগুলি ঠিক জ্যান্তই যেন!'···তারপরে মনে হ'ল—গান গাইছে তার মা! 'মা, মা! আমি ঘুমোচ্ছি ; এখানে ঘুমোতে কী যে আরাম!'

'এসো খোকন! আমার খ্রীষ্টমাস গাছটির কাছে এসো!'—ফিসফিস করে বলে উঠল একটি কোমল কণ্ঠস্বর, একেবারে কাছে থেকেই!

প্রথমটায় ভাবল, এ বুঝি তার মা, কিন্তু সে নয়। তাহ'লে কে ডাকছে তাকে? কে? দেখতে পাচ্ছে না তো, কিন্তু তার গায়ের উপর ঝুঁকে রয়েছে কেউ—অন্ধকারে তাকে জড়িয়ে ধরেছে। ও দুটি হাত বাড়িয়ে দিল···আর তখনি, আঃ সে কী ঝলমল আলোর বন্যা!···আর সে কী সুন্দর এক গাছ! না, না, তা কী করে হবে? এমন গাছ তো সে দেখেনি কোথাও···এখন সে তবে কোথায়! যেদিকেই তাকায় আলো আলো আর আলো, আর চারদিকেই কত কত শত ছোট-ছোট পুতুল আর পুতুল। সকলেই তো ছোট-ছোট ছেলে আর মেয়ে—কী সুন্দর, কী ঝলমল! নাচছে, উড়ছে! তাকে ঘিরে ধরেছে চারদিক থেকেই, চুমো খাচ্ছে! তারপর একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকতে থাকতে সে দেখে কি—তার দিকে তাকিয়ে আছে তার মা, খুশিতে হাসছে!

'মা, মামণি! আঃ, এখানে সব কী চমৎকার!'—সোল্লাসে বলে ওঠে ছেলেটি, সব শিশুদেরই চুমো খায় একে একে। দোকানের জানালাটার পিছনেই যেসব পুতুল দেখে এসেছে তার কথা বলবার জন্যে অধীর হয়ে ওঠে, জিজ্ঞেস করে —'এই ছেলেরা, কে তোমরা? এই যে মেয়েরা, কে তোমরা?' ও হাসতে থাকে, সকলকেই ও ভালোবাসে।

সবাই বলে—'এই তো খ্রীষ্টমাসের গাছ—বড়দিনের যীশু-উৎসবের গাছ! এই দিনেই তো যীশুখ্রীষ্ট, নিজে এসে ঐ গাছ দিয়ে যান—যাদেরি নিজেদের নেই…'

এবার সে বুঝতে পারল ঐ ছেলেমেয়েরা তারি মতন সবাই। ওদের কেউ কেউ হিমে রক্ত-জমাট—মরে গেছে সিঁড়িদোরের পাশে ঝুরির মধ্যে ঠাঁই পেয়ে; কেউ কেউ মরে গেছে অনাথ-আশ্রমের হাঁসপাতাল থেকে নোঙ্‌রা বস্তিতে ফিরে এসে, কেউ-কেউ না খেয়ে খেয়ে মায়ের শুকনো বুকের উপর, কেউ-কেউ বা রেলগাড়ীর পরিত্যক্ত কামরার দুর্গন্ধের মধ্যে। আর এখন, সবাই তারা এখানে দেবশিশু—যীশুর অতিথি, আর যীশু স্বয়ং এদের মধ্যে এসে দাঁড়িয়েছেন দুহাত বাড়িয়ে, আশীর্বাদ করছেন তাদের সকলকেই, আর তাদের গরীব ও পাপী মায়েদের। তার মায়েরা দাঁড়িয়ে আছে একটু দূরে, কাঁদছে। মায়েরা প্রত্যেকেই তো চেনে তার নিজের নিজের ছেলে বা মেয়েকে। ছেলে-মেয়েরা ছুটে যাচ্ছে—যেন উড়ে যাচ্ছে মায়ের কাছে, চুমো খাচ্ছে মাকে। কচি-কচি হাত দিয়ে তারা মুছিয়ে দিচ্ছে মায়েদের চোখের জল—বারণ করছে আর কান্নাকাটি করতে। কারণ, এখন তো তারা—মায়েদের এই ছেলেমেয়েরা—সুখেই আছে…

সেদিন সেই খ্রীষ্টমাসের ভোরবেলা পুলিশ এসে দেখে: বড় একগাদা কাঠের ভিতরে লুকিয়ে আছে একটি ছেলে—মরে গেছে দারুণ হিমে জ'মে। আর তার মা-ও মরে পড়ে আছে……আগেই তাদের দেখা হয়েছে ভগবানের কাছে—স্বর্গে।

তা, দুনিয়ায় এতকিছু থাকতে আমি কেন এমন এক গল্প তৈরী করলাম আমার রোজনামচার বাস্তব খাতায়—যেখানে কিনা থাকা চাই কেবলমাত্র সত্যিকার ঘটনাই? …কিন্তু, তোমরা দেখছ তো, আমি এটা না ভেবে পারছিই না—সত্যিসত্যিই ঘটেছিল এসব: সেই অন্ধকার আস্তানায় একগাদা কাঠের মধ্যে। আর, বড়দিনের 'খ্রীষ্টমাস-গাছ' বিষয়ে আমি বলতে পারব না সত্যিই তা ছিল কিনা…

# ❋ মিখাইল সাল্‌তিকভ-শেচ্‌দ্রিন ❋

**১৮২৬—১৮৮৯ খ্রী.**

রুশ সাহিত্যের এক প্রধান বিশিষ্টতা হ'ল তার সমাজ-চেতনা ও রাজনীতিক বোধ। সমসাময়িক সামাজিক-রাজনীতিক দায়িত্ব থেকে

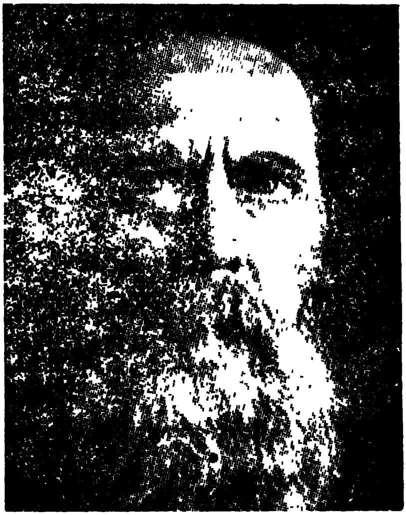

একেবারেই সরে গিয়ে স্বপ্ন-ফেনিলতা নয়, কেবল 'সৌন্দর্যের জন্যেই সৌন্দর্য' সৃষ্টি নয়। আর, এইদিক থেকে লেখকের দায়িত্ব পালন করার জন্যেই জার-সম্রাটদের কুনজরে পড়ে নির্বাসন-দণ্ড ভোগ করতে হয় অনেক বিখ্যাত লেখককেই: উদাহরণ ক্রিলভ, পুশ্‌কিন, তুর্গেনেভ, দস্তয়েভ্‌স্কি, শেচ্‌দ্রিন। তবে এঁদের মধ্যে সরকারী কর্মচারী হয়েও সরকার-বিরোধী কাজকর্মে বা লেখায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছেন ক্রিলভ এবং আরো বিশেষত শেচ্‌দ্রিন। লেখকের মূলনাম মিখাইল সাল্‌তিকভ, ব্যবহার করেছেন 'এন. শেচ্‌দ্রিন' ছদ্মনাম।

লেখকের সমস্ত রচনাই তাঁর সমসাময়িক কালের পরিপ্রেক্ষিতে তীক্ষ্ণধার ব্যঙ্গ-সমালোচনায় লেখা,—তবে তা যথার্থ শিল্পীর হাতে হয়ে উঠেছে মিশ্রির ছুরি—কড়া অথচ কিছু মিঠেও বটে। এহেন সার্থক বিদ্রূপ-শিল্পী কমই মেলে, তুলনীয় জোনাথন সুইফ্‌ট—গালিভার-কাহিনীর বিশ্ববিখ্যাত ইংরেজ লেখক। তবে একটা কথা লক্ষ্য করবার, ক্রিলভের মতোই শেচ্‌দ্রিনও রাশিয়ার বাইরে খুব একটা পরিচিত নন।

জার-সরকারের কাজ করার সময়েই প্রকাশিত হয় শেচড্রিন-এর প্রথম 'গল্পগ্রন্থ'--জার-সম্রাট প্রথম নিকোলাস-এর শাসনকালে। সরকার ও সমাজকে তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ-সমালোচনা করার জন্যে লেখককে বরণ করতে হয় কঠিন নির্বাসন সাইবেরিয়ায়। এখানকার কথায়ই লেখেন তিনি 'মফঃস্বলের রেখাচিত্র', ১৮৫৬—১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দকালে। বিশেষভাবে দ্রষ্টব্য, এই জীবন-শিল্পীর মনোবল তখনো মোটেই ভেঙ্গে পড়েনি, তাই সরকারী চাকুরী থেকে বরখাস্ত না হয়েও, তিনি সরকার-সমালোচনায় দ্বিধাগ্রস্ত হননি বিবেকী দায়িত্বে। তবে, এই সময়েই তিনি গ্রহণ করেন ছদ্মনাম এন. শেচড্রিন ( নিকোলাই শেচড্রিন) —যাতে এম, সাল্‌তিকভ অর্থাৎ মিখাইল সাল্‌তিকভ রূপে চেনা না যায়।

নির্বাসন থেকে মুক্তিলাভের পরে এঁর কাজ দ্বৈত-ভূমিকায়ঃ পত্রিকা-সম্পাদক ও উপন্যাসিক। স্ভ্রেমেন্নিক পত্রিকার সম্পাদকরূপে তাঁকে ঘিরে একত্রিত হয় উদারপন্থী ও প্রগতিপন্থী লেখকদল। সুদীর্ঘ বাহশ বৎসর পরে ১৮৮৪-তে বন্ধ হয়ে যায় পত্রিকা, কিন্তু তাঁর লেখা ব্যঙ্গ-উপন্যাস লেখাটা থামেনি তখনো। শেচড্রিনের মৃত্যু হয় ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে ৬৩ বছর বয়সে।

শেচড্রিনের কয়েকটি ব্যঙ্গ-উপন্যাস হ'লঃ 'গোলোভিয়েভ' ১৮৮২ খ্রী.—এখানে কয়েকটি সুদীর্ঘ কাহিনীতে বর্ণিত হয়েছে অভিজাত সমাজের ও পরিবারের পতনের পরিচয়; 'পুস্‌খনিক-এর পুরাবৃত্ত' ১৮৮৭ খ্রী.—এটি মোটামুটি আত্মকথামূলক উপন্যাস; 'একটি শহরের দুর্দশ' ১৮৭০ খ্রী.—এখানে আছে তখনকার রুশ জাতীয় চরিত্রের নিষ্ক্রিয়তা ও কর্মবিমুখতার রেখাচিত্র। এছাড়া আছে আমলা কর্মচারীদের ব্যঙ্গচিত্র 'মফঃস্বলের ভদ্রলোক', 'মধ্যপন্থা ও শৃঙ্খলার রাজত্ব' ১৮৭৪—খ্রী., 'খুড়ীমার লেখা চিঠি' ১৮৮১—৮২ খ্রী.।

শেচড্রিন বড় স্পষ্ট লেখক, নিরাবরণ এঁর বক্তব্য—এঁর সুতীক্ষ্ণ বিদ্রূপ সোজা বাণবিদ্ধ করে—যাদের করাটা দরকার। এমন সক্রিয় ও স্পষ্ট বাস্তববোধ খুব কম লেখকের রচনায়ই দেখা যায়। তাই গোর্কি এই লেখক সম্পর্কে বলেছেন—'সাল্‌তিকভ-শেচড্রিনকে বাদ দিয়ে উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধের রাশিয়াকে বোঝা যায় না।'

## ॥ বিবেকবান খরগোশ ॥

এক নেকড়ের বিরুদ্ধে একটি খরগোশ কিছু-একটা অপরাধ করে ফেলেছিল। তার পর কিনা খরগোশটা যখন নেকড়েটার আস্তানায় কাছ দিয়ে দৌড়ে যাচ্ছিল, ঠিক দেখে ফেলেই ডাক দিল নেকড়েটা—'এই যে খরগোশ ভাই! একটুখানি দাঁড়াও!' কিন্তু খরগোশটা কেবল যে তাকে অমান্য করল তাই নয়, মরি-বাঁচি দৌড় লাগাল আরো জোরসে। তবে কিনা, নেকড়েটা এক-দুই-তিন লাফেই ধরে ফেলল। 'এবার?'—বলে উঠল নেকড়েটা—'আমি বলেছি, তবুও কিনা থেমে যাওনি! হ্যাঁ, এজন্যে তোমার চরম শাস্তিটা হ'ল: তোকে ছিঁড়ে ফেলব টুকরো টুকরো ক'রে। তা, আমার স্ত্রী ও আমি ক্ষুধার্ত নই মোটেই, পাঁচদিনের খাবারই মজুত আছে বেশ। হ্যাঁ, এখন তুমি এই ঝোপটার নিচে বসে থাকো, তার পর পাঁচদিনের মাথায় আসবে তোমার ডাক। হয়ত বা, হাঃ হাঃ হাঃ, আমি তোমাকে ক্ষমা করতেও পারি।'

কাজেই খরগোশ বেচারা বসে রইল ঝোপটার নিচে···এখন তার একটিমাত্র ভাবনা: মৃত্যুর জন্যে আর কতক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে। নেকড়ের আস্তানার দিকে একবার সে চোরা-চাউনি ফেলতে চাইল, কিন্তু ওই ধূসর-রঙ্ নেকড়েটা তার দিকে যেভাবে তাকাচ্ছে কটমট! কখনো তার মনে জাগত আর এক দুঃসহ ব্যাপার: ঐ নকড়ে ও তার সঙ্গিনীটি গুহা থেকে বেরিয়ে এসে ঘোরাফেরা করছে তার সামনেই—ধূর্ত চোখে নজর করে দেখছে তাকেই। আর নেকড়েটা নেকড়ে-ভাষায় কী যেন ফিসফিস বলতে থাকত তার সঙ্গিনীর কাছে, আর দুজনে মিলে হেসে উঠত—হাঃ হা উ! হাঃ হা উ! তাদের বাচ্চাকাচ্চারাও এসে যোগ দিত, খরগোশটার দিকে মজা করে ছুটোছুটি লাগাত।

বেচারা খরগোশের প্রাণটা কোনোরকমে ধড়ে রইল এই পর্যন্ত।

জীবনের উপর এখনকার মতো এমন মমতা কখনোই তো আর দেখা দেয়নি। খরগোশটি ছিল খুবি চালাকচতুর এক তরুণ ছোঁড়া, ইতিমধ্যেই পছন্দ করে নিয়েছে এক কনে,—এক ধনী বিধবার কন্যা। এখন সে তাদের কাছে—তার ভাবী বধূটির কাছেই যখন ছুটে যাচ্ছিল—হঠাৎ পাকড়াও করল

নেকড়েটা। বেচারা খরগোশী, আহা বেচারী; নিশ্চয়ই এখন তার প্রতীক্ষা করতে থাকবে, ভাবতে থাকবে: আমার বঁধু আমাকে নিয়ে মিছিমিছি খেলা করছে—প্রতারণা করছে। অথবা, সে আমার জন্যে প্রতীক্ষা করে করে আর একজনকেই হয়ত খুঁজে নেবে। অথবা ঝোপেঝাড়ে যখন সে খেলা করতে থাকবে, হঠাৎ হালুম!—ঠেসে ধরবে এক নেকড়ে এসে!

এমনটাই ভাবছিল খরগোশটা, ভাবতে ভাবতে গলা আটকে আসছিল চোখের জলে। হায়রে অভাগা! নির্মূল হতে চলল যত তার খরগোশ-স্বপ্নসাধ! সে কথা দিয়ে রেখেছে বিয়ে করবে এই কয়েকদিনের মধ্যেই; ইতিমধ্যেই ভেবে রেখেছে সে ও তার তরুণী-স্ত্রী শ্রীমতী খরগোশী চা খেতে বসেছে দুজনে পাশাপাশি। আর এখন? তার জায়গায় কিনা—সে এখানে! হায়রে, মৃত্যুর আর কতটা বাকী?

এক রাতে সে ঝিমুচ্ছিল ওখানে ব'সেই। স্পষ্টই দেখছিল: নেকড়েটা তাকে নিয়োগ করছে তার বিশেষ প্রতিনিধিরূপে। আর সে যখন রয়েছে বাইরে, নেকড়েটা কিনা দেখাসাক্ষাৎ করতে এসেছে শ্রীমতী খরগোশীর সঙ্গে! হঠাৎ ধড়ফড় করে জেগে উঠল খরগোশটা—কেউ যেন ঠিক তার পাজরেই খোঁচা মেরেছে জোরে। চারদিকটা তাকাতে তাকাতে দেখতে পেল তার শ্যালককে। সে বলল—'উঠুন, উঠুন! আপনার কনে যে মরতে বসেছে। আপনার এই দশা শোনামাত্রই সে অসুস্থ হয়ে পড়ে, এখন তার আশঙ্কা তার বঁধুকে শেষ-বিদায় জানাতে পারার আগেই বুঝি মরে যাবে।'

এসব কথা শুনতে শুনতে মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা-প্রাপ্ত খরগোশের হৃৎপিণ্ডটা যেন ছিঁড়ে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো হয়ে গেল! তার ভাগ্যে যে এমনটা হ'ল, এমন কী করেছে সে? সারাটা জীবন কখনো কোনো চক্রান্ত ফাঁদেনি, কিংবা বিপ্লব কি বিদ্রোহ করেনি, কিংবা প্রতিষ্ঠিত শাসন-ক্ষমতার বিরুদ্ধে অস্ত্রও ধারণ করেনি! সে তো কেবল মাত্র তার একান্ত ব্যক্তিগত কাজেই ব্যস্ত থেকেছে, এবং সেজন্যেই কিনা মৃত্যুর পরোয়ানা! মৃত্যু! একবার ভাবো কথাটা কী সাংঘাতিক! আর মৃত্যু তো তার একার নয়, আর একজনেরও—তার অভাগিনী আদরিণীরও! আর সেই অভাগিনীর একমাত্র অপরাধ—সে কিনা তাকে ভালোবাসে মনে-প্রাণে! ওঃ, যদি সে—একটিবার যদি ছুটে যেতে পারত তার প্রিয়তমার কাছে, তবে গিয়ে তার কান দুটি আদর করে ধরে রাখত থাবার মধ্যে—আদর করে চাপড়াত, আর শতসহস্রবার চুমু খেত তার ছোট্ট মাথাটিতে।

আগন্তুক সংবাদ-বাহক শ্যালকটি বলছিল—'এক ছুটে পালিয়ে যাওয়া যাক!'

একথা শুনেই তো শিকার-রূপী খরগোশবেচারা যেন কী রকমটা হয়ে গেল।

এবার একটি লাফ—ব্যস্, পগাড় পার। এসময়টায় নিশ্চয়ই নেকড়ের গুহটার দিকে একবারও তাকানো উচিত হবে না, কিন্তু তাই সে করে বসল। আর তাই করতে গিয়ে উবে গেল সব সাহস! বুকে তার ধড়কড়ানি সুরু হ'ল।

সে বিড়বিড় করতে লাগল—'না, আমি পারব না,—নেকড়ের আদেশ!' আর নেকড়েটা ইতিমধ্যে সব দেখেছে, সব শুনেছে। ফিসফিস করে আলগোছে কী যেন সে বলল তার সঙ্গিনীকে। নিশ্চয়ই খরগোসের সদ্ব্যবহারটার তারিফ করছিল।

সংবাদ-বাহকটি তখনো লেগে আছে—'চলো, ছুটে চলো।'

'কিন্তু তা তো আমি পারব না!'—বলিরূপী খরগোশটি জানায়।

আচমকা তখন গর্জে উঠল নেকড়েটা—'ওহে ষড়যন্ত্রকারী, ফিসফিস কী ষড়যন্ত্রটা হচ্ছিল তোমাদের?'

খরগোশ দুটো তো ভয়ে থ। কিন্তু সংবাদ-বাহকটিও কিনা এর মধ্যে? নির্দিষ্ট জায়গাটা ছেড়ে চলে যেতে উৎসাহ জোগানো হচ্ছে! এর শাস্তিটা কী? আইনকানুন কী বলে! একবার চিন্তা করে দেখো। তা, এখন কিনা ছোট্ট ধূসর-রঙ্ এই খরগোসটি হারাতে বসেছে তার প্রেয়সীকে, এবং সেইসঙ্গে তার শ্যালককেও। ওদের দুজনকেই এবার ভাগাভাগি করে খেয়ে ফেলবে নেকড়ে ও তার পরিবারের সবাই!

ছোট্ট ঐ খরগোশ জোড়া তাদের বুদ্ধিশুদ্ধি ফিরে পেয়েছে কি, দেখে সামনেই দাঁড়িয়ে আছে নেকড়ে আর তার সঙ্গিনীটা—খিঁচিয়ে রেখেছে দাঁতগুলো, টর্চের মতো জ্বলছে চোখগুলো।

'না, না! মহামান্য স্যর, আমরা কোনো অন্যায়-কিছু করছিলাম না তো, কেবল কথাবার্তাই বলছিলাম। এই যে, এ হ'ল আমারি প্রতিবেশী, এ আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে। হ্যাঁ, এই তো ব্যাপার!'—বিড়বিড় করে বলছিল দণ্ডাজ্ঞা-প্রাপ্ত খরগোশটি—ভয়ে আধমরা।

'কোনো অন্যায়-কিছু করছিলে না! তোমরা যা ভেবেছ তা নয়, আমি বেশ চিনি তোমাদের! তোমাদের আর কণামাত্রও বিশ্বাস করা চলে না। এখন, হ্যাঁ এখন আর কি! দুজনেরই এবার হয়ে গেল!'

'দেখুন মহামান্য স্যর, ব্যাপারটা এই রকমের।'—বলে উঠল দ্বিতীয়

খরগোশটি—'আমার বোন হ'ল ওর পেয়ারের লোক, আর সে কিনা মরতে বসেছে। ওর কাছে শেষ-বিদায় জানাতে চায়,—অনুগ্রহ করে স্যর, ওকে একটিবার ছেড়ে দিন।'

'হুম্! এক কনে তার ভাবী বরের প্রেমে পড়েছে! তা, শুনতেও বেশ লাগছে।'—মন্তব্য করছিল নেকড়েনী—'তার অর্থ, তাদের এবার বহু কাচ্চাবাচ্চা হবে—অর্থাৎ কিনা এই আমাদের নেকড়েদেরই বহুৎ বেড়ে খাবার! আমরা—এই আমি ও আমার স্বামী—আমরাও দুজনে দুজনকে বড়ই ভালোবাসি—আর আমাদেরও রয়েছে বহুৎ কাচ্চাবাচ্চা নেকড়ে। ওদের চার-চারটা থাকছে আমাদেরি সঙ্গে, আর ক'টা যে বাড়ী থেকে উধাও তার আর গোণাগুণতি নেই। এই, এই নেকড়ে, শুনছ! আমরা কি ওকে একবারটি ছেড়ে দেব—ওর কনের কাছে বিদায় জানাতে?'

'কিন্তু ওকে তো খাবার কথা কালকেই!'

'ও, ওঃ, মহামান্য স্যর, আমি যাব আর আসব। সত্যি বলছি, কথা দিচ্ছি।'—এমনকি নিশ্বাস না ফেলেই বলে গেল একটানা; এবং নেকড়ে যাতে তার উপর বিশ্বাস রাখে সেজন্যে সে এমন সাহস ভরে চেয়ে রইল যে নেকড়েটাও তাকে প্রশংসা না করে পারল না; ভাবতে লাগল—তার ছিলেপিলেরা যদি এমন চমৎকার—যদি এমন সাহসী হ'ত তো ভালো যোদ্ধা হতে পারত!

তখন নেকড়েনীও বেশ বিষণ্ণ হয়ে পড়ল। কী ভাবছিল সে? হঠাৎ সে উচ্চরবে বলে উঠল—'একবার ভাবো তো, এক হাবাগোবা খরগোশ, সেও কত ভালোবাসে তার সঙ্গিনীকে!'

আর, এর পরে নেকড়েটা খরগোশ-ভাইকে শর্ত-মাফিক ছেড়ে না দিয়ে পারে? অবশ্যি এক শর্ত, জামিন-স্বরূপ আটক রাখা হবে তার শ্যালককে।

নেকড়েটা বলে দিল—'কালকের পরের দিন সকাল ঠিক ছ'টার মধ্যে যদি ফিরে না আসো তো, খেয়ে ফেলব ওকেই। তা, যদি তুমি ফিরে আসো, খাব তোমাদের দুজনকেই—তবে কিনা, হাঃ হাঃ, তোমাকে ক্ষমা করতেও পারি বা...'

তীরের মতো ছুটে গেল আমাদের খরগোশটি। তার পায়ে পায়ে কেঁপে উঠল মাটি। পথে পড়েছে বাধার পাহাড়। সোজা একটি লাফে ওপার! নদী পড়েছে কি, অল্পজলের কোনো জায়গার খোঁজ-খবরেও দেরী করল না, সাঁৎরে গেল সোজা। যদি জলার সামনে এসে পড়েছে তো, সোজা চলেছে ছুটে। এক-

এক লাফে পার পাঁচ-পাঁচটা টিলা-পাহাড়। এতে আর আশ্চর্যটা কি? যে বেগে সে ছুটে চলেছে, তার বাড়ী এসে পড়ল কিনা তিন-ভাগের একভাগ দূরত্বে! আর তারপর বাষ্প-স্নানটা করেই সে বিয়েটা সেরে ফেলবে (তা, যেভাবেই হ'ক তাকে বিবাহিত হতেই হবে)—এবং যত তাড়াতাড়ি হয় ফিরে যেতে হবে নেকড়ের প্রাতরাশ হ'তে।

এমনকি পাখীরাও তার চলার গতি দেখে অবাক! বলে উঠল তারা—'ঐ খ্যাখ্! হার মানিয়ে দিল তো? হার বলতে হার!' বলে—'খরগোশদের মধ্যে কলজে নয় তো, রয়েছে এক বাষ্পযন্ত্র! আর ওই খরগোশটা যা ছুটছে, তা চোখ গোল-গোল করে দেখবার মতোই।'

আর তারপর সে পৌঁছল এসে তার বাড়ীতে। আহা সে যে কী আনন্দ! তা বর্ণনা করতে পারবে না কোনো কাহিনী, লিখতে পারবে না কোনো কলম! এবার দেখতে পেল সে তার প্রিয়াকে, আর প্রিয়া খরগোশীও অমনি ভুলে গেল তার অসুখের কথা। সে তার পিছনের পা দুটির উপর দাঁড়িয়ে, তুলে নিল ছোট্ট একটি দামামা—সামনের দুটো থাবা দিয়ে বাজাতে লাগল বিজয়িনীর বাজনা! তার খরগোশ-প্রণয়ীকে চমৎকৃত করার জন্যে সে আগে থাকতেই শিখে রেখেছে এই মজার বাজনাটি। আর তার মা, সেই বিধবা মহিলাটির তো মাথাই খারাপ হবার জোগাড়। তার ভাবী জামাতাকে নিয়ে অস্থির, একেবারে দিশেহারা—কোথায় বসাবে তাকে, কি দিয়ে আপ্যায়ন করবে! আর, দৌড়ে দৌড়ে আসতে লাগল কত না পিঁপড়ে, সঙ্গে নিয়ে এল তাদের যার-যার পরিবারের যত সব আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধব। সকলেই আসছে একটিবার বরকে দেখতে, এবং সেইসঙ্গেই সম্ভবত বিয়ে-বাড়ীর ভোজের আসরের কিছু-না-কিছু খাবার আস্বাদন করতে।

কেবলমাত্র বরের অবস্থাটাই এমন যে তার মনে হচ্ছিল, বসে আছে কাঁটার উপরেই। তার পরাণ-প্রিয়াটিকে দুটো চুমো খেতে না খেতেই সে ব্যস্ত হয়ে উঠল—'ওঃ, একবার স্নানটা সেরে নিয়েই বিয়ের পিঁড়িতে বসতে হচ্ছে, আর তা যত্ত জলদি হয়।'

'এত তাড়া কিসের, শশক-মণি!'—বিধবা শাশুড়ী হাসে জামাইয়ের দিকে তাকিয়ে।

'কালকের মধ্যে আমাকে ফিরতেই হবে। নেকড়ে মশাই আমাকে ছেড়ে দিয়েছে কেবলমাত্র একটি দিনের জন্যেই।'—ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল বড়

করুণ কান্না। বলে গেল সবটা ঘটনা। সে নিজে কী আর ফিরে যেতে চায়? কিন্তু ফিরে তাকে যেতেই হবে। সে কথা দিয়ে এসেছে। আর জানোই তো, খরগোশকে তার কথা রক্ষা করতে হবেই। মাসিপিসিরা এবং তাদের পুত্রকন্যাদি তখন ঘনিয়ে বসল মুখোমুখি সবাই। হ্যাঁ, তাদেরো ঐ একই মত—ঠিকই বলেছ খরগোশ ভাই। কথা দেওয়া অর্থ কথা দেওয়া। আর, শশক-ইতিবৃত্তে কোথাও কেউ কখনোই একটিবারও প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করেনি।

কাহিনী শেষ হয়ে যায় তড়িঘড়ি, কিন্তু খরগোশদের জীবনে ঘটনা ঘটে যায় আরো দ্রুত। সকালের মধ্যেই বিয়ে হয়ে গেল খরগোশ ও খরগোশীর। আর সন্ধ্যার মধ্যেই কিনা তরুণী স্ত্রীর কাছ থেকে বিদায় নিতে গিয়ে বলল খরগোশ:

'নেকড়েটা আমাকে খেয়ে ফেলবে ঠিকই। তাই বলছি, আমাকে ভুলে যেও না। আর যদি তোমার বাচ্চাকাচ্চা হয় তো ওদেরকে গোল্লায় যেতে দিও না। সবচেয়ে ভালো হয় ওদেরকে তুমি যদি কোনো সার্কাসে পাঠাও। সেখানে ওরা কেবল দামামা বাজনাটাই শিখতে পাবে না, মটরদানাও ছুঁড়তে শিখবে খেল্‌না-বন্দুক থেকে।'

আর তারপরেই আঁৎকে উঠল, যেন স্বপ্নই দেখছিল (নেকড়ের কথা নিশ্চয়ই মনে জেগে থাকবে)—এই কথাটুকুও যোগ করে দিল—'তা, নেকড়েটা হয়ত আমাকে মাফ করবে—হা হা!'

এরপর কেউ আর তাকে এখানে দেখতে পায়নি। তা, শ্রীমান খরগোশ যখন তার বিবাহ-উৎসব উদযাপন করছিল, আর আমোদ-আহ্লাদে মশগুল জীবন-রসে, তখনি কিনা খরগোশ-ভূমি আর নেকড়ে-গুহাটার মাঝখানের দেশে ঘটে গেল কত না দৈব-দুর্বিপাক। কোনো জায়গা ভেসে গেল প্রবল বর্ষণে, আর যে সেই নদীটা—খরগোশ যেটা কিনা সাঁৎরে এসেছে কত সহজে, দুকূল ছাপিয়ে ছড়িয়ে পড়েছে বহু বহু দূর! অন্য এক জায়গায় আদ্রণ-রাজ যুদ্ধ ঘোষণা করেছে নিকৃতা-রাজের বিরুদ্ধে। যে প্রান্তরটা খরগোশটাকে পার হতে হবে সেখানেই যুদ্ধ চলছে ভয়ানক। তৃতীয় আর একটা জায়গায় ছড়িয়ে পড়েছে কলেরা! কাজেই তাকে ঘুরে যেতে হবে কয়েক শ' মাইল—সংক্রমণ-এলাকার নিশানা এড়িয়ে। আর এ ছাড়াও, পথে পথে প্রতিপদেই ঝোপেঝাড়ে অপেক্ষা করছে কত না নেকড়ে, শেয়াল আর পেঁচা।

কিন্তু আমাদের এই খরগোশটি ছিল যাকে বলে বুদ্ধিমান—সবকিছুই এমন

হিসেব করে নিয়েছে যে তার হাতে রয়েছে বাড়তি তিন-তিনটা ঘণ্টা। কিন্তু একের পর আরেক বিপদ পার হতে হতে জমাট বেঁধে আসতে লাগল তার ধমনীর যত রক্ত। ছুটতে লাগল সে সারাটা দিন সারাটা রাত—রাতদিন। থাবাগুলি ছিঁড়ে-খুঁড়ে গেছে ধারালো পাথরে, গায়ের পশম খাবল খাবল ছিঁড়ে গেছে পথে পথে আঁকড়ে-ধরা সুঁচোলো-মাথা ডালের পর ডালের আঘাতে। ঝাপসা হয়ে এসেছে তার চোখ দুটি, মুখে গাজিয়ে উঠেছে রক্তাক্ত ফেনা। কিন্তু তবুও তো ছুটতে হবে আরো কত পথ। আর, ছুটতে ছুটতে তার আত্মীয়—তার বন্ধু—যাকে সে জামিন রেখে এসেছে তার ভাবনাটা ভুলতে পারছে না কিছুতেই : দাঁড়িয়ে রয়েছে সে নেকড়ের গুহাটার দোরে—শুধু প্রহর গুণছে কখন এসে তাকে উদ্ধার করবে তার আদরের জামাইবাবু। খরগোশ তাই ছুটছে জোরে—আরো জোরে। পাহাড় পর্বত, মাঠ প্রান্তর, বন বনান্ত, জলা জঙ্গল—কিছুই তার কাছে কিছু নয়। কিন্তু একি, তার হৃৎপিণ্ডটা বুঝি ফেটে যাবে! তা, হৃৎপিণ্ডটাকেও সে হাতের মধ্যে পুরে রাখল, নিষ্ফল দুশ্চিন্তা যেন তার উদ্দেশ্য সাধনে বাধা না হয়। এটা কান্নাকাটির কি যন্ত্রণাবোধের সময় নয়। এখন স্তব্ধ করে দিতে হবে সমস্ত অনুভূতির দাবী। একটিমাত্রই বিষয় তার সামনে এখন : তার বন্ধু এখন বিপদের মুখে, নেকড়ের গ্রাস থেকে তাকে বাঁচাতেই হবে।

রাতের দোর ভেঙে এবার দেখা দিচ্ছে ভোরের আলো। বিশ্রাম করবার জন্যে সরে পড়েছে পেঁচা ও বাদুড়েরা। বাতাসে শিহরণ। সবকিছু শান্ত নীরব, যেন কোথায় চলে গেছে জীবনের যত চঞ্চলতা। কিন্তু আমাদের খরগোশ? সে ছুটছে তো ছুটছেই। সবার উপরে একচিন্তা শুধু—'আমার বন্ধুর প্রাণ বাঁচাতে সময়মতো পৌঁছতে পারব তো?'

লাল হয়ে উঠেছে পূবদিকটা। প্রভাতের প্রথম অরুণাভা রঙিয়ে দিচ্ছে দূর দিগন্তের মেঘেদের। আলোর আভা ক্রমেই উজ্জ্বল হতে হতে ফেটে পড়ল—সত্যিকার যেন এক অগ্নি-উৎসব! সত্যিই যেন আগুন ধরিয়ে দিল আকাশে আকাশে। আগুন ধরে গেল ঘাসেদের উপরকার শিশিরে। জেগে উঠল পাখীরা, কীট-পতঙ্গদের সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে এল পিপীলিকারা। কুয়াশার মতো আবছা পর্দা ছড়িয়ে পড়তে লাগল কোথা থেকে। আর ওট ও সর্ষের ক্ষেতের পর ক্ষেত থেকে জেগে উঠল ক্রমোচ্চ মর্মর-ধ্বনি! আমাদের খরগোশটি কিন্তু সবকিছুর

কাছেই এখন কালা ও কানা—অন্ধ-বধির। একটিমাত্র কথাই কেবল ভাবছে—'হয়ে গেল, আমার বন্ধু শেষ হয়ে গেল।'

কিন্তু ঐ তো এবার দেখা যাচ্ছে পাহাড় ও জলা, তার পরেই তো নেকড়ের গুহা। দেরী করে ফেলেছ, খরগোশ ভাই, বড় দেরী! খরগোশ-ভাই তার শেষশক্তিটুকু একত্র করল—পাহাড়ের মাথায় উঠবার জন্যে। হাঁ, এবারে সেই পাহাড়ের মাথায়। কিন্তু সে যে শেষ হয়ে গেছে,···পড়ে গেল শ্রান্ত ক্লান্ত .. একেবারে অবসন্ন···তবু, নিশ্চয়ই ঠিক সময়েই এসে গেছে।

সামনেই দেখা যাচ্ছে গুহাটা। দূরে শোনা যাচ্ছে একে একে ছয়টার ঘণ্টা। প্রত্যেকটি শব্দের প্রতিধ্বনিই তার বুকে হৃৎপিণ্ডের উপর এক-একটি ঘা হানছে—হাতুড়ি ঠুকছে প্রতিটি শব্দের প্রতিধ্বনি। শেষ আঘাতটি শুনতে শুনতেই গুহা থেকে বেরিয়ে এল নেকড়েটা—আড়মোড়া দিয়ে লেজটা নাড়াতে লাগল সুস্বাদু সম্ভাবনায়! এবারে জামিনটির কাছে এগিয়ে এসেই আঁকড়ে ধরল থাবার মধ্যে—শিকারটির দেহের মধ্যে নখগুলি সোজা ঢুকিয়ে দিয়ে দুভাগ করে ফেলল: একভাগ তার, একভাগ তার সঙ্গিনীর। নেকড়ের বাচ্চাকাচ্চারাও ছিল সেখানে—গন্ধ শুঁকছিল বাপ-মার চারদিকটা ঘুরে ঘুরে, আর দাঁত বার করছিল অর্থাৎ পাঠ গ্রহণ করছিল।

'এই যে, এসে গেছি আমি!'—চিৎকার করে উঠল খরগোশটা শত সহস্র খরগোশের শক্তিতে, হুমড়ি খেতে খেতে গড়িয়ে গড়িয়ে নেমে পড়ল জলার মধ্যে!

ধূসর-রঙ্ সেই নেকড়ে অমনি বলে উঠল—'তাহ'লে দেখা যাচ্ছে খরগোশদের যথার্থই বিশ্বাস করা যায়। তা, এখন আমার সিদ্ধান্তটি হ'ল—'যে পর্যন্ত তোমাদের ডাক না আসে, তোমরা দুই বন্ধুই এখন বসে থাকো এই ঝোপটার তলায়। তা, পরে এমনটাও তো হতে পারে—হাঃ-আ-উ! হাঃ-আ-উ!! তোমাদের হয়ত মাফ করতেও পারি-বা।'

## * লেভ্ তলস্তয় *

১৮২৮—১৯১০ খ্রী.

চিন্তাশীল লেখক এবং মহাপুরুষ বা মহাত্মা-রূপেই লেভ্ তলস্তয় সমগ্র সাংস্কৃতিক দুনিয়ায় বিশেষ উচ্চাসনে সম্মানিত। প্রথম জীবন

কাটিয়েছেন বিলাসব্যসনে শহুরে জীবনের উচ্ছৃঙ্খলতার মধ্যে। কিন্তু বুকে মহত্ত্বের বীজ থাকলে তা অঙ্কুরিত ও বিকশিত হবেই। মস্তবড় জমিদার ঘরের ছেলে—হঠাৎ অভিজাত স্বেচ্ছাবাহিনীতে যোগ দিয়ে চলে গেলেন সিবাস্তোপোলের যুদ্ধে। তখন তিনি তেইশ বছরের তরুণ। এ থেকেই শুরু তাঁর আত্মচেতনার নতুন অধ্যায় এবং এই যুদ্ধের অভিজ্ঞতায়ই লেখা হয় তাঁর প্রথম গ্রন্থ 'সিবাস্তোপোলের কাহিনী'। যুদ্ধ থেকে ফিরে এসে তলস্তয় আমৃত্যু গ্রহণ করেন এক নতুন জীবন। বাণীই তাঁর জীবন—জীবনই তাঁর বাণী।

তুলা প্রদেশের অন্তর্গত ইয়াস্নায়া পলিয়ানার বিখ্যাত প্রাচীন নোব্‌ল বংশে তলস্তয়ের জন্ম—পিতা নিকোলাই তলস্তয় ছিলেন জার-সম্রাট কর্তৃক প্রদত্ত 'কাউন্ট' উপাধিতে বিভূষিত; মা ছিলেন রাজকন্যা। এই বাবা-মার চরিত্রকেই লেখক রূপ দিয়েছেন 'সংগ্রাম ও শান্তি' নামক বিখ্যাত উপন্যাসে। মা মারা যান তলস্তয় তখন শিশু।

ষোল বছর বয়সে তলস্তয় কাজান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন—শুরু করেন প্রাচ্য ভাষা ও আইন অধ্যয়ন, কিন্তু উপাধি-লাভের পরীক্ষা দেবার আগেই পড়াশোনা ছেড়ে দেন। জীবন-সন্ধানী তরুণ তলস্তয়ের অসন্তুষ্ট চিত্ত প্রচলিত শিক্ষাদীক্ষার সঙ্গে খাপ

খাওয়াতে পারেনি। এসময়কার তাঁর অস্থির জীবনের অন্তরকথাই লিখেছেন তখনকার ডায়েরীতে।

সামরিক বিভাগ ছেড়ে দিয়ে তলস্তয় কয়েক বছর ধরেই ভ্রমণ করেন সুইজারল্যাণ্ড, ইতালী ও জার্মাণী, ফিরে এসে ইয়াস্নায়াতে স্থাপন করেন কৃষক ছেলেমেয়েদের জন্যে বিদ্যালয়, প্রকাশ করেন এক পত্রিকা। সেখানে বলেছেন দুনিয়াকে তাক-লাগানো এক কথা—'শিক্ষিতেরা বা বিদ্বানেরা কৃষকদের শেখাবার অধিকারী নন, তাঁদেরকেই শেখাবে বরং কৃষকেরা।' কৃষকদের দাসজীবন থেকে মুক্তিযুদ্ধের কালে তলস্তয় বিদেশ থেকে ফিরে এসে কৃষকদের সামাজিক উন্নয়নমূলক কাজে ব্রতী হন।

তলস্তয়ের স্ত্রী ছিলেন স্বামীর আশা-আদর্শের অংশীদার—যথার্থ সহধর্মিণী। নিজেকে তিনি বিসর্জন দিয়েছিলেন পারিবারিক শান্তি ও উন্নতির উদ্দেশে। কিন্তু তলস্তয়ের সন্ধানী জীবনে শুরু হল বিষম দ্বন্দ্ব—নৈতিক সংঘাত। এ দ্বন্দ্ব-সংঘাত তাঁর পারিবারিক জীবনেও। একালেরই বিখ্যাত উপন্যাস 'আনা কারেনিনা।'

বর্ত্তমান সমাজ ও শাসন-ব্যবস্থার অবসান-কল্পে তলস্তয় রচনা করেন প্রবন্ধাবলী, তা সরকার কর্তৃক নিষিদ্ধ হয়। কিন্তু 'মুক্তি' উপন্যাসে তলস্তয় আবার তুলে ধরলেন বর্ত্তমান শাসন ও সমাজ-ব্যবস্থার সমস্ত অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড-আঘাত,—তবে এ আঘাত অহিংস প্রতিরোধের পথে, এবং লেখনী মাধ্যমে। তলস্তয়ের সঙ্গে বিরোধ চরমে ওঠে তাঁর নিজের পরিবারেও।

তলস্তয়ের নবজীবনাদর্শ নবধর্ম-বোধ ও নবনীতি-চেতনাপুষ্ট। মামুলী ধর্মবোধ থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এই ধর্মবোধ-নীতিবোধ হ'ল: অহিংসা ও প্রেম-করুণা, ভগবানে বিশ্বাস ও আত্মসমর্পণ, এবং সেবাধর্ম ও সহজ জীবন-যাপন। এই নবধর্ম-বোধের অধ্যাত্ম প্রভাব ছড়িয়ে পড়ে দেশে বিদেশে, এমনকি ভারতেও বটে [গান্ধীজী তাঁর সত্যাদর্শে প্রভাবিত]। তলস্তয় ক্রমেই সাহিত্যকে একমাত্র শুভচেতনা বা ধর্মবোধ-নীতিবোধ তথা মানবকল্যাণের ভাবাদর্শেই সার্থক মনে করেন—এই দৃষ্টিতে লেখা তাঁর সাহিত্য-গ্রন্থ হ'ল 'তেইশটি গল্প'। এই বই থেকেই তিনটি গল্প তুলে ধরা হ'ল। এই অস্থিরচিত্ত জীবনসন্ধানী গৃহত্যাগ করেন আশি বছর বয়সে এবং দেহত্যাগ করেন রিয়াজন জিলার এক স্টেশনে। সঙ্গে ছিল তাঁর ছোট মেয়ে ও এক ডাক্তার।

## ॥ যেখানে ভালোবাসা ॥

কোনো এক শহরে মার্টিন নামে এক মুচি বাস করত। সে থাকত এক অন্ধ-কুঠুরীতে—রাস্তার দিকে ছিল একটিমাত্র জানালা, এবং এই জানালা দিয়ে তাকালে দেখা যেত শুধু পথিকদের পাগুলি। মার্টিন কিন্তু পায়ের জুতো দেখেই পথিকদের চিনতে পারত। বহুদিন ধরেই আছে সে এখানে—বহুলোকই তার চেনাজানা। এই অঞ্চলে এমন কোনোই জুতো নেই—যা তার হাত দিয়ে ঘুরে যায়নি দু'একবার। জানালা দিয়ে সে তাই প্রায়ই দেখতে পায় তারি নিজের হাতের কাজ—কোনোটার তলা সে জুড়ে দিয়েছে নতুন ক'রে, কোনোটায় তালি লাগিয়েছে, নয়তো সেলাই-ফোঁড়াই করেছে; এমনকি কোনো কোনোটার উপরের দিকটা পালটে দিয়েছে আগাগোড়াই। বহু কাজই পায় সে; কারণ, কাজ করে সে পাকা হাতে, মাল দেয় ভালো, মজুরীও বেশী নেয় না, আর তাকে বিশ্বাস করা চলে খুবি। একদিনের মধ্যেই কাজ সারতে পারবে মনে করলেই কাজটা সে হাতে নেয়, না পারবে তো আগেভাগেই বলে দেয়—মিথ্যে ভরসা দিয়ে ঠেকিয়ে রাখে না। তাইতো সবার কাছেই তার সুনাম, কাজও পায় প্রচুর।

মার্টিন বরাবরই বড় ভালোমানুষ, আর এখন এই বুড়ো বয়সে সে বিশেষ করে ভাবতে সুরু করেছে আত্মার কথা—ভগবানের আশ্রয়ে ঠাঁই পাবার কথা।

এই মুচির কাজ সুরু করার আগে খাটত সে এক মনিবের অধীনে, আর সে সময়েই তার স্ত্রী মারা যায় তিনবছরের একটি ছেলে রেখে। প্রথম সন্তানদের কেউই আর বেঁচে নেই—মারা গেছে শিশুকালেই। মার্টিন প্রথমটায় ভেবেছিল ছেলেকে পাঠিয়ে দেবে গাঁয়ে তার পিসির কাছে। কিন্তু পরেই একটা কথা ভেবে ছেলেকে কাছ-ছাড়া করতে ব্যথা লাগল। ভেবে দেখল সে—'নতুন লোকের মধ্যে গিয়ে থাকাটা ওর পক্ষে বড়ই কষ্টকর হবে। না, আমার কাছেই থাক্।'

মার্টিন তার মনিবের বাড়ীর কাজ ছেড়ে দিয়ে বাড়ী বাড়ী ঘুরতে লাগল ছেলেকে নিয়ে, কিন্তু কোনোই সুবিধে হ'ল না। তারপর সেই ছেলে বড় হ'ল,

আর হঠাৎ মারা গেল মাত্র সাতদিনের এক বিষম জ্বরে। মার্টিন ছেলেকে কবর দিয়ে এল, কিন্তু শোকে সে এমন ভেঙ্গে পড়ল যে ভগবানের উপরে সমস্ত বিশ্বাসই হারাতে বসল। নিদারুণ আঘাত আর সহ্য করতে না পেরে ভগবানের কাছে কামনা করতে লাগল নিজেরি মৃত্যু। তার মতো বুড়োকে সুস্থ রেখে, তারই আদরের দুলালকে ভগবান নিয়ে গেছেন—তাই সে ভগবানের নিন্দা করতে লাগল। এরপর সে বন্ধ করে দিল গির্জায় যাওয়া।

একদিন মার্টিনের গাঁয়ের এক বৃদ্ধ তীর্থযাত্রী তীর্থে যাবার পথে তার বাড়ীতে এল। মার্টিন প্রাণ খুলে বলে গেল তার যত দুঃখের কথা—'সাধুভাই, এখন আর বেঁচে থাকতে ইচ্ছে হয় না। ঈশ্বরের কাছে আমার একটিমাত্রই প্রার্থনা—এখন যেন মরে গিয়ে বেঁচে যাই। জীবনে কী আর আছে আমার ?'

বৃদ্ধ বললেন—'দেখো মার্টিন, এরকম কথা বলাটা কারো পক্ষেই শোভা পায় না। ভগবানের ইচ্ছা বোঝা ভার। ভগবান যদি ব্যবস্থা করে থাকেন তোমার ছেলে মারা যাবে, আর তুমি বেঁচে থাকবে,—তবে তাই হ'ল মঙ্গলের! তোমার নিজের দুঃখশোকের কথা ? তা, তুমি নিজের সুখের জন্যে বাঁচতে চাও বলেই তো যত দুঃখ।'

'তা, আর কিজন্যেই বা মানুষ বাঁচতে পারে ?'

'কেন মার্টিন, ভগবানের জন্যে!'—বৃদ্ধ বলতে লাগলেন—'তিনি তোমাকে জীবন দান করেছেন, তুমিও তোমার জীবন তাঁর জন্যে দান করো। তাঁর জন্যে বেঁচে থাকতে শিখলে, নিজের জন্যে দুঃখ পাবে না আর! জীবনটা তখন খুবি সহজ মনে হবে।'

মার্টিন নীরবে সব কথা শুনে, বলল—'কিন্তু ভগবানের জন্যে বাঁচা যায় কেমন ক'রে ?'

বৃদ্ধ জবাব দেন—'ভগবানই দেখিয়ে দিয়েছেন তাঁর জন্যে কি করে বাঁচতে হয়। বই পড়তে পারো তো, তাহ'লে ধর্মগ্রন্থ কিনে এনে পড়ো। ভগবান কিভাবে তাঁর জন্যে জীবন যাপন করতে বলেছেন সেখানেই পাবে সব—সবি আছে ওখানে।'

কথা কয়টি মার্টিনের বুকের মধ্যে গেঁথে রইল, এবং সেইদিনই সে বড় হরফের একখানা বাইবেল কিনে এনে গলা ছেড়ে পড়তে শুরু করল। প্রথমে ভেবেছিল—প্রতি রবিবারেই পড়বে শুধু, কিন্তু প্রথম দিন পড়েই তার প্রাণটা এত হাল্‌কা হয়ে উঠল যে রোজই পড়তে লাগল। মাঝে মাঝে সে এই ধর্ম-

গ্রন্থটির মধ্যে এমনভাবে ডুবে যায় যে প্রদীপের তেল ফুরিয়ে আসে, তবু পড়া ছেড়ে উঠতে পারে না। প্রত্যেক রাতেই পড়ে মার্টিন—যতই পড়ে ততই যেন বুঝতে পারে ভগবান কী চান তার কাছে, আর কিভাবেই বা ভগবানের জন্যে জীবন যাপন করতে হবে। দিনে দিনে তার শোকার্ত হৃদয় হাল্‌কা হয়ে ওঠে। আগে সে শুতে যাবার সময় তার ছোটছেলের কথা ভেবে ভেবে বড় মর্মান্তিক দুঃখ সহ্য করত, কিন্তু আজকাল সে বারবার বলে শুধু—'তোমার জয় হোক, ভগবান! তোমারি হোক জয়! তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক!'

—সেই থেকেই মার্টিনের সারাটা জীবন বদলে গেল। আগে প্রায়ই সে রেস্তোরাঁয় গিয়ে চা খেত, এমনকি দুএক গ্লাশ মদ খেতেও আপত্তি হ'ত না। কখনো বা কোনো দোস্তের সঙ্গে মদ খেয়ে পথ চলত, ঠিক মাতাল না হলেও কেমন যেন মাতালের মতোই পথিকদের সে গলা ছেড়ে ডাকত, গালিগালাজও ছাড়ত দু'একটা। কিন্তু সে সব দিন আজ পুরানো কথা। তার জীবন আজ ভরে উঠেছে শান্তিতে, আনন্দে। সন্ধ্যে হ'লে কাজ শেষ করেই সে বাতি জ্বালিয়ে পড়তে থাকে। যত পড়ে ততই সে ভালো করে বুঝতে পারে, উজ্জ্বল হয়ে ওঠে মনের রাজ্য, ভরে ওঠে আনন্দে।

মার্টিন একদিন গভীর রাত পর্যন্ত পড়ে চলছিল নিবিড় মনোযোগে ; ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে এসে সে কয়েকটি শ্লোক দেখতে পেল :

'যে তোমাকে এক গালে চড় মারিয়াছে, তাহাকে তুমি অন্যগাল বাড়াইয়া দাও। যে তোমার টুপিটা কাড়িয়া লইয়াছে, তাহাকে তুমি জামাটাও খুলিয়া দাও। প্রার্থীকে কখনো ফিরাইয়া দিও না। যে তোমার ভালো-কিছু লইয়া গিয়াছে, তাহার নিকট হইতে তাহা আর ফিরিয়া চাহিও না। কোনো লোকের নিকট হইতে যেমন ব্যবহার চাও, তুমি নিজেও তাহার প্রতি তেমন ব্যবহার করো।' ঈশ্বরের এই বাণীও পড়ল সে :

'আমি যা বলি তোমরা তা করো না, শুধু প্রভু প্রভু করো কেন? যে আমার কাছে আসে, আমার নির্দেশ পালন করে—আমি তোমাকে দেখাইব সে কিরকম। শক্ত পাহাড়ের উপর ভিত গাঁথিয়া ঘর তৈরী করিলে বন্যার বেগও তাহাকে গড়াইতে পারে না। কারণ, তাহার ভিত গাঁথা হইয়াছে শক্ত পাহাড়ের বুকে। কিন্তু যে কেবল আমার বাণী শোনে, কিন্তু সেইমতো কাজ করে না, তাহার ঘর গড়া হইয়াছে বালুর উপরে, বন্যার আঘাতে তাহার সমস্তই ধ্বসিয়া পড়িবে।'

—এই বাণী পড়ে মার্টিনের প্রাণ আনন্দে ভরে উঠল, চশমাটা খুলে সে ভাবতে থাকে, বিচার করতে থাকে তার নিজের জীবন নিয়েঃ আমার ঘর বাঁধা হয়েছে কিসের উপরে? পাথরে, না মাটিতে? পাথরে হ'লে তো ভালো কথা। তবু তো সজাগ না থাকলেই পাপ কাজে মন যায়। হে ভগবান, তুমি আমাকে ক্ষমা করো করুণা করো।'—ভাবতে ভাবতে শুতে যাচ্ছিল সে, কিন্তু বই ছেড়ে যেতে ইচ্ছে হয় না। কাজেই সে সপ্তম পরিচ্ছেদও পড়তে থাকেঃ এক ধনী ইহুদী প্রভু যীশুকে একবার তার গৃহে আমন্ত্রণ করেছিল—সেই কাহিনীই পড়তে থাকে মার্টিন। পাপসক্তা এক নারীই সেদিন তার চোখের জলে যীশুর পা ধুইয়ে দিয়েছিল। ভগবান তার সেই সেবা গ্রহণ করলেন।

তার পরের শ্লোকেই লেখাঃ সেই নারীটিকে দেখাইয়া যীশু ধনীলোকটিকে বলিলেন—'এই নারীটিকে দেখিয়া রাখো। আমি তোমার ঘরে আসিলাম, কিন্তু পা ধুইবার জলটুকুও তুমি দিলে না, কিন্তু ওই নারীটি তার অশ্রুজলে আমার পা ধুইয়া দিয়াছে, নিজের চুল দিয়া আমার পা মুছিয়া দিয়াছে। তুমি আমার পা ছুঁইয়া দেখ নাই, কিন্তু এ আমার পায়ে সাদরে কতবার চুম্বন করিয়াছে। তুমি আমার মাথায় জল দাও নাই, কিন্তু ও আমার গায়ে তেল মাখাইয়া দিয়াছে।'"

মার্টিন আবার চশমাটা তার বইয়ের উপর রাখল, ভাবতে লাগলঃ সেই ধনী লোকটি ঠিক আমারি মতো ছিল। সে শুধু নিজের কথাই ভাবত—ভাবত কী করে সে খাওয়া দাওয়া করবে, শীতে গরম কাপড়জামা পরবে, সুখে থাকবে। অতিথির কথা সে মোটেই ভাবেনি। কেবল নিজের ব্যবস্থাটাই করেছে, অতিথির জন্যে কিছুই করেনি। অথচ কে সেই অতিথি? যীশুখ্রীষ্ট স্বয়ং! তিনি যদি আমার কাছে আসেন, তবে? তবে আমিও কি অসদ্ব্যবহার করব?

তারপর মার্টিন বাহুর উপর মাথা রেখে কখন ঘুমিয়ে পড়ল।

'মার্টিন!'

কার কণ্ঠস্বর? ঠিক যেন তার কানের পাশেই! চমকে সে ঘুম থেকে জেগে উঠল। না, কেউই নেই। কিন্তু আবারো ঐ ডাক! মার্টিন এবারে শুনতে পাচ্ছে স্পষ্টঃ

'মার্টিন, মার্টিন! কাল রাস্তার দিকে দৃষ্টি রেখো, আমি আসব!'

মার্টিন ঘুম থেকে জেগে উঠল, চোখ রগড়াতে লাগল, কিন্তু সঠিক কিছুই বুঝে উঠল না—ঐ কথা সে কি ঘুমের মধ্যেই শুনল, না জেগে উঠে? বাতিটা

নিভিয়ে দিয়ে শুয়ে পড়ল। পরদিন ভোরের আলো ফুটবার আগেই ঘুম থেকে উঠে পড়ল মার্টিন—প্রার্থনা করল, তারপর আগুন জেলে আলুকপির ঝোল রাঁধল, তারপর বসে বসে কাজ করতে লাগল। কাজ করতে করতেও ভাবছিল গত রাতেরই কথা। কখনো মনে হ'ল ও স্বপ্ন। কখনো ভাবল—না, ঠিক কারও কণ্ঠস্বরই শুনেছে। এরকম ঘটনা তো আরো কত ঘটেছে। —ভাবে সে।

কাজেই জানালার পাশে বসে কাজ করতে করতে বারবার করে সে তাকাতে লাগল রাস্তার দিকে, অপরিচিত কোনো জুতো দেখলেই নুয়ে পড়ে তার মুখখানা দেখে নেয় একবার। ছেঁড়া জুতো পায়ে চলে গেল এক গাড়োয়ান ; আর গেল ভিস্তিওয়ালা চাকরটা। এবারে জানালার কাছে দাঁড়াল এসে এক সৈনিক—হাতে একটা কোদাল : মার্টিন ওর বুট জুতো দেখেই চিনেছে। নাম তার স্তেপানিচ্। প্রতিবেশী এক ব্যবসায়ী দয়া করে তাকে নিজের বাড়ীতে আশ্রয় দিয়েছে। ওর কাজ হ'ল দারোয়ানকে সাহায্য করা। মার্টিনের জানালাটায় জমে-ওঠা বরফ সে সাফ করছিল। মার্টিন একটিবার তাকে দেখে নিজের কাজে মন দিল, কিন্তু নিজের মনের ভাবনাকে লক্ষ্য করে হাসে : বুড়ো হয়ে নিশ্চয়ই আমার ভীমরতি ধরেছে। স্তেপানিচ্ এসেছে বরফ সাফ করতে, আর আমি ভাবছি কিনা খ্রীষ্টই দেখা দিতে এসেছেন আমাকে ! আচ্ছা এক পাগলা বুড়ো আমি !—তবু হাতের জুতোটায় গোটা বারো ফোঁড় লাগাতেই আবারো জানালা দিয়ে তাকাতে ইচ্ছে হ'ল। স্তেপানিচ্ কোদালিটাকে জানালায় হেলিয়ে রেখে বিশ্রাম করছে, চেষ্টা করছে নিজের হিমজমাট দেহটাকে একটুখানি গরম করতে। বয়সের ভারে ভেঙ্গে পড়েছে স্তেপানিচ্, নিশ্চয়ই বরফ সাফ করবার মতো যথেষ্ট শক্তি নেই তার দেহে। 'আচ্ছা, একে ভিতরে ডেকে এনে একটু গরম গরম চা খাওয়ালে কেমন হয় ?'—মার্টিন ভাবতে থাকে—'ষ্টোভের জল তো ফুটে উঠল ব'লে।' সেলাইয়ের সুঁচটা সে যথাস্থানে রেখে উঠে দাঁড়ায়, ষ্টোভটা টেবিলের উপর রেখে চা বানায়, তারপর জানালা আসে। মার্টিন ভিতরে আসবার জন্যে ইশারা করে স্তেপানিচ্‌কে, দরজাটা খুলে দেয়—'ভিতরে এসো ! গাটা একটুখানি গরম করে নাও। যা ঠাণ্ডা, নিশ্চয়ই জমে যাচ্ছ।'

'ভগবান তোমার কল্যাণ করুন ! হাড়ের মধ্যে যা কনকন করছে !'—গায়ে-

লাগা বরফ ঝাড়তে ঝাড়তে বলে সে, মেজেতে পায়ের জলের দাগ না লাগে তাই সে পা-পোষে বারবার করে পা মুছতে গিয়ে পড়েই যাচ্ছিল আর কি!

মার্টিন বলে—'কষ্ট করে পা মুছবার দরকার নেই, মেজে আমি মুছে নেব —রোজই তো মুছে নেই। তুমি বসো, আরাম করে চা খাও।'

দুটো গ্লাশে চা ভর্তি করে একগ্লাশ সে এগিয়ে দিল স্তেপানিচের দিকে, আর নিজেরটা বাসনে ঢেলে ফুঁ দিতে লাগল। স্তেপানিচ্ তার গ্লাশটা নিঃশেষে পান করে উবুড় করে রাখল, কিন্তু স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছিল আরো কিছুটা পেলে পরিতৃপ্তি হয়। 'এই আর এক গ্লাশ নাও।' —মার্টিন তাদের দুজনের দুটো গ্লাশই আবার ভর্তি করে নেয়। চা খেতে খেতে মার্টিন কিন্তু বারংবার তাকাতে লাগল বাইরে রাস্তার দিকে। 'কেউ আসবে বুঝি?'—অতিথিটি জিজ্ঞেস করে।

'তা দেখুন, বলতে কেমন লজ্জা করছে। নির্দিষ্ট কারোর জন্যেই যে প্রতীক্ষা করেছি তা নয়, তবে কালরাতে কিছু শুনেছি আমি। আর, মন থেকে কিছুতেই সেকথা মুছে ফেলতে পারছি না। সে কি স্বপ্ন, না সত্য—তাও ঠিকঠিক কিছুই বলতে পারছি না। কালরাতে যীশুখ্রীষ্টের কথা পড়ছিলাম: তিনি এক ধনীর বাড়ী নিমন্ত্রিত হয়েও আদর অভ্যর্থনা পার্ননি—সেই কাহিনীটাই পড়ছিলাম। আমার মতো একটা তুচ্ছ মানুষের জীবনে তিনি যদি আসেন তো কত আদরেই না তাঁকে রাখতাম। আর, ধনী লোকটি কিনা তাঁকে কোনোরকম সমাদরই করেনি!...এইসব ভাবতে ভাবতে ঝিমিয়ে পড়েছি, হঠাৎ শুনলাম—কে ডাকছে! জেগে উঠেও আবার শুনলাম—'কাল আমার জন্যে প্রতীক্ষা ক'রো, আমি আসব!' দুই-দুইবার শুনলাম। সত্যি কথা বলতে কি, ঘটনাটা আমার বুকের মধ্যে গেঁথে রইল। আমার কেমন লজ্জা করছে, তবুও আমি প্রভু খ্রীষ্টেরই পথ চেয়ে আছি।' স্তেপানিচ্ মাথা নত করে চা পান করছিল, মার্টিন পাশেই দাঁড়িয়ে আবারো ভরে দিল তার গ্লাশ—'এই যে আর এক গ্লাশ খাও। তা, আমি শুধু ভাবছিলাম খ্রীষ্ট নেমে এসেছিলেন দুনিয়ার মাটিতে, কাউকেই তিনি ঘৃণার চোখে দেখতেন না, সাধারণ লোকের মধ্যেই চলাফেরা করতেন, সরল লোকেরাই হ'ত তাঁর সঙ্গী, ভক্ত বেছে নিতেন মজুরদের মধ্য থেকে। 'যে মাথা উঁচু করে চলবে, মাথা তার নিচু হয়ে যাবে; যে মাথা নিচু করে চলবে, সেই হবে উঁচু। আমাকে তুমি ডেকেছ, প্রভু, আমি তোমার চরণ ধুইয়ে দেবো। যে আগে যেতে চাও, আগে

সবার সেবক হও। কারণ, দরিদ্রেরা বিনয়ীরা ধর্মভীরু ও দয়ালু লোকেরাই হ'ল সুখী।'

স্তেপানিচ্ চা খেতে খেতে আত্মভোলা হয়ে যায়; বুড়ো মানুষ তো, সহজেই চোখে জল আসে। শুনতে শুনতে তার গাল বেয়ে নামতে থাকে অশ্রুধারা।

'আর একটুখা'নি খাবে?'—মার্টিন অনুরোধ করে। স্তেপানিচ্ ধন্যবাদ জানিয়ে উঠে দাঁড়ায়, বলে—'তোমাকে আমি কখনোই ভুলব না। তুমি আমার দেহের ও মনের শান্তি, দেহ ও মনের খাবার দান করেছ।'

'ভারী ভালো লাগল তোমাকে, আবার আসবে। ঘরে অতিথি এলে আনন্দ পাই আমি।'

স্তেপানিচ্ চলে গেলে মার্টিন বাকী চা'টুকু ঢেলে খেয়ে ফেলল। তারপর চায়ের সরঞ্জাম সরিয়ে রেখে একখানা জুতো নিয়ে সেলাই করতে লাগল, আর জানালা দিয়ে তাকাতে লাগল বাইরের দিকে। যে-খ্রীষ্টের জন্যে সে প্রতীক্ষা করছে তাঁরি কথা তাঁরি জীবন-কাহিনী ভাবছিল সে। প্রাণের মধ্যে গুঞ্জন করছে খ্রীষ্টের মধুবাণী। দুজন সৈনিক চলে গেল—একজনের পায়ে সামরিক দপ্তরের জুতো, অন্যজনেরটা কিন্তু মার্টিনের নিজের হাতেই তৈরী। এবার চলে গেল পাশের বাড়ীর মালিকবাবু, কী চকচকে দামী জুতো তার! এবার যাচ্ছে ঝুড়ি-হাতে এক ভিখারী। একে একে চলে গেল সব। এবার যাচ্ছে একটি স্ত্রীলোকটি—গাঁয়ে ছেঁড়াজামা, ছেঁড়া জুতো। জানালার পাশ দিয়ে যেতে যেতে দেয়ালের পাশে থেমে পড়ল সে। মার্টিন জানালা দিয়ে দেখে: একটি মেয়েছেলে—অপরিচিত স্ত্রীলোক। ময়লা ছেঁড়া জামা গায়ে, দুহাতে বুকে জড়িয়ে ধরে আছে একটি শিশুকে। হিম-হাওয়ার ঝাপ্টার দিকে পিঠ রেখে সে তার শিশুকে ঢেকে রাখতে চেষ্টা করছে। তার নিজের গায়ে অবশ্যি ঢেকে রাখবার মতো তেমন কিছুই নেই। গায়ে তো পাতলা একটা জামা—তাও ছেঁড়া! বাচ্চাটি কাঁদছে, আর তার মা তাকে বৃথাই সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করছে। মার্টিন দরজার বাইরে এসে মেয়েলোকটিকে ডাক দিল—'এই যে, এদিকে শোনো!'

মেয়েলোকটি শুনতে পেয়ে ঘুরে দাঁড়াল। 'বাচ্চাকে নিয়ে ঠাণ্ডায় দাঁড়িয়ে কেন? এসো, ভিতরে এসো! এখানে গরম জায়গায় ওকে আরো ভালো করে ঢেকে নিতে পারবে। এই আমার সঙ্গে এসো।'

নাকে চশমা-পরা এক বুড়ো ডাকছে—সে কেমন অবাক হয়ে যায়। তবে,

সঙ্গে সঙ্গেই সে ভিতরে আসে, সিঁড়ি বেয়ে বেয়ে মাটির নিচের ঘরে আসে। বুড়ো মার্টিন মেয়েলোকটিকে তার বিছানায় বসতে বলে, আর বলে—'এইখানে এই চুল্লীটার কাছে বসে গাটা গরম করে নাও, আর বাচ্চাটাকে দুধ খাইয়ে নাও।'

'বুকে তো দুধ নেই মোটেই, আর ভোর থেকেও তো আমি কিছুই খেতে পাইনি!'—তবুও বাচ্চাটাকে সে বুকের দুধ খেতে দেয়। মার্টিন দেখে আর মাথা নাড়ে। সে একটা রেকাবী আর কয়েকখানা রুটি বার করে আনে, কিছুটা আলুকপির ঝোল ঢেলে দেয় রেকাবীটাতে। উনুনের উপরকার মাংসের পাত্রটাও খোলে, কিন্তু এখনও সেটা তৈরী হয়নি দেখে টেবিলের উপর চাদর বিছিয়ে রুটি ও ঝোলই পরিবেশন করে, বলে—'তুমি খাও ব'সে। তোমার বাচ্চাকে দেখছি—আমারো একদিন ছেলে ছিল। এদের কেমন করে শান্ত করতে হয় জানি আমি।'

মেয়েটি টেবিলের পাশে বসে খেতে লাগল। আর, শিশুটিকে বিছানার উপর রেখে মার্টিন এবার তার পাশে বসল। বুড়ো তখন মুখ টিপে টিপে হাসছে, ফোঁকলা দাঁতে হাসি জমছে না। এদিকে বাচ্চাটা কাঁদছে। বুড়ো মার্টিন তার একটা আঙুল বাচ্চাটার মুখের মধ্যে দেয় আর বারবার টেনে আনে। আঙুলটা জুতোর কালিতে কালো হয়ে উঠেছে, তাই তো শিশুকে সেটা কামড়ে ধরতে দেয় না। বাচ্চাটা প্রথমটায় আঙুলটাকে বেশ নজর করে দেখতে লাগল, তারপর চুপ করে গেল। মেয়েটি খেতে খেতে তার নিজের পরিচয় দিচ্ছিল—'এক সৈনিকের স্ত্রী আমি। এই আট মাস হ'ল, আমার স্বামীকে কোন্‌দিকে কোথায় যে পাঠানো হয়েছে কিছুই জানি না আমি। আজো তার কোনো খবর পাচ্ছি না। এই ছেলেটা হবার আগে এক বাড়ীতে রাঁধুনীর কাজ করতাম, কিন্তু সঙ্গে বাচ্চা রয়েছে বলে তারা আর রাখতে রাজি নয়। তিন মাস ধরে চেষ্টা করছি—কোনো একটা আশ্রয় খুঁজে পাবার জন্যে। যা-কিছু ছিল পোড়া পেটের খাবার জোটাতেই বিক্রি করে ফেলেছি। বাচ্চাকাচ্চা রাখার কাজের জন্যেও চেষ্টা করেছি, কিন্তু কেউই আমাকে রাখতে রাজি নয়। সবাই বলে আমি দেখতে হাভাতের মতো হাড়গিলের মতো! এখন দেখা করতে যাচ্ছি এক ব্যবসায়ীর স্ত্রীর সঙ্গে, সেখানে আমাদের গাঁয়েরও একজন কাজ করছে। তিনি আমাকে নেবেন বলেছেন—আর এক-হপ্তা পরে। তার বাড়ীটাও বহুদূরে, আমি বড় ক্লান্ত; না খেয়ে খেয়ে বাচ্চাটারও

আধমরা দশা। দেখে দেখে আমার বুক ফেটে যায়। তবু ভাগ্য, ঐ বাড়ীর গিন্নি আমাকে একটু দয়ার চোখে দেখেন—তিনি থাকবার জায়গাটুকু দিয়েছেন। তা না হ'লে কী যে করতাম তার কোনো কূলকিনারা ছিল না!'

মার্টিন দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে—'গরম কোনো জামা নেই তোমার?'

'গরম জামা কোথায় পাব বলুন? এই তো কালকেই আমার সাধের কম্বলটি মাত্র একটা টাকার জন্যে বিক্রি করে দিতে হ'ল।'—বলতে বলতে মেয়েটি বাচ্চাকে কোলে করে বসে। মার্টিন এগিয়ে গিয়ে আল্‌নার জিনিসের ভিতর কী যেন খুঁজতে থাকে। পুরানো একটা ওভারকোট খুঁজে পায়। 'এই যে!' মার্টিন বলে—'অবশ্যি পুরোনো জিনিস। তা, এ দিয়ে বেশ করে জড়িয়ে নিতে পারবে তো।'

মেয়েটি একবার তাকায় ওভারকোটটার দিকে, একবার বুড়োর দিকে; তারপর সেটা হাতে তুলে নিয়েই কেঁদে ফেলে ঝরঝর ক'রে। মার্টিন খাটিয়ার নিচটা হাতড়ে হাতড়ে ছোট একটা বাক্স টেনে বার করল। ভিতরটা হাতড়ে দেখে আবার এসে বসল মেয়েটির সামনে। মেয়েটি বলতে লাগল—'ভগবান আপনার মঙ্গল করুন। আপনি আমার আগের জন্মের আত্মীয় ছিলেন। আর নিশ্চয় ভগবানই আমাকে আপনার জানালায় পাঠিয়ে দিয়েছেন। তা না হলে, বাচ্চাটা জমেই মারা যেত! রওনা হবার সময় তেমন ঠাণ্ডা ছিল না, এখন কী ঠাণ্ডাটাই না পড়েছে। হতভাগিনী আমি, তাই প্রভু যীশুই আমাকে পাঠিয়ে দিয়েছেন আপনার জানালায়,—আপনার করুণা পাবার জন্যে।'

মার্টিন হাসিমুখে বলে—'খুবি সত্যিকথা, তিনিই তো তোমাকে পাঠিয়েছেন; আমি তো জানালার দিকেই তাকিয়ে ছিলাম।' মেয়েটিকে সে তখন তার স্বপ্নের কথা বলল—বলল কেমন করে প্রভু খ্রীষ্টই তাকে সেদিন দেখা দেবেন বলেছেন।

'তা, কে বলতে পারে! ভগবানের কৃপায় সবই সম্ভব।'—মেয়েটি বলে। তারপর সে ওভারকোটটা দিয়ে নিজেকে ও বাচ্চাটাকে জড়িয়ে নিয়ে মার্টিনকে প্রাণের কৃতজ্ঞতা জানায়, মাথা নত করে।

'সবই তো ভগবানের দয়া! হ্যাঁ, এটাও নাও!'—কম্বলটা ছাড়িয়ে আনার জন্যে মার্টিন তাকে দুটো টাকা দেয়। মেয়েটি ভগবানের উদ্দেশে প্রণাম জানায়। মার্টিনও প্রণাম করে, এবং মেয়েটির সঙ্গে সঙ্গে দরজার বাইরে

আসে, বিদায় জানায়। মেয়েটি দূরে অদেখা হয়ে গেলে মার্টিন ফিরে আসে, থালাবাসন ধুয়ে মুছে রাখে, তারপর কাজে লেগে যায় আবার। বসে বসে সে কাজ করতে থাকে, কিন্তু জানালার দিকটা ভুলে যায় না। সেদিকে কারুর ছায়া পড়লেই চোখ তুলে দেখে—কে যায়। চেনা ও অচেনা অনেকেই তো চলে গেল, কিন্তু তাদের মধ্যে কেউই তো সেরকম নয়।

কিছুক্ষণ পরে মার্টিন এগিয়ে এসে দেখে, এক ফলওয়ালী এসে দাঁড়িয়েছে তার জানালার ধারে। মাথায় তার মস্ত বড় আপেলের ঝুড়ি। ঝুড়িতে এখন আর আপেল বড় বেশী নেই, প্রায়টাই বিক্রি করে বাড়ী ফিরছে। কাঁধে রয়েছে তার জ্বালানীর বস্তা। এই বস্তাটার ভারেই সে ব্যথা পাচ্ছিল স্পষ্টতই, তাই ঝুড়িটা নামিয়ে ঘাড় বদল করছিল। ইতিমধ্যে ছেঁড়াজামা পরা একটা ছেলে ঝুড়ি থেকে একটা আপেল নিয়ে যাচ্ছিল পালিয়ে। কিন্তু বুড়ী দেখে ফেলেছে—ছেলেটাকে সে জামা ধরে টেনে রাখল। ছেলেটা ছাড়িয়ে যাবার চেষ্টায় ধ্বস্তাধ্বস্তি লাগিয়ে দিয়েছে, বুড়ীও তার চুলের মুঠি চেপে ধরেছে। ছেলেটা ওঠে চেঁচিয়ে—বুড়ী ওঠে খিঁচিয়ে। মার্টিন সিঁড়িপথে হুমড়ি খেতে খেতে চশমা ফেলেই তাড়াতাড়ি ছুটে আসে রাস্তায়। বুড়ী তখন ছেলেটার চুল ধরে টান মারছে, আর গালিগালাজ করছে—ভয় দেখাচ্ছে থানায় নিয়ে যাবার। ছেলেটা ধ্বস্তাধ্বস্তি করতে করতে বলছিল শুধু—'আমি নেইনি! বাঃরে, আমায় মারছ কেন? ছাড়ো বলছি।'

বুড়ো মার্টিন মাঝখানে পড়ে ছাড়িয়ে দেয়। ছেলেটার হাতখানি ধরে বুড়ীকে বলে—'বুড়ীদিদি, ছেড়ে দাও ওকে। ভগবানের নামে ক্ষমা করো ওকে, দামটা আমি দিয়ে দিচ্ছি, তাহলে এই শাস্তিটা শিগগিরি ও আর ভুলতে পারবে না।'

'কী বলছ তুমি? নাঃ, এই শয়তান ছোঁড়াকে থানায় না নিয়ে ছাড়ছি না।'

মার্টিন অনুরোধ করতে থাকে—'না বুড়ীদিদি, যেতে দাও ওকে। এমন আর কক্ষনো করবে না। ভগবানের দোহাই, ছেড়ে দাও।'

বুড়ী ছেড়ে দিতেই ছেলেটা ছুটে চলে যেতে চায়, কিন্তু মার্টিন তাকে থামিয়ে রাখে—'আগে ওর কাছে ক্ষমা চাও। কেমন, আর কখনো এমনটা করবে না। আমি নিজেই তোমাকে আপেল নিতে দেখেছি।' ছেলেটা কাঁদতে কাঁদতে বুড়ীর কাছে ক্ষমা চায়! বুড়ো মার্টিন বলে ওঠে—'হ্যাঁ, এই তো ঠিক। এবারে

আপেলটা নাও।' মার্টিন ঝুড়ি থেকে একটা আপেল তুলে, ছেলেটাকে দিয়ে বলে—'দামটা আমি দিচ্ছি।'

'এই করেই শয়তান ছোঁড়াদের মাথা খাবে। আচ্ছা করে ওকে পেটানো দরকার—একমাসেও যাতে গায়ের দাগ না শুকোয়।'

'ও বুড়ীদিদি, ও বুড়ীদিদি,—মার্টিন বলে ওঠে—'ওটা হ'ল আমাদের রীতি। ভগবানের রীতি ওটা নয়। একটা আপেল চুরি করার জন্যেই যদি পেটাতে হয় তো আমাদের এত সব পাপের জন্যে কি রকমটা করা উচিত?'

বুড়ী নীরব হয়ে যায়।

মার্টিন তখন তাকে খ্রীষ্টের জীবনের একটা কাহিনী বলে যায়। বুড়ী শোনে···ছেলেটিও পাশে দাঁড়িয়ে শোনে একমনে।

তারপর মার্টিন বলে—'ভগবান আমাদের সবাইকেই ক্ষমা করতে বলেছেন। কারণ, তা না হ'লে আমরাই যে ক্ষমা পাব না: সবাইকেই ক্ষমা করবে—বিশেষ করে পথভ্রষ্টদের ও মূর্খদের।'

বুড়ী মাথা নাড়তে নাড়তে দীর্ঘশ্বাস ফেলে—'তা সত্যি কথা, কিন্তু এরাও যে দিন দিন নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।'

'তা হ'লে আমাদের এই বুড়ো-বুড়ীদেরই তো ভালো পথ দেখাতে হবে।'

'আমিও তাই বলি,'—বুড়ী সায় দেয়—'আমার সাত-সাতটি ছেলে ছিল, এখন আছে কেবল একটি মেয়ে।' বুড়ী বলে যায়—তার মেয়েকে নিয়ে কোথায় আছে সে, কটা নাতি-নাতনী আছে তার। তারপর বলে—'তা, এখন আর শরীরে কুলোয় না। তবুও তো দিনরাত খেটে খাই আমার সোনার চাঁদদের জন্যে। চমৎকার ছেলেমেয়ে সব। ছোটমেয়েটি তো সবার কাছ থেকেই আগলে রাখবে আমাকে। তার মুখে কেবল—'আমার দিদা, আমার দিদা!'

—এখন, এসব মনে পড়তেই বুড়ীর মনটা একেবারে নরম হয়ে যায়, ছেলেটাকে দেখিয়ে বুড়ী বলে তখন—'তা, ছেলেমানুষ বলেই এমনটা করেছে।'

বুড়ী তার ভারী বস্তাটা কাঁধে তুলতে গেলে ছেলেটা তাড়াতাড়ি সামনে পড়ে বলে—'আমিই নিচ্ছি, এই পথেই যাব আমি।'

বুড়ী বস্তাটা ছেলেটার কাঁধে চাপিয়ে দিয়ে পথ চলতে থাকে। মার্টিনের কাছে আপেলের দামটা চাইতেও ভুলে যায়। মার্টিন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখে দুজনে একসঙ্গেই চলে যাচ্ছে। ওরা বহুদূর চলে গেলে ফিরে আসে, স্থঁচটা নিয়ে কাজে বসে আবার। খানিকটা কাজ করতে করতে আর নজরে পড়ে না সেলাইয়ের

ফোঁড়ের জায়গা। বাইরে দেখা যায় রাস্তায় আলো জ্বালানো হচ্ছে।

আলো জ্বালবার সময় হয়েছে দেখে মার্টিনও বাতিটা ধরিয়ে আবার কাজে বসে। একটা বুট জুতোর কাজ শেষ করে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে লাগল—হ্যাঁ, কাজটা বেশ ভালই হয়েছে। এবার সে যন্ত্রপাতি গুছিয়ে রেখে ঝাঁট দিয়ে ফেলল চামড়ার টুকরা-টাকরাগুলো, তুলে রেখে দিল সুঁচ-সুতো। তারপর বাতিটা নামিয়ে এনে রাখল টেবিলের উপর, তাক থেকে নামিয়ে আনল বাইবেল-খানা। গত কালের পড়া জায়গাটা সে নির্দিষ্ট করে রেখেছিল—এক টুকরো চামড়া ঢুকিয়ে রেখে। সেই জায়গাই খুলতে যাচ্ছিল, কিন্তু বইটা খুলে গেল অন্য এক জায়গায়। সেই পৃষ্ঠাটা খুলতে খুলতে মনে জেগে উঠল গত রাতের স্বপ্নের কথা এবং তক্ষুনি সে শুনতে পেল কার পদধ্বনি। কে যেন তার পেছনেই চলাফেরা করছে এবার। মার্টিন ঘুরে দাঁড়ায়, দেখে। মনে হয়, তার ঘরের অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আছে কত লোক, কিন্তু তাদের কাউকেই সে চিনে উঠতে পারে না। তারপর শোনা যায় কার মৃদু কণ্ঠস্বর—

'মার্টিন, মার্টিন, তুমি আমাকে চিনতে পারোনি?'

'কে!'—আপন মনেই বলে ওঠে মার্টিন।

'এই যে, আমি!'—বলে সেই কণ্ঠস্বর। অমনি অন্ধকার কোণ থেকে এগিয়ে আসে স্তেপানিচ্—হাসিমুখে মিলিয়ে যায় সাদা মেঘের মতো!

'এই যে, আমি!'—আবার বলে সেই কণ্ঠস্বর। অমনি অন্ধকার কোণ থেকে বেরিয়ে আসে একটি মেয়ে, কোলে শিশুসন্তান। মেয়েটির মুখখানি হাসিতে ঝলমল করছে, কোলের বাচ্চাটাও হাসছে খিলখিল ক'রে। ধীরে ধীরে মিলিয়ে যায় ওরা।

একটি ছেলে এবার এগিয়ে আসে হাসিমুখে, চলতে চলতে অদৃশ্য হয়ে যায়।

মার্টিনের বুক ভরে উঠে করুণায়, চশমাটা পরে সে ধর্মবাণীর সেই খোলা পৃষ্ঠাটা পড়তে স্বরু করে। পৃষ্ঠাটার একেবারে শুরুতেই লেখা: 'আমি ক্ষুধার্ত ছিলাম, তুমি আমাকে খাবার দিয়াছ; তৃষ্ণার্ত ছিলাম, তুমি আমাকে তৃষ্ণায় জল দিয়াছ; তুমি আমাকে ঘরে ডাকিয়া আনিয়াছ।'

পৃষ্ঠাটির শেষের দিকটাও পড়তে থাকে মার্টিন—'আমাদের ভাইদের তুমি যতটা সাহায্য করিয়াছ, আসলে সেই সাহায্য করিয়াছ আমাকেই।'

এবার মার্টিন বুঝল স্বপ্ন তার সফল হয়েছে, ভগবান সত্যসত্যই তার কাছে এসেছিলেন, আর তাঁকে সে জানতে পেরেছে সাদর অভ্যর্থনা।

## ॥ ছোটরা বড়দের চেয়েও বড় ॥

বড়দিনের ছুটিটা সে বছর কিছু আগেই শুরু হয়েছে। দলে দলে সবাই তখনো স্লেজগাড়ীতে চড়ে বেড়াচ্ছে, ছাতগুলো ছেয়ে গেছে তুষারে। গাঁয়ের চারদিক দিয়ে ছুটে চলেছে ছোট ছোট জলস্রোত।

বড় রাস্তাটার পাশেই দুখানা বাড়ী, আর তার মাঝামাঝি একটা ডোবা। ঐ বাড়ী দুটোর ছোট্ট-দুটি মেয়ের কিন্তু ঐ ডোবাতে গিয়ে খেলতেই ভারী শখ। একটি একেবারেই ছোট, অন্যটি কিছুটা বড়। দুটি মেয়েরই গায়ে নতুন ফ্রক—ছোটটির নীল রঙের, আর বড়টির চমৎকার নক্সাকাটা হল্‌দে রঙের। দুজনেরই মাথায় রুমাল বাঁধা বেশ কায়দা ক'রে। খাওয়া দাওয়া হয়ে গেছে আগেই, এখন ডোবার পাশে ছুটে এসেছে খেলতে, আর এ-ওকে নিজের নিজের সুন্দর জামা দেখাতে।

ওরা অবিশ্যি ওই নোংরা জলে নেমেই খেলতে চায়? ছোট্ট মেয়েটি তার সুন্দর নরম জুতো পায়ে দিয়েই আস্তে আস্তে নেমে আসে ডোবার কিনারায়। কিন্তু তার সঙ্গীটি অর্থাৎ কিনা আকুলি চেঁচিয়ে বলে—'থাম্ মালা, জলে নামিস্ না রে! মা ভয়ানক রাগ করবে কিন্তু। নামতে চাস্ তো জুতো খুলে নে—আমিও খুলে নিচ্ছি।'

তখন ওরা জুতো খুলে ফেলে ফ্রক উপরের দিকে গুটিয়ে নেয়, তারপর ধীরে ধীরে নামে ডোবার জলে। মালার পায়ের পাতা এরই মধ্যে ডুবে যাচ্ছে, আর সঙ্গে সঙ্গে চেঁচিয়ে বলছে সে—'আমার ভয় করছে, এতো জল!'

'না রে, কোনো ভয় নেই। মাঝখানটায় তত গভীর নয়। আয়, সোজাসুজি চলে আয়!'—আকুলি সাহস দেয়।

ওরা এগিয়ে আসে এ-ওর কাছে। বড়টি বলে তখন—'ভালো হচ্ছে না, মালা! তুই বড্ড জল ছেঁটাস্! একটু আস্তে চলতে পারিস্ না।'

কিন্তু একথা বলার সঙ্গে সঙ্গেই মালার চঞ্চল দুটি ছোট্ট পায়ের আঘাতে অনেকটা জল ছিটকে ওঠে—আকুলির সুন্দর ফ্রকটাও ভিজে যায়, তার চোখে মুখেও জলের ছিঁটে লাগে। ফ্রকটা নষ্ট হয়েছে দেখে আকুলি রাগে তেড়ে আসে

মালাকে। ভয় পেয়ে মালা ডোবা থেকে উঠে সোজা পালিয়ে চলে বাড়ীর দিকে।

আর ঠিক সেই সময়েই আকুলির মা আসছিল এই দিকেই। মেয়ের ফ্রকটা আগাগোড়া ভিজে গেছে—দেখল সে। চেঁচিয়ে বলে সে আকুলিকে—'কি করছিলি এতক্ষণ, অসভ্য নোংরা মেয়ে?'

'দেখো না মা, মালাটা এরকম করে দিয়েছে—ইচ্ছে করেই করেছে।'

মা তো তেলে বেগুনে জ্বলে ওঠে, তাড়া করে যায় মালাকে, রাগে পেয়ে তার মাথায় মারে দু-এক ঘা।

মালার কান্না ছড়িয়ে পড়ে রাস্তার চারদিকে। মালার মাও তখন ঘর থেকে ছুটে আসে এবং অজস্র গালিগালাজ বর্ষণ করতে থাকে আকুলির মার উপর—বলে সে—'আমার মেয়েকে মারবার তুমি কে?'

কিছুক্ষণের মধ্যেই দুজনে ভয়ানক বিশ্রী একটা ঝগড়া বাধিয়ে তোলে। লোকজন জমে যায় চারদিকে। পুরুষেরা শুরু করেছে তর্জন-গর্জন, আর স্ত্রীলোকেরা চীৎকার করছে কর্কশ গলায়। কেউ কান দেয় না কারুর কথায়। তাই, নানারকম গালিগালাজের পরে শুরু হয় হাতাহাতি। আকুলির বুড়ী ঠাকুমা না আসা পর্যন্ত সমানেই চলতে থাকে জোর মারামারি।

তিনি এসে বলেন—'একি মা-লক্ষ্মীরা, একী করছ তোমরা—এসব ভারী অন্যায়। বড়দিনটা কি এরকম করে কাটানোর জন্যে? কোথায় সবাই মিলেমিশে আমোদ-আহ্লাদ করবে, তা না ঝগড়াঝাটি করছ। না, না এ ঠিক নয়।'

তখন বুড়ীর ভালোকথা বাতিল করে দিয়ে দুপক্ষই একসঙ্গে তেড়ে যায় তাঁর দিকে। এদিকে যখন জোর ঝগড়া ও মারামারি চলছে, বড় মেয়েটি অর্থাৎ কিনা আকুলি ততক্ষণে তার ফ্রকটা শুকিয়ে নিয়ে আবার ফিরে এসেছে ডোবার কাছে। বড় রাস্তার উপর জল ছিটকে তোলার জন্যে নুড়ি ছুঁড়তে শুরু করে দিয়েছে ডোবার জলে।

মালাও এগিয়ে এসেছে সাহায্য করতে। এবার ওরা দুজনে নালা কেটে জল বইয়ে দেবে। সবাই তখনো তর্কে বিতর্কে সরগরম, আর ওরা যে নালা কেটেছে তা দিয়ে এরি মধ্যে জল গড়িয়ে গিয়ে পৌঁছে গেছে—ঐ সব ক্রুদ্ধ গাঁয়ের লোকদের পায়ের তলায়!

যে বৃদ্ধাটি ওদের শান্ত করার চেষ্টা করছিলেন তাঁরও পায়ের তলায় জল

এসে গেল। আর ঐ ক্ষীণ জলধারার দু'পাশ দিয়ে মেয়ে দু'টি খুশিমনে দৌড়োতে লাগল।

'থাম্ মালা, তোর পায়ে পড়ি, থাম্ না ভাই!'—আকুলি জোর উল্লাসে হেসে ওঠে। কিন্তু ছোট্ট মালা খুশির চোটে কী যে করবে ভেবে পায় না, এমনকি কথাটি পর্যন্ত বলতে পারে না।

এমনি করে তারা ছোট্ট স্রোতধারার পাশ দিয়ে আনন্দে নেচে নেচে চলে। ওদের চঞ্চল চলায় ছোট ছোট ঘাসেরা দুমড়ে পিষে যায়। ওরা নাচতে নাচতে এসে পড়ে একেবারে ভিড়ের মধ্যেই।

বৃদ্ধাটি তাই দেখে এবার জোরে গলা ছেড়ে বলে ওঠেন—'এ কেমন ভয়ানক ঝগড়া করছ তোমরা, ধর্মভয়ও কি নেই তোমাদের? তোমরা সবাই দেখছি এখনো বেশ গরম হয়ে আছ, ছোট্ট মেয়ে-দুটির কথা নিয়ে কেবল ঝগড়া করেই চলেছ। অথচ ঐ দেখো, কখন তারা তাদের ঝগড়াঝাটি ভুলে গেছে! এই সুন্দর দুটি ছোট্ট শিশু আনন্দে আবার শুরু করে দিয়েছে তাদের খেলা। বলো, তোমাদের চেয়ে তারা কি বড় বা জ্ঞানী নয়?'

## ॥ শৈশব-স্মৃতি ॥

শৈশব, সুখের শৈশব! সেই মধুময় দিনগুলি শত ডাকেও আর তো ফিরে আসবে না। শৈশবকে আমি প্রাণভরে ভালো না বেসে পারি, তার উজ্জ্বল স্মৃতিগুলি বরণ না করে পারি? ওই স্মৃতি নবীন করে তোলে আমার আত্মাকে, সমুন্নত করে,—আমার কাছে তারা তো চির-আনন্দের উৎস। চারদিকে ছুটোছুটি করে ক্লান্ত, এসে বসেছি চায়ের টেবিলে—আমার উঁচু কেদারাটায়; অনেক আগেই খেয়েছি আমার বাটি-ভরা চিনি-দুধ। ঘুমে তখন এঁটে আসছে দুচোখের পাতা, আমি তবু নড়ছি না, বসেই আছি—বসে বসে মন দিয়ে শুনছি। মামণি কারো সঙ্গে কথা বলছে, আহা মায়ের গলার স্বর কী মিষ্টি! শুধু ঐ স্বরটিই আমার প্রাণের মধ্যে বলতে থাকে কত কথা! ঝিমুনিতে জড়িয়ে আসছে দুই চোখ—সেই চোখে আমি দেখছি মায়ের মুখখানি, আর দেখতে দেখতে ক্রমেই ছোট হয়ে আসছে মায়ের দেহটি—এত ছোট যে মুখখানি

একটি ফুটফুটে গোলাপের চেয়ে বড় নয়,—আমি কিন্তু তখনো দেখতে পাচ্ছি ঠিকই। দেখতে পাচ্ছি মামণি আমার দিকে তাকিয়ে হাসছে। আমি এত্‌তটুকুই দেখতে চাইছি তাকে। আমার দুচোখের পাতা আরো ঘনিয়ে আনলাম—এবারে মামণিকে দেখাচ্ছে এত্‌ত ছোট! একটা বাচ্চা আর একটা বাচ্চার চোখের মণির মধ্যে নিজেকে দেখতে পায় যেমনটা তার চেয়ে বড় নয়। কিন্তু যেই আমি নড়েছি, ভেঙ্গে গেল সেই ভ্রান্তিমায়া! আমি দুচোখ কুঁচকে, ঘুরিয়ে ফিরিয়ে কত রকমে চেষ্টা করতে লাগলাম আবার ঠিক অমনটা করতে, কিন্তু আর হ'ল না।

উঠে পড়লাম, একটা আরাম কেদারার মধ্যে আরাম করে বসলাম।

মামণি বলছে—'নিকোলেন্কা, এবার ঘুমুতে যাও। আচ্ছা উপরেই যাও, কেমন?' 'না মামণি, এখন ঘুমুতে ইচ্ছে করছে না।'—মামণিকে জানালাম; কিন্তু মিষ্টি-মিষ্টি কুয়াশা-ঘেরা স্বপ্নেরা ভরে ফেলল আমার মাথার ভিতরটা—দুচোখের দুজোড়া পাতা বুঁজিয়ে দিল শিশুকালের সুস্থ ঘুমে, আর এক পলকের মধ্যেই আমি কোথায় হারিয়ে গেলাম। ঘুম থেকে উঠলাম আমাকে জাগিয়ে দিলে, তবেই। স্বপ্নে অনুভব করছি কার যেন কোমল হাত আমাকে স্পর্শ করছে; কেবল মাত্র ওই স্পর্শটুকু থেকেই জানি আমি—কে সে! তবু ঘুমের মধ্যেই সেই হাতখানি ধরে রাখি—বড় আদরে চেপে রাখি আমার ওষ্ঠের উপরে।

সবাই চলে গেছে আগেই, বৈঠকখানায় জলছে কেবল একটি মোমবাতি। মামণি বলে গেছে নিজে এসে ঘুম থেকে জাগাবে আমাকে: আমি যে কেদারাটিতে ঘুমোচ্ছি সেখানেই বসে আছে মামণি, তার আশ্চর্য-কোমল হাত-খানি আমার চুলে বুলোচ্ছে, আর আমার কানে বাজছে তার পরিচিত প্রিয় কণ্ঠস্বর: 'ওঠো সোনা আমার, এখন তো শুতে যাবার সময় হ'ল!'

কোনোদিক থেকেই কেউ কঠিন দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে বিব্রত করছে না, মা-মণির যত আদর ও ভালোবাসা আমার উপরে ঢেলে দিতে আর ভয় নেই এখন। আমি নড়ছি না, আবেগ ভরে চুমু খাচ্ছি মামণির হাতে।

'ওঠো, মানিক আমার!'

মা তার আর একখানি হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরেছে আমার গলা, সরু সরু আঙুলগুলি দিয়ে সুড়সুড়ি দিচ্ছে। ঘরটা একেবারে নিঃশব্দ, এবং অন্ধকার-প্রায়। সুড়সুড়িতে আর ঘুম থেকে জেগে ওঠাতে আমার স্নায়ুতে স্নায়ুতে

শিহরণ জাগছে। মামণি আমার কাছে ঘনিয়ে বসেছে গায়ে গা, আমাকে স্পর্শ করছে—আমার চেতনায় ধরা দিচ্ছে মামণির গায়ের গন্ধ, তার কণ্ঠস্বর। উঠে বসে দুহাত বাড়িয়ে তার গলা জড়িয়ে ধরেছি, তার বুকের উপর চেপে ধরেছি আমার মাথাটা। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলছি—'মা, মামণি, আমার মামণি! তোমাকে আমি বড় ভালোবাসি!' মামণি হাসতে থাকে তার ব্যথাতুর মোহন-মধুর হাসি, দুটো হাতে আমার মাথাটি ধ'রে, একের পর এক চুমো খেতে থাকে আমার কপালে; আমাকে বসিয়ে দেয় তার দুই হাঁটুর উপরে।

'তাহ'লে, তুমি আমাকে খুবি ভালোবাসো?'—এক পলক নীরব থেকে, বলে মামণি—'তুমি আমাকে চিরদিনই ভালোবাসবে, ঠিক তো? কখনো ভুলবে না আমাকে? যখন আর থাকবে না মামণি, তখনো তাকে, ভুলে যাবে না? তাকে ভুলে যাবে না, নিকোলেঙ্কা।'

আরো আরো আদর করে আমাকে চুমু খেতে থাকে আমার মা। 'না, না মামণি, আমার মামণি! ও কথা বলো না!'—তার হাঁটুর উপর চুমু খেতে খেতে আমি কাঁদতে থাকি। আমার দুই চোখ বেয়ে নামতে থাকে অঝোর অশ্রু—ভালোবাসার অশ্রু, আনন্দ-উচ্ছ্বাসের।

এরপর এসেছি উপরতলায় আমার ঘরে, রাতের শোবার পোষাক পরে দেবমূর্তিদের সামনে এসে দাঁড়ালাম—সর্বান্তঃকরণে বারবার বলতে লাগলাম—'ভগবান! আমার বাপি আর মামণিকে সুখে রাখো। আমার আদরিণী মার মুখে শুনে শুনে আমার শিশু-ওষ্ঠে যে প্রার্থনা উচ্চারণ করতে শিখেছি, তা-ই আবার আওড়াতে গিয়ে মায়ের প্রতি ভালোবাসা আর ভগবানের প্রতি ভালোবাসা—দুটোই এক অনুভবে মিলে গেল কী এক আশ্চর্য রকমে।

প্রার্থনা শেষ করে আমার ছোট্ট কম্বলটিতে গা জড়িয়ে নিয়েছি—হালকা আনন্দে ভরে উঠেছে মন; এগিয়ে আসছে একের পর এক স্বপ্ন—কিন্তু কিসের স্বপ্ন তারা? বড়ই অসম্পূর্ণ আকার তাদের, কিন্তু পবিত্র ভালোবাসায় ও সুখের আশায় ভরা। আর তার পরেই আমি ভাবছি আমার গৃহশিক্ষক কার্ল আইভানিচ্-এর কথা—তার নিষ্ঠুর ভাগ্যের কথা, ঐ একটিমাত্র হতভাগ্য লোককেই তো তখন পর্যন্ত জানতাম আমি। তার জন্যে এত দুঃখ হতে লাগল! তাকে আমি এত ভালোবাসতাম যে আমার দুই চোখ ভরে উঠল অশ্রুজলে। তখন আমি আপনমনেই বলছি—'ভগবান, তুমি তাকে সুখে রেখো; তাকে

সাহায্য করতে পারি আমাকে তেমন শক্তি দাও, তার দুঃখের ভার যেন হাল্কা করতে পারি ; তার জন্যে তো আমি বিসর্জন দিতে পারি সবকিছুই।' তখন আমার পালকের বালিশের মধ্যে গুঁজে রাখলাম আমার প্রিয় খেলনা দুটি— চীনেমাটির কুকুরটা আর খরগোশটা। আঃ কী আরামে থাকবে ওখানে— ভাবতে ভারী ভালো লাগছে। আবার আমি প্রার্থনা করছি : সকলেই যেন সুখী হয়, কাল ভোরের আবহাওয়াটি যেন সুন্দর হয়—ঘুরে বেড়াবার মতো। এবার পাশ ফিরেছি : আমার ভাবনা ও স্বপ্ন জড়িয়ে যাচ্ছে এলোমেলো—ঘুমিয়ে পড়ছি নীরবে শান্তিতে, ধীরে ধীরে ; আমার মুখখানি তখনো অশ্রুতে ভিজা।

এসব তাজা-অম্লান ভাব, এই হাল্কা মন, ভালোবাসার এমন প্রয়োজন, বিশ্বাসের এমন শক্তি—শৈশবে যেমনটি, তা কি ফিরে আসবে আর? তার চেয়ে সুসময় আর কী বা হতে পারে? নিষ্পাপ আনন্দ আর ভালোবাসার জন্যে এক অফুরন্ত তৃষ্ণা—এই দুই সর্বোত্তম ধর্মই তো তখন হয়ে ওঠে জীবনের একমাত্র প্রেরণা।

কোথায় গেল সেইসব শিখার মতো প্রার্থনা? কোথায় এ জীবনের সেই সর্বোত্তম দান—আবেগ-নিঃসৃত সেই পবিত্র অশ্রুধারা? সান্ত্বনার দেবদূত এসে হাসিমুখে মুছে দিত সেই অশ্রু, স্বপ্ন ছড়িয়ে দিত শৈশবের পবিত্র-সুন্দর কল্পনায়।

আমার বুকের উপর জীবন কি এমন গুরুভার চাপিয়ে দিল যে অশ্রু আর আনন্দ-উচ্ছ্বাস আমাকে ছেড়ে চলে গেল চিরকালের জন্যেই? থাকে কি কেবলমাত্র স্মৃতিই?

## ॥ এক ভ্রমণ-প্রসঙ্গ ॥

### [ তলস্তয়ের আত্মকথার 'কৈশোর' থেকে ]

### এক

সবচেয়ে কাছের গ্রামটাও তখন পাঁচ-মাইল, কিন্তু প্রকাণ্ড এক গাঢ়রক্ত মেঘ কোথা থেকে যে জেগে উঠল, দ্রুত এগিয়ে এসে আমাদের ছেয়ে ফেলল—তা বুঝতেই পারলাম না ; কারণ হাওয়া বইছিল না মোটেই। তখনো মেঘের আড়ালে ঢাকা পড়েনি সূর্য, প্রদীপ্ত করে রেখেছে আকাশের গম্ভীর শূন্যতকে ; ধূসর-রঙ তুলির টান সূর্য থেকে একের পর এক নেমে এসেছে দিগন্ত অবধি। বহুদূরে মাঝে মাঝে চমকে উঠছে বিদ্যুৎ, আর শোনা যাচ্ছে চাপা গুরুগুরু ধ্বনি, আর তা এগিয়ে আসতে আসতে ভেঙ্গে পড়ছে গগন-বিস্তারী অট্টনাদে। আমাদের কোচোয়ান ভাসিলি উঠে বসল বাক্সাসনে, তুলে দিল আমাদের ব্রিচ্‌কা গাড়ীটা'র ঢাকনাটা। কোচোয়ানেরা পরে নিল তাদের আর্মিয়াক-পিরাহান, প্রত্যেকটি বাজ-পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই টুপি খুলে খুলে প্রণাম জানাতে লাগল দেবতার উদ্দেশে। ঘোড়াগুলি কান খাড়া করে নাসারন্ধ্র ফুলিয়ে আঘ্রাণ করছে বজ্রমেঘ থেকে স্বাগত তাজা হাওয়ার গন্ধ। আমাদের ব্রিচ্‌কা ধুলোপথে ছুটে চলেছে দ্রুত থেকে দ্রুততর। আমি আচ্ছন্ন হয়ে পড়লাম কেমন এক আশঙ্কায়। আমি ঠিক বুঝতে পারছি আমার ধমনীতে ধমনীতে উথলে উঠছে রক্ত। দেখতে দেখতে অগ্রসর মেঘে ঢেকে গেল সূর্য, শেষবারের মতো উঁকি মারল একবার, প্রদীপ্ত দিগন্ত শেষরশ্মি ছুঁড়ে দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল। সহসা পালটে গেল সমগ্র প্রান্তর—ধারণ করল এক বিষণ্ণ গম্ভীর মূর্তি। থরথর কাঁপতে লাগল আস্পেন-এর ঝাড়গুলি, পাতায় পাতায় লাগল ধূসর রঙের ছোঁয়া—লালচে আকাশের পটে জেগে উঠল স্পষ্ট, মর্মর-ধ্বনি তুলল চঞ্চল নৃত্যে। দুলছে দীর্ঘকায় বার্চের মাথাগুলি, গুচ্ছ গুচ্ছ শুষ্ক ঘাস ঘুরপাক খেতে লাগল পথের উপর। শাদাবুক চাতকেরা দ্রুতগতিতে চক্কর খেতে লাগল আমাদের ব্রিচ্‌কার চারদিকে, বারবার ঝাঁপিয়ে পড়তে লাগল ঘোড়াগুলির বুকের তলায়,—আমাদের থামাতেই চাইছে যেন ; হাওয়ার বেগে একপাশ কেটে উড়ে চলল বিপর্যস্ত

ভানায়। আমাদের ব্রিচ্‌কার উপরের চামড়ার ঢাকনার প্রান্তগুলি ওঠানামা করছে, আর ভিতরে ঢুকছে ভিজা হাওয়ার ঝাপটা,—গাড়ীটার গায়ের উপর ঝাপট খাচ্ছে, বাড়ি মারছে। বিদ্যুৎ ঝলসে উঠছে যেন গাড়ীটার ভিতরেই—আমাদের চোখ ধাঁধিয়ে দিচ্ছে,…ভোলিয়া দাদা ভয়ে কুঁকড়ে রয়েছে এককোণে। আর তখনি ধ্বনিত হ'ল রাজসিক এক বজ্রনাদ—ঠিক আমাদেরি মাথার উপরে! মনে হ'ল তা উঠে গেল উচ্চ থেকে উচ্চতর লোকে, ছড়িয়ে পড়তে লাগল ক্রমস্ফীত ও ক্রমবিস্তৃত প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বৃত্তাকারে—এবং শেষটায় ফেটে পড়ল কানে তালা-লাগা এক কড়াক্কড় বজ্রপাতে। একটা কাঁপুনি খেলে গেল আমাদের সর্বাঙ্গে, দম যেন বন্ধ হয়ে গেল। দেবতার ক্রোধ! সাধারণ লোকের এই ধারণার মধ্যেই লেখা আছে কী সুন্দর কবিতা!

ব্রিচ্‌কার চাকাগুলি ঘুরছে দ্রুত আরো দ্রুত! কোচোয়ান ভাসিলি ও ফিলিপের হাতে হাতে শপাং শপাং ঝলকে উঠছে লাগাম,—ওরাও শঙ্কিত। পাহাড়ের ঢালুপথে অতিদ্রুত গড়িয়ে নামছে ব্রিচ্‌কা, ঘড়ঘড় আওয়াজ তুলছে কাঠের পুলে। আমি তো নড়তেও সাহস পাচ্ছি না—কী এক সাংঘাতিক ভয়, এই বুঝি ধ্বংস হয়ে যাচ্ছি আমরা সবাই।

ওঃ! ছিঁড়ে গেল লাগামের ফিতেটা! দুই কানে তালা-লাগানো অবিশ্রান্ত বজ্রধ্বনি হতে থাকলেও আমরা তার মধ্যেই থামতে বাধ্য হলাম পুলের উপরে।

ব্রিচ্‌কার একপাশে মাথাটা হেলান দিয়ে আছি—রুদ্ধশ্বাস। ফিলিপের কালোকালো আঙ্গুলগুলির গতিবিধি দেখছি, আর একটা হতাশ্বাস এসে থাবা দিয়ে ধরছে আমার হৃৎপিণ্ডটা। ফিলিপ ধীরে ধীরে ফিতেটায় একটা গিঁঠ আঁটল, টেনে ধরল ফিতেগুলি—পাশের ঘোড়াটাকে ঘা মারতে লাগল হাতের মুঠো দিয়ে, চাবুকের হাতলটা দিয়ে।

ঝড় আরো জোরালো হয়ে উঠতেই আমার মধ্যে বেড়ে উঠল কেমন এক দুঃখের বিপন্ন অনুভব, আর তারি সঙ্গে ভয়। আর তারপরে যখন দেখা দিল এক রাজসিক নিঃশব্দতা—সাধারণত তা দেখা দেয় বজ্রপাতের ঠিক আগেই, তখন আমার সেই অনুভবগুলি এত চরমে গিয়ে পৌঁছল যে ঝড়ের ঐ অবস্থাটা যদি আর আধঘণ্টা খানেকও থাকত তো, উত্তেজনায়ই মারা যেতাম। আর ঠিক তখনি পুলের তলা থেকে বেরিয়ে এল মানুষের মতো কিছু-একটা: নোংরা ছেঁড়াকাটা জামা পরা, বোকা-বোকা মুখ, নাড়াচ্ছে ন্যাড়া তার খালি মাথাটা,

রগ-নেই দুমড়ানো দুটো পা, আর হাতের জায়গায় লাল টকটকে একটা মুলো পিণ্ড—আর সেটাই সে সোজা এগিয়ে দিল ব্রিচ্‌কার মধ্যে।

'যীশুর দয়া, খোঁড়াকে দিন কিছু।'—কাঁপা-কাঁপা গলায় বলছিল সেই ভিখারীটা, আর প্রত্যেকটি কথার সঙ্গে সঙ্গে নমস্কার জানাচ্ছিল মাথা নুইয়ে।

আমার সমস্ত আত্মা হিম হয়ে আসছিল কী যে নিদারুণ ভয়ে তা বর্ণনা করতে পারব না। শিউরে উঠল আমার মাথার চুল পর্যন্ত, আর আমার চোখ দুটি ভিখারীটির দিকে চেয়ে রইল বিমূঢ় আশঙ্কায়।

ভাসিলি তখন ফিলিপকে নির্দেশ দিচ্ছিল ফিতেগুলির জোর কী করে বাড়াতে হবে। এদিকে সব যখন ঠিকঠাক হ'ল, উঠে বসল সে বাক্সাসনে, এবং তখনি মাত্র সে তার পাশ-পকেটটা হাতড়াতে লাগল। যাতায়াতের পথে সেই ভিখ্ দেবার লোক। কিন্তু আমরা আবার যাত্রা শুরু করেছি কি, চোখ-ধাঁধানো বিদ্যুতের অগ্নিঝলকে এক পলকের জন্যে পূর্ণ হ'ল সমস্ত গিরিদরী। আর ঠিক তার পরেই এক কান-ফাটানো বজ্রধ্বনি! মনে হ'ল যেন আমাদের উপরেই ভেঙ্গে পড়ল সমগ্র আকাশ। আরো বেড়ে উঠল ঝড়ের বেগ: ঘোড়াগুলির কেশর ও লেজের চামর, ভাসিলির লম্বা জামাটার প্রান্তগুলি ছটফট করতে লাগল ক্রুদ্ধ হাওয়ার দাপটে। ব্রিচ্‌কার চামড়া-ঢাকনীটার উপরে টুপ করে পড়ল বড় এক ফোঁটা বৃষ্টি, তারপর আর এক ফোঁটা, তারপর আরো, আরো···দেখতে না দেখতে আমাদের ঘিরে চলতে লাগল সে এক দুন্দুভি-বাজনা, আর বর্ষণ-শব্দে ধ্বনিত হতে লাগল সমগ্র প্রান্তর। ভাসিলির কনুইয়ের নড়াচড়ার ভঙ্গী থেকে ধরতে পারলাম সে টাকাপয়সার থলেটা খুলছে। ভিখারীটি ওদিকে মাথা নুইয়ে নমস্কার জানাতে জানাতে গাড়ীর পিছুপিছু তখনো এমনভাবে ছুটছে যে গাড়ীর তলায় পড়ে গুঁড়িয়ে যায় আর কি। তখনো সে বলছে 'যীশুর দয়া, কিছু দিন!' শেষপর্যন্ত একটা তাম্রমুদ্রা ছিটকে পড়ল আমাদের পাশ দিয়ে। অমনি ঐ হতভাগ্য জীবটি দাঁড়িয়ে পড়ল পথের মধ্যখানে দ্বিধাগ্রস্ত—ক্ষীণদেহটি হাওয়ার বেগে দুলছে, বৃষ্টিভেজা ছেঁড়াজামা এঁটে রয়েছে তার সর্বাঙ্গে। এরপর অদৃশ্য হয়ে গেল সে।

ভয়ঙ্কর ঝোড়ো হাওয়ার তাড়া খেয়ে বৃষ্টি এবার ত্যারছা গতিতে নেমে এল মুষলধারায়, ভাসিলির ফ্রিজ-কোটের গা বেয়ে বেয়ে নামতে লাগল বৃষ্টিধারা··· ধুলোবালি এতক্ষণ ছোট ছোট দলা পাকিয়ে উঠছিল, এবারে হয়ে গেল একেবারে তরল কাদা, আর তার মধ্য দিয়ে প্যাচপ্যাচ করতে করতে চলল আমাদের

গাড়ীটা; গাড়ীর চাকার চলা-পথে—গর্তের মধ্য দিয়ে বয়ে চলেছে দুরন্ত জলধারা। বিদ্যুতের ঝলক এবার ছড়িয়ে পড়ছে হাল্কা ফ্যাকাশে, বৃষ্টিপাতের আওয়াজ ছাড়িয়ে গুরুগুরু মেঘের ডাক এখন আর তত চমকানো ধরণের নয়।

এখন আর তত জোরে বৃষ্টিও হচ্ছে না, বজ্রমেঘেরা সরে সরে যাচ্ছে। যেখানে সূর্যটা ঠিকই রয়েছে আলো ফুটেছে সেখানে, মেঘেদের ধোঁয়াটে-শাদা কিনারা দিয়ে দেখা যাচ্ছে নীলোজ্জ্বল রেখা। তবু মুহূর্তেক ভীরু-ভীরু সূর্যকিরণ ঝিকমিক করছে রাস্তার উপরকার গর্তভরা জলের উপর। বর্ষার সূক্ষ্ম-সরল ধারা নেমে এসেছে—ঠিক যেন বুনানী সুতোর মতো, এসে পড়েছে পথপাশের নবস্নাত ঝলমল ঘাসেদের উপর।

আকাশের অন্য দিগন্ত জুড়ে রয়েছে তখনো কালো বজ্রমেঘ, এবং তা মোটেই কম অশুভ-সূচক নয়; কিন্তু এখন আর আমি তাকে ভয় পাই না। জীবন সম্পর্কে আশাব্যঞ্জক এক অবাক আনন্দের অনুভূত আমাকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে—তাড়িয়ে দিয়েছে আমার ভয়ের সেই দুঃসহ চেতনা। প্রকৃতির মতোই হেসে উঠেছে আমার আত্মা—তাজা ও প্রাণবন্ত।

ভাসিলি তার কোটের কলার উল্টে দিল, টুপিটা খুলে ফেলল, ঝেড়ে নিল। ভোলিয়া দাদা গায়ের চাদরটা ছুঁড়ে ফেলে রাখল। আমি ব্রিচ্‌কা থেকে ঝুঁকে পড়লাম বাইরে, সাগ্রহে প্রাণ ভরে টেনে নিলাম তাজা হাওয়ার গন্ধ। চমৎকার বর্ষাধোয়া ঝলমল গাড়ীটা—দুলতে দুলতে এগিয়ে চলেছে আমাদের আগে আগে···ঘোড়াগুলির পিঠটা, বল্গা, চাকার টায়ার—সবি ভিজা, ঝকমক ঝকমক করছে সূর্যালোকে—যেন নতুন পালিশ করা হয়েছে। রাস্তার একপাশ দিয়ে দিগন্ত-বিস্তৃত শীতকালীন গমের দিগন্ত-বিস্তৃত ক্ষেত। জায়গায় জায়গায় জলরেখার ঝিলিমিলি, ভিজা-মাটি ও সবুজ মিলে ঝলমল করছে—বহুরঙ একখানি গালিচার মতো, ছড়িয়ে রয়েছে দিগন্ত পর্যন্ত। অন্যদিকে, এক আসপেন বাগ—তলায় তলায় হ্যাজেল-বাদাম ও বুনোচেরীর ঝোপঝাড় দাঁড়িয়ে আছে শান্ত সুস্থ। যেন সুখ-স্বপ্নে বুঁদ হয়ে বর্ষাঝড়ে ধোয়া তার শাখাগুলি থেকে টলমল বৃষ্টিফোঁটাগুলি আলগোছে ঝরিয়ে দিচ্ছে—গত বছরের শুকনো পাতাগুলির উপরে। ঝুঁটিওয়ালা ভরতপাখীরা খুশির গানে উড়ে বেড়াচ্ছে চারদিকে, আর ঝুপ করে নেমে পড়ছে বারবার; আর ভিজা ঝোপঝাড় থেকে ভেসে আসছে ছোট ছোট চঞ্চল পাখীদের গান; বনের বুকের ভিতর থেকে কোথাও বেজে উঠেছে স্পষ্ট—কোকিলের গলার স্বর। এই বসন্তকালীন

ঝড়ের শেষে বনের সুবাস কী মন-মাতানো : বার্চের, ভায়লেটের, মরা পাতার, ভুঁইফোঁড়ের আর বুনো চেরীর ! আমি তো ব্রিচ্‌কার মধ্যে আর চুপ করে বসে থাকতে পারছি না—সিঁড়ি দিয়ে লাফিয়ে নামলাল, একদৌড়ে চলে গেলাম বনঝোপের দিকে। ফোঁটায় ফোঁটায় বৃষ্টিজল পড়া সত্ত্বেও আমি বার্ড-চেরীর কচি-কচি ডাল ভেঙ্গে নিলাম, আর তা আমার মুখে বুলিয়ে দিলাম, পান করতে লাগলাম তাদের আশ্চর্য সুবাস।

জুতোর যা দশা—কাদায় মাখামাখি, মোজা তো ভিজে জুবজুবে ! কাদার মধ্য দিয়ে ছপাৎছপাৎ ছুটে এলাম আমাদের গাড়ীটার জানালার সামনে।

'ল্যুবোচ্‌কা ! কাতেঙ্কা !' —কয়েকটা চেরীফুলের ডাল হাতে এগিয়ে গিয়ে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলতে লাগলাম—'এই দেখো না, কী সুন্দর !'

মেয়ে দুটি আঁৎকে উঠল—'আ !' আর মিমি—কাতেঙ্কার মা গলা ছেড়ে বলে উঠলেন আমাকে সরে যেতে, নইলে গাড়ী-চাপা পড়তে হবে নির্ঘাত। আমি কিন্তু সোল্লাসে চেঁচাচ্ছি তখনো—'একবার দেখোই না তোমরা, কী মিষ্টি গন্ধ !'

## দুই

কাতেঙ্কা ব্রিচ্‌কাতে বসে ছিল আমার পাশেই, আর তার সুন্দর মাথাটি নিচু করে রাখছিল—যেন কত মনোযোগে নজর করে দেখছিল চাকার তলা দিয়ে ধাবন্ত ধূলোপথটাই। আমি তার দিকে তাকিয়ে রইলাম নিঃশব্দে। তার গোলাপী মুখখানিতে এই প্রথমবারই আমি বয়নী মেয়ে-সুলভ করুণ ভাব দেখে খুবি বিস্মিত হলাম।

'আমরা তো শিগগিরি মস্কো পৌঁছে যাচ্ছি !'—আমি বলছিলাম—'তা, সেটা কী রকম হবে তোমার মনে হয় ?'

'আমি জানি না।'—অনিচ্ছায়ই উত্তর দিল।

'কিন্তু তুমি ঠিক কি-রকমটি ভাবছ ? শারপুকভ্‌-এর চেয়ে তা বড় কিনা ?'

'কি ?'

'না, কিছু না।'

কিন্তু যে সহজাত বৃত্তি-গুণে কেউ অন্যের মনের ভাবনা তলিয়ে বুঝতে পারে, এবং যেটা কিনা কথাবার্তার মধ্যে নিয়ন্ত্রণ-সূত্রের মতোই কাজ করে—সেই গুণেই কাতেঙ্কা ঠিক বুঝতে পারল যে তার উদাসীনতা আমাকে ব্যথিতই করেছে : সে মাথা তুলে আমার দিকে ঘুরে বসল।

'তোমার বাবা তোমাকে বলেছেন আমরা নাকি দিদিমার ওখানে থাকব।'

'হ্যাঁ, দিদিমাই চাইছেন আমরা তাঁর কাছে থাকি।'

'তাহলে আমরা ওখানেই থেকে যাব ?'

'তাই তো! আমরা দোতলার এক আর্ধেটায়, তোমরা আর আর্ধেকে, বাবা থাকবেন পাশের ঘরে। তবে, আমরা সকলেই খানাপিনা করব দিদিমার সঙ্গে।'

'আমার মা বলেছেন তোমার দিদিমা নাকি ভয়ানক রাশভারী লোক এবং বদমেজাজীও।'

'না, না, তা নয়! প্রথমটায় অবশ্যি অমনটাই মনে হয়। হ্যাঁ রাশভারী বৈকি, তবে বদমেজাজী নয় মোটেই। বরং উল্টেটা, খুবি দয়ালু আর হাসি-খুশিও। দিদিমার জন্মদিনটিতে কী যে চমৎকার বলনাচ হয়েছিল আমাদের, যদি দেখতে একবার!'

'তবুও তাঁকে ভয় হচ্ছে আমার ; তাছাড়া, ভগবান না করুন যদি আমরা—' হঠাৎ থেমে যায় কাতেঙ্কা, কী ভাবনায় ডুবে যায় আবার।

অস্বস্তির সঙ্গেই জিজ্ঞেস করলাম—'কী হয়েছে তোমার ?'

'কিছু না।'

'নিশ্চয়ই কিছু! তুমিই তো বললে, ভগবান না করুন—'

'আর তুমি বলছিলে—দিদিমার ওখানে কী যে চমৎকার বলনাচ হয়েছিল!'

'হ্যাঁ, সত্যিই দুঃখ হচ্ছে—তুমি ছিলে না! কত যে অতিথি এসেছিলেন—শত শত! তারপর গান-বাজনা! জেনারেলরাও এসেছিলেন, আর আমি নেচেছিলাম।'—বর্ণনা করতে করতে হঠাৎ মাঝখানে থেমে গেলাম, বললাম—'কাতেঙ্কা, তুমি তো শুনছই না।'

'না, শুনছি। তুমি বলছিলে তুমি নেচেছিলে।'

'এত মনমরা কেন ?'

'সব সময়েই কেউ কি হাসিখুশি থাকতে পারে ?'

'কিন্তু সেই মস্কো থেকে ফেরার পর থেকেই এতটা বদলে গেছ! সত্যি করে বলো তো'—কথাটা বার করবার মতো সঙ্কল্পের দৃষ্টিতে তার মুখের দিকে চেয়ে যোগ করে দিলাম—'কি কারণে তুমি এমন অদ্ভুত হয়ে উঠেছ ?'

'আমি অদ্ভুত ? না, মোটেই না।'—কাতেঙ্কা এমন জোরালো ভঙ্গীতে কথাটা বলল যে তাতেই ধরা পড়ল আমার মন্তব্য-প্রসঙ্গে সে উৎসুক।

'তুমি আর আগের মতো নেই।'—আমি বলতে লাগলাম—'আগে এটা স্পষ্টভাবেই ধরা দিত, আমরা সবকিছুই যেভাবে দেখে থাকি তুমিও তেমনটা

দেখবে—আমাদের দেখবে তুমি আত্মীয়ের মতো। আমাদের ভালোবাসবে, আমরাও যেমন ভালোবাসি তোমাকে। আর এখন? তুমি কেমন গম্ভীর, কাটা-কাটা—'

'না, আমি তা নই…'

'কথাটা আমায় শেষ করতে দাও?'—বাধা দিলাম। সবে আমি আমার নাকে কেমন এক শিরশির অনুভব করছি, আমার চোখে অশ্রু দেখা দেবার পূর্বাভাস। যখনি কোনো বহু-চাপা আন্তরিক ভাবকে প্রকাশ করতে যাই অমনটাই হয় আমার—'বলছিলাম কি, তুমি আমাদের থেকে দূরে দূরে থাকছ! একমাত্র মিমি মানে তোমার মা ছাড়া আর কারো সঙ্গেই মন খুলে কথা বলো না—আমাদের যেন উপেক্ষাই করছ।'

'তা, সব সময়েই তো একই রকম থাকা যায় না; কখনো কখনো বদলে যেতেই হয়।'—উত্তর দিল কাতেঙ্কা। যখন ও বুঝতে পারে না কী বলবে, তখন ও সব কিছুকেই ভাগ্যের সঙ্গে জড়িয়ে নিয়ে ব্যাখ্যা করে থাকে।

একবার, মনে আছে আমার—ল্যুবোচ্‌কার সঙ্গে ঝগড়ার সময় সে ওকে বলেছিল—'আচ্ছা হাবা তো!' আর, ও বলেছিল—'সকলেই তো বুদ্ধিমান হতে পারে না: কাউকে তো হাবা হতেই হবে।' কিন্তু ঐ ধরণের জবাব মাঝে মাঝে নিশ্চয়ই পাল্টানোটাও চাই তো; তাই ওতে আমি সন্তুষ্ট হলাম না। আবার জানতে চাইলাম—'হতেই হবে কেন শুনি?'

'তা, আমরা তো এক সঙ্গেই থাকছি না চিরদিন!'—বলতে বলতে একটুখানি রাঙা হয়ে উঠল কাতেঙ্কা; কোচোয়ান ফিলিপের পিঠটার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে বলতে লাগল—'আমার মা তোমার স্বর্গগতা মা-মণির সঙ্গে থাকতে পারত ঠিকই, তিনি তো মায়ের বন্ধুই ছিলেন; কিন্তু তোমার দিদিমার অর্থাৎ কাউন্টস-এর সঙ্গে কী করে যে মানিয়ে চলবে ভগবানই জানেন। সবাই তো বলছে তিনি ভয়ানক বদমেজাজী। তাছাড়া, যে কারণেই হ'ক আমাদের তো কোনো একদিন চলে যেতে হবেই। তোমরা তো ধনী—তোমাদের আছে পেত্রোভ্‌স্কোয়ে-র জমিদারী; আর আমরা তো গরীব—আমার মা-মণির তো কিছুই নেই।'

তোমরা ধনী: আমরা গরীব! এই কথা কয়টি, এবং তারি সঙ্গে বিজড়িত ভাব-ভাবনা আমার কাছে মনে হ'ল একান্তই অদ্ভুত কিছু। তখনকার দিনে—সেদিন পর্যন্তও আমি জানতাম একমাত্র ভিখারীরা বা চাষীরাই গরীব। আর

কাতেঙ্কার মতো মিষ্টি মেয়েকে—সুন্দরী মেয়েকে এই দারিদ্র্যের ভাব-ভাবনার সঙ্গে এমনকি কল্পনায়ও আমি জড়িয়ে দিতে পারছিলাম না। আমার তো মনে হয়েছে মিমি ও কাতিয়া যখন আমাদের সঙ্গেই থাকছে, আমাদের সঙ্গেই তো থেকে যাবে—অংশীদারও হবে সবকিছুরই। এর অন্যথা কিছু হতেই পারে না। এবার তাদের নিঃসঙ্গ জীবন সম্পর্কে শত সহস্র নতুন-নতুন ভাবনা—অস্পষ্ট ভাব-ভাবনা উদয় হতে লাগল আমার ভিতরে। আমরা ধনী, ওরা গরীব! আমার এমন দারুণ লজ্জা বোধ হতে লাগল যে সারামুখ আমার রাঙা হয়ে উঠল—কাতেঙ্কার মুখের দিকে আমি আর তাকাতেই পারছিলাম না।

আমি ভাবতে লাগলাম—'এর অর্থ কী: আমরা ধনী, ওরা গরীব? আর এ থেকেই বা কী করে আসছে: আমাদের ছাড়াছাড়ি হয়ে যাবে? আমাদের যা-কিছুই আছে সমান-ভাবে ভোগ করতে পারব না? তবে, আমি কিন্তু এটাও বুঝলাম যে এটা এমন একটা বিষয়—যে সম্পর্কে কাতেঙ্কার কাছে আমার কিছু বলাটা উচিত হবে না। আর, বাস্তবমুখী যে বৃত্তিটা ওই যুক্তি-সঙ্গত সিদ্ধান্তের বিপরীত দিকে ইতিমধ্যেই সঞ্চালিত হচ্ছিল, তা-ই আমাকে জানিয়ে দিল: ঠিকই বলেছে কাতেঙ্কা; আর আমার ভাব-ভাবনার কথাটা ওকে বুঝিয়ে বলাটাও যথাযোগ্য হবে না।

আমি জিজ্ঞেস করে বসলাম—'তুমি আমাদের ছেড়ে চলে যাবে, এ কি সত্যি? এ-ওকে ছেড়ে আমরা থাকব কী ক'রে?'

'তাছাড়া আর কী-বা হতে পারে? এটা তো আমাকেও আঘাত দিচ্ছে। তা, আমি কী করব ঠিকই জানি আমি।'

'তুমি তো অভিনেত্রী হবে! কী পাগলামি!'—মাঝখানেই বলে উঠলাম—জানি তো অভিনেত্রী হওয়াটা ওর চিরদিনের স্বপ্ন!

'না। ও সব বলেছিলাম, তখনো ছিলাম খুবি ছোট।'

'তাহ'লে, কী করবে?'

'আমি সন্ন্যাসিনী হব, থাকব গির্জাবাসে, ঘুরে বেড়াব কালো পোশাক প'রে—মাথায় মখমলের উঁচু-চূড়া টুপি!'—বলতে বলতেই কেঁদে ফেলল কাতেঙ্কা।

—আমার এই লেখা যারা পড়ছ তারা এমনটা কি কখনো লক্ষ্য করেছ: জীবনের কোনো একটি পর্যায়ে সবকিছুকে দেখবার দৃষ্টিভঙ্গীই পাল্টে যায় একেবারে অকস্মাৎ, যেন এতদিন যা-কিছুই দেখেছ শুনেছ—আচমকা তোমার

কাছে উদ্ঘাটিত করে দিল তোমার অজানা-অচেনা তার বিপরীত দিকটাই! এই ধরণেরই একটা নৈতিক পরিবর্তন প্রথম ঘটে গেল আমাদের এই ভ্রমণ-কালে। এবং এই সময়টাকেই আমি আমার কৈশোরের প্রারম্ভ বলে চিহ্নিত করে থাকি। আর, এটাও এই সর্বপ্রথম আমার মনে হ'ল: আমরা—আমাদের যে পরিবার—সেটাই দুনিয়ায় একমাত্র পরিবার নয়। আমরাই এমন-কিছু মধ্যবিন্দু নই—যাকে কেন্দ্র করে সকলের স্বার্থ-সম্পর্কই বিবর্তিত হচ্ছে। আছে অন্যরকমের জীবনও, এবং তা সেইসব লোকের—যাদের সঙ্গে আমাদের লেশমাত্র সম্পর্কও নেই, আমাদের নিয়ে যাদের মাথাব্যথা নেই, এমন কি আমাদের অস্তিত্ব সম্পর্কে কোনো ধারণাই নেই। এসব কথা যে জানতাম না তা নয়, কিন্তু এমন করে তো আর জানিনি কখনোই। আমি কখনো অনুভব করিনি।

কোনো ভাব-ভাবনা বিশ্বাসে পরিণত হয় কেবলমাত্র সুনির্দিষ্ট পন্থায়—সে পন্থা প্রায়শই হয় একেবারেই অপ্রত্যাশিত ও স্বতন্ত্র ধরণের; অন্য কোনো মন ঐ একই বিশ্বাসে উপনীত হতে পারে একেবারেই অন্যভাবে। কাতেঙ্কার সঙ্গে কথাবার্তা আমার উপর বড় প্রবল প্রভাব বিস্তার করল, তার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আমাকে ভাবিত করে তুলল—এবং ওই কথাবার্তাই হ'ল আমার ক্ষেত্রে ভাবকে বিশ্বাসে রূপান্তরিত করবার পন্থাবিশেষ—একমাত্র পন্থা। ঘোড়ার গাড়ীতে যেতে যেতে দেখছি: আমাদের পথের দু'পাশে গ্রাম ও শহর—যেখানে প্রতিটি বাড়ীতে বাস করছে অন্তত একটি করে পরিবার, আমাদেরি মতো। দেখছি: স্ত্রীলোকেরা ও শিশুরা মুহূর্তের ঔৎসুক্যে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে আমাদের ঘোড়ার গাড়ীগুলির দিকে, এবং যাদের আর কখনোই দেখতে পাব না। দেখছি দোকানদারদের, আর দেখছি পথপাশের কিষাণদের: আমাদের পেত্রোভ্স্কোয়েতে যেমন বরাবরই দেখে এসেছি তেমনি সাগ্রহে তো এগিয়ে আসছে না কেউই, এমনকি একবার চোখ মেলে দেখবার মতো সম্মানটুকুও দিচ্ছে না! আর, এইসব দেখতে-দেখতে এই প্রথমবারই মনে জেগে উঠল এক প্রশ্ন: আমাদের দিয়ে যদি ওদের কিছুই আসে না-যায় তো, কী নিয়ে আছে ওরা? আর, এই প্রশ্ন থেকেই জন্ম নিল অন্য কত প্রশ্ন: ওরা কেমন-ধারা জীবন যাপন করে, এবং কি উপায়ে? সন্তান-সন্ততিদের পালন করে কিভাবে? কোনোরকম শিক্ষাদীক্ষা দেয় কি,—না শুধু খেলাধূলো? কিরূপেই বা শাস্তি দেয়? এবং এমনি আরো কত না প্রশ্ন।

## ॥ ভালুক-শিকার ॥

[ নিম্নবর্ণিত অভিযানটি হয়েছিল তলস্তয়ের বয়স যখন ত্রিশ ]

আমরা ভালুক-শিকারের এক অভিযানে বেরিয়ে পড়লাম। আমার দোস্ত এক ভালুককে গুলি করেছে, কিন্তু গুলিটা লেগেছে কেবল মাংসে। বরফের উপর দাগ দেখা যাচ্ছে রক্তের, তবে পালিয়ে গেছে ভালুকটা।

আমরা বনের মধ্যে একত্র হলাম—স্থির করা দরকার আমরা কি এখনি ভালুকটার পিছু নেব? না, ভালুকটা কোথাও গিয়ে ঠাঁই নেওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করব দু-তিন দিন। ভালুক-খেদা কিষাণদের কাছে জানতে চাইলাম—সেদিনই ভালুকটাকে ঘেরাও করা সম্ভব কিনা।

'না। সম্ভব নয়।'—বলছিল বুড়ো ভালুক-খেদা—'ভালুকটাকে আগে কোথাও ঝিম মেরে বসতে দিতে হবে। পাঁচদিনের মধ্যেই ওটাকে ঘেরাও করা যাবে; কিন্তু এখনি যদি ওর পিছু নেন তো, ভয় খাইয়ে হটিয়ে দেবেন—কোথাও আস্তানা নেবে না।'

তখন এক তরুণ ভালুক-খেদা বুড়ো ভালুক-খেদাটির সঙ্গে যুক্তিতর্ক শুরু করে দিল। সে বলছিল—এখনি ওটাকে ঘেরাও করা সম্ভব। সে বলছিল—'এহেন তুষারের দিনে, বহুদূরে যেতেই পারবে না; সন্ধ্যার আগেই আস্তানা নেবে; আর তা-ও যদি না হয় তো, তুষার-জুতো পায়ে ঠিকই ধরে ফেলব।'

আমার সঙ্গী দোস্তটি কিন্তু ভালুকটার পিছু নেবার পক্ষে নয়, বুদ্ধি দিল অপেক্ষা করতে। তবে আমি বললাম—

'যুক্তিতর্কে দরকারটা কি? তোমরা তোমাদের মতো করো, আমি দামিয়নের সঙ্গে যাচ্ছি—ওর পথ অনুসরণ করতে। ভালুকটাকে যদি ধারে কাছে ঘেরের মধ্যে পেয়ে যাই, ভালোই; না পাই তো ক্ষতি নেই। এখনো খুব ভোরবেলা, আজ আর কিছু করবার মতো কাজও নেই।'

সেই ব্যবস্থাই হ'ল।

অন্য সবাই চলে গেল তাদের স্লেজগাড়ীতে, ফিরে গেল গাঁয়ে। দামিয়ান ও আমি কিছু রুটি খেয়ে নিলাম—থেকে গেলাম বনের পিছন দিকটায়।

আর সব সঙ্গীরা চলে গেলে দামিয়ন আর আমি আমাদের বন্দুক দুটো

পরীক্ষা করে দেখলাম, তারপর আমাদের গরম-কোটের তলার দিকটা বেল্টের মধ্যে গুঁজে নিয়ে রওনা হলাম—ভালুকের চলার পথ ধ'রে সোজা।

আবহাওয়া ছিল চমৎকার তুষার-ঝরা, শান্ত। তবে, তুষার-জুতো পরে চলাটা ছিল বেশ কষ্টকর। তুষার ছিল বেশ গভীর, এবং নরম ; বনের মধ্যে তা জমাট বাঁধেনি। তার উপর আগের দিনেই তুষার পড়েছে নতুন ক'রে। কাজেই আমাদের তুষার-জুতো পুরো ছয়-ইঞ্চি ঢুকে যেতে লাগল তুষারের মধ্যে, কখনো-বা তার চেয়েও বেশি।

ভালুকের চলাপথটা দেখা যাচ্ছিল দূর থেকেও, স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছিলাম কী ক'রে চলে গেছে ওটা : কখনো ডুবে গেছে পেট পর্যন্ত—খাবি খেতে খেতেই চলে গেছে। প্রথমটায় বড় বড় গাছের তলায়ও দেখেছি তার চলার দাগ। কিন্তু ছোট ছোট ফারগাছের ঝোপঝাড়ের মধ্যে পথ ঢুকেছে কি, থমকে দাঁড়িয়েছে দামিয়ন।

দামিয়ন বলে উঠল—'আমরা এবার ওর চলার পথ ছেড়ে যাব। ও রয়েছে সম্ভবত এখানেই কোথাও। তুষারের চেহারা থেকেই বুঝতে পারছ ভালুকটা চলেছে গুঁড়ি মেরে। ওর পথটা এড়িয়ে, ঘুরে যাওয়া যাক—কিন্তু খুব নিঃশব্দে। চেঁচিয়ে কথা বলবেন না, কাশিও নয়—না হ'লে কিন্তু ও ভয় খেয়ে চলে যাবে।'

ওর চলার পথ ছেড়ে আমরা ঘুরলাম বাঁ দিকে। কিন্তু পাঁচ-শ পা গিয়েছি কি, ডান দিকে আবার দেখা দিল ভালুকের চলার চিহ্ন। অনুসরণ করে এগোতে লাগলাম—এসে পড়লাম সড়কে। আমরা থেমে দাঁড়ালাম—ভালুকটা কোনদিকে গেছে পরখ করতে লাগলাম। এখানে সেখানে দেখা যাচ্ছে ভালুকটার চিহ্ন—থাবার, নখের, বা এমনি সবকিছুর। আর, এখানে সেখানে কিষাণের বাকল-জুতোর ছাপ। স্পষ্টতই ভালুকটা গেছে গাঁয়ের দিকে।

সড়ক ধরে চলতে চলতে দামিয়ন বলল—'সড়কটায় নজর রেখে এখন কোনো লাভ নেই। এখন রাস্তার পাশে পাশে তুষারের উপরকার চিহ্ন দেখে বুঝতে হবে ওটা ডানে গেছে, না বাঁয়ে। কোনোদিকে নিশ্চয়ই মোড় ঘুরেছে, কারণ গাঁয়ে যাবেই না।'

সড়ক ধরে আমরা মাইলখানেক এগোলাম, আর তারপরেই আমাদের সামনের দিকেই দেখি কি ভালুকের চলার পথ মোড় ঘুরেছে কিনা ডানে! চিহ্ন পরীক্ষা করে দেখতে লাগলাম। কী আশ্চর্য! এটা তো ভালুকের চলার দাগ ঠিকই—কিন্তু সড়ক থেকে বনের দিকে যায়নি তো, বরং বন থেকে-

এসে পড়েছে সড়কে! পথের নিশানা দেখাচ্ছে থাবার আঙুলগুলিই।

'এটা তা হ'লে আর একটা ভালুক?'—আমি বললাম।

দামিয়ন নজর করে দেখতে লাগল, বিবেচনা করে দেখতে লাগল। তারপর বলল—'না, ওটা ঐ ভালুকটাই। আমাদের নিয়ে খেলছে! সড়ক ছেড়ে পিছু হটেছে।' চলার দাগ ধরে এগোতে লাগলাম। তাই তো, সত্যিই! দশ-পা পিছিয়ে গেছে ভালুকটা, তারপর একটা ফারগাছের পিছনে এসে মোড় ঘুরেই—এগিয়ে এসেছে সোজা। দামিয়ন থেমে পড়ে বলে উঠল—'হ্যাঁ, এবারে নিশ্চয় নাগ'লে পেয়ে যাব। আমাদের সামনের দিকে রয়েছে একটা জলাজঙ্গল। ও নিশ্চয়ই ওখানে আস্তানা নিয়েছে। আসুন, ওদিকে ঘুরে যাই।'

আমরা ফারঝোপের মধ্য দিয়ে ঘুরে চললাম। তখন আমি খুবি ক্লান্ত হয়ে পড়েছি, পথ করে এগিয়ে চলাটা আরো কষ্টকর। আমি টলতে টলতে পড়লাম গিয়ে এক জুনিপার ঝোপের মধ্যে। আমার তুষার-জুতো আটকে পড়ল; সরু একটা ফারগাছ এসে পড়ল আমার দুই পায়ের মধ্যে,—অভ্যাস না থাকার জন্যে খুলে বেরিয়ে গেল আমার তুষার-জুতোর দু'টাই। আর তারপর, হুমড়ি খেয়ে পড়লাম তুষার-ঢাকা একটা গাছের গুঁড়ি বা কাষ্ঠখণ্ডের উপর! ভয়ানক শ্রান্ত এবার—ভিজে উঠেছি দরদর ঘামে। লোমশ কোটটা খুলে ফেললাম। দামিয়ন কিন্তু সমানে চলেছে এগিয়ে—যেন নৌকোয়ই চলেছে! তার তুষার-জুতো-জোড়া এগিয়ে চলেছে যেন আপন খুশিতে—কোনো কিছুতেই আটকে পড়ছে না, বা পিছনেও যাচ্ছে না! এমনকি সে আমার লোমশ কোটটাও কাঁধে ঝুলিয়ে নিল—আমাকে তাড়া দিতে লাগল এগিয়ে যাবার। আমরা এগিয়ে গেলাম আরো দু'মাইল, এসে পড়লাম জলাজঙ্গলটার অপর দিকে। আমি পিছিয়ে পড়েছিলাম। আমার তুষার-জুতো বারবার খুলে যেতে লাগল, হুঁচট খেতে লাগল পা দু'টা। আমার আগে আগে যেতে যেতে দামিয়ন হঠাৎ থমকে দাঁড়াল—হাত বাড়িয়ে ইঙ্গিত করল। আমি তার কাছে এসে পৌঁছতেই সে মাথা টা নিচু করে হাত বাড়িয়ে কিছু দেখাল, এবং ফিসফিস বলতে লাগল—'ঐ গাছগাছড়ার উপরে ঐ দেখছেন, ম্যাগপাই পাখীরা কিচিরমিচির করে চেঁচাচ্ছে! ওরা দূর থেকেই ভালুকের গন্ধ পায়। ঠিক ওখানেই আছে ওটা।'

আমরা ঘুরে চললাম আরো আধমাইল—আবার এসে পড়লাম ছেড়ে-আসা পথে। তাহলে, আমরা ভালুকটার ডান দিক দিয়ে ঘুরে এসেছি—যে পথ ছেড়ে এসেছি তার ঘেরের মধ্যেই আছে ভালুকটা। আমরা এবার থামলাম।

টুপিটা খুললাম, গায়ের সব পোশাক আলগা করে দিলাম। সর্বশরীর এতটা ঘেমে উঠেছে যেন স্নান করে উঠেছি, আর ভিজে এত জুবজুবে—যেন ইঁদুর-ডোবা হয়েছি! দামিয়নও লাল হয়ে উঠেছে, জামার খুঁট দিয়ে মুখ মুছছে। সে বলল—'তাহলে স্যর, আমাদের যেটুকু কাজ করেছি, এবারে বিশ্রাম।'

বনের মধ্যে ইতিমধ্যেই দেখা দিয়েছে সন্ধ্যার রক্তিমাভা। আমরা খুলে ফেললাম তুষার-জুতো, ওর উপরেই বসলাম। থলে থেকে নিলাম কিছু রুটি ও নুন। শুরুতে খানিকটা তুষার খেয়ে নিলাম, তারপরে খানিকটা পাউরুটি। পাউরুটিটা এত সুস্বাদু লাগল! মনে হ'ল সারাটা জীবনে আর কখনোই এরকমটা কিছু খেতে পাইনি। সন্ধ্যা নেমে আসা পর্যন্ত আমরা ওখানে বসেই বিশ্রাম করলাম, তারপর দামিয়নের কাছে জানতে চাইলাম—'গ্রামটা কি বেশী দূরে?'

দামিয়ন জানাল—'হাঁ, আট মাইল খানেক হবে। আজ রাতেই ওখানে পৌঁছব আমরা। লোমশ কোটটা পরে নিন, নইলে ঠাণ্ডা লেগে যাবে।'

দামিয়ন তুষারের উপরে শুয়ে পড়ল গা ছড়িয়ে,—কয়েকটা ফার-ডাল ভেঙ্গে শোবার জায়গা করে নিয়েছে। পাশাপাশি শুয়ে পড়লাম আমরা—বাহুর উপরে বিশ্রাম করছে মাথা। কী করে যে ঘুমিয়ে পড়লাম জানি না। দুঘণ্টা বাদে জেগে উঠলাম—কি-একটা ফেটে যাওয়ার শব্দে।

এত গভীর ঘুম থেকে উঠেছি যে ভুলেই গিয়েছি কোথায় আছি। চারদিকটায় তাকালাম। বাঃ, কী আশ্চর্য সুন্দর! আমি আছি যেন এক হলঘরের মধ্যে—ঝকমক করছে চারদিকটা, ঝলমল করছে থামগুলি! উপরের দিকে তাকিয়ে সূক্ষ্ম-পাতল শুভ্রজালের মধ্য দিয়ে দেখতে পাচ্ছি এক গম্বুজ নিকষ কালো—তার উপর রঙীন আলোর কারুকাজ। ভালো করে দেখতে দেখতে মনে পড়ল আমরা বনের মধ্যে এসেছি—আর যাকে মনে করেছি হলঘর ও থাম তা হ'ল তুষার-ঢাকা আর ঘন-কুয়াশা-ঘেরা গাছ। আর রঙীন আলোগুলি আকাশের তারা—ডালপালার মধ্য দিয়ে ঝিকমিক করছে।

রাতের তুষার জমাট বেঁধে আছে ধূসর-শাদা, কচিকচি ডালগুলিতে পুরু হয়ে লেগে আছে। দামিয়নের গায়েও জমেছে পুরু হয়ে, আর লোমশ কোটেও। টুপটুপ তুষার পড়ছে গাছপালা থেকেও। দামিয়নকে জাগিয়ে দিলাম; তুষার-জুতো পরে আমরা রওনা হলাম। বনবনান্ত স্তব্ধ শান্ত। কেবলমাত্র শোনা যাচ্ছে নরম তুষারের মধ্য দিয়ে চলা আমাদের তুষার-জুতোর শব্দ। আর মাঝে

মাঝে তুষার-ভারে কোনো ডাল ভেঙে পড়ার মরমর আওয়াজ—প্রতিধ্বনিত হচ্ছে বনবনান্ত। কোনো জীবন্ত-প্রাণীর আওয়াজ শুনতে পেয়েছি একটিবার মাত্র। কিছু একটা শচ্‌মচ্‌ করে উঠল আমাদের কাছেই, ঝট্‌পট্‌ ছুটে গেল। আমার মনে হ'ল ওই ভালুকটাই; কিন্তু ঐ শব্দের জায়গামতো গিয়ে আমরা দেখতে পেলাম কতকগুলি খরগোশের পায়ের ছাপ, আর দেখলাম কিছু আসপেন চারা-গাছের বাকল—দাঁতের আঁচড-কাটা। কয়েকটা খরগোশকে যাবার সময় আমরা ভয় খাইয়ে দিয়েছি।

সড়কে এগিয়ে এসে চলতে লাগলাম তুষার-জুতো পিছনে টেনে টেনে। হাঁটা এখন সহজ। শক্ত সড়কে আমাদের পিছুপিছু তুষার-জুতোগুলি এপাশ ওপাশ শব্দ করছে খটাখট। আমাদের জুতোর তলায় তুষারের কচর মচর। আমাদের মুখের উপরে জমে উঠেছে ধূসর-শাদা হিম-তুষার—তুলোর মতো। ডালপালার মধ্য দিয়ে দেখছি নক্ষত্ররা যেন ছুটে আসছে আমাদের দিকে—কখনো ঝিকমিক করে উঠছে, কখনো মিলিয়ে যাচ্ছে। সারাটা আকাশই যেন চলেছে এগিয়ে।

আমার সঙ্গীটি দেখলাম ঘুমুচ্ছে, ওকে জাগিয়ে তুললাম। ভালুকটার ঘেরে কী করে গেলাম তা বর্ণনা করলাম। আমাদের ভারপ্রাপ্ত পথপ্রদর্শক কিষাণটিকে বললাম খেদা লোকজনদের জোগাড় করতে, তারপর রাতের খাবার খেয়ে শুয়ে পড়লাম। এতটা ক্লান্ত যে সঙ্গীটি আমাকে জাগিয়ে না দিলে দুপুর পর্যন্ত ঘুম দিতাম একটানা। ধড়ফড় করে লাফিয়ে উঠলাম—দেখছি, ও আগেই তৈরী হয়ে নিয়েছে, এখন তার বন্দুকটায় কিছু করছে।

'দামিয়ন কোথায়?' জিজ্ঞেস করলাম।

'বনে চলে গেছে, বহু আগেই। তুমি যে চলার চিহ্ন রেখে এসেছ তা ধরে চলে গিয়েছিল আগেই, তারপর ফিরে এসেছে। এখন গেছে সে খেদাদের খোঁজে।'

আমি হাত মুখ ধুয়ে পোশাক পরে নিলাম, বন্দুকে গুলি ভর্তি করলাম, তারপর স্লেজে উঠে রওনা হলাম।

এখনো চলছে তীক্ষ্ণ তুষারপাত। চারদিক নিস্তব্ধ। সূর্য তখনো অস্ত যায়নি। আমাদের মাথার উপরে ঘন কুয়াশা, আর ধূসর-শাদা তুষারে ঢেকে আছে সব কিছুই। সড়ক ধরে দু'মাইল চলে বনের কাছে আসতেই দেখলাম একটা খাদ থেকে উঠছে ধোঁয়ার কুণ্ডলী, এবং আমরাও এসে পড়লাম একদল কিষাণের কাছে—পুরুষ ও মেয়ে দুরকমেরই। সশস্ত্র তারা, হাতে হাতে মোটা মোটা লাঠি।

আমরা এগিয়ে এলাম তাদের কাছে। পুরুষেরা আলু সেদ্ধ করছিল—আর

হাসতে হাসতে কথা বলছিল মেয়েদের সঙ্গে।

দামিয়নও রয়েছে ওখানে; আমরা উপস্থিত হতেই ওরা দাঁড়িয়ে পড়ল। গতকাল আমরা যে চক্র এঁকে রেখেছি তার উপর দাঁড় করিয়ে দেবার জন্যে ওদের নিয়ে চলল দামিয়ন। সারি বেঁধে ওরা চলল সবাই—পুরুষ ও মেয়ে সংখ্যায় ত্রিশজন। তুষার এত গভীর যে আমরা ওদের দেখতে পাচ্ছিলাম কেবল মাত্র কোমর থেকে উপরের অর্ধেকটা। ওরা বনের দিকে মোড় ঘুরল, আর আমি ও আমার বন্ধু চললাম ওদের পথে পথে।

চলার পথটা স্পষ্ট থাকলেও, এগিয়ে চলাটা দুঃসাধ্য হয়ে উঠল; তবে, পড়ে যাবার ভয় নেই বটে। এ যেন দুটো দেয়ালের মধ্য দিয়ে হাঁটার মতন।

এভাবেই চলতে লাগলাম আধ মাইল খানেক, আর তখন হঠাৎ দেখি দামিয়ন অন্যদিক থেকে আসছে—তুষার-জুতো পায়ে ছুটে আসছে, তার সঙ্গ নেবার জন্যে ইশারা করছে। আমরা তার দিকে গেলে সে দেখিয়ে দিল কোথায় কোথায় আমাদের দাঁড়াতে হবে। আমি আমার জায়গামতো দাঁড়িয়ে চারদিকটা দেখতে লাগলাম।

আমার বাঁয়ে লম্বা লম্বা ফারগাছ—তাদের গুঁড়ির মধ্য দিয়ে দেখতে পাচ্ছি বেশ একটা পথ। আর, গাছের পিছনে দেখছি এক গোদাকে—কালো একখণ্ড দাগের মতো। আমার সামনেই গহন-ঘন এক চারা-ফারের ঝোপ—মানুষ-সমান উঁচু; ভারের চোটে ডালগুলি নেমে পড়েছে নিচে—তুষারের সঙ্গে আটকে আছে। এই ঝোপের মধ্য দিয়ে এগিয়ে গেছে একটা পথ—পুরু তুষারে ঢাকা, সোজা চলে এসে আমি সেখানেই দাঁড়িয়েছি। ঝোপটা বেড়ে গেছে আমার ডানদিকে, শেষ হয়েছে একটা ফাঁকা জায়গায় এসে। আর, সেখানেই দেখতে পাচ্ছি দামিয়ন দাঁড় করিয়ে দিচ্ছে আমার দোস্তকে।

আমার দুটো বন্দুকই পরখ করে দেখলাম—কোথায় দাঁড়ালে যে ঠিক হবে ভাবছিলাম। আমার তিন-পা পিছনেই ছিল একটা লম্বা ফারগাছ। ভাবছি ঠিক ওখানটায়ই দাঁড়াব, তাহলে আমার দ্বিতীয় বন্দুকটাকে গাছে হেলান দিয়ে রাখতে পারব। গাছটার দিকে এগিয়ে গেলাম—প্রত্যেকটি পা ফেলার সঙ্গে সঙ্গে তা হাঁটু পর্যন্ত ডুবে যাচ্ছিল তুষারের মধ্যে। তুষার হটিয়ে দিতে দিতে দুই বর্গ হাতের মতো একটা জায়গা বার করে নিলাম—দাঁড়াবার মতো। একটা বন্দুক রাখলাম হাতে, অন্যটার ট্রিগার-টা টেনে গাছটাতে হেলান দিয়ে রাখলাম। এবারে খাপ থেকে তলোয়ারটা খুলে আবার ভরে রাখলাম—নিশ্চিত হতে চাই :

দরকার হলে সহজেই যাতে টেনে বার করতে পারি।

এসব প্রস্তুতি-পর্ব শেষ করতে না করতেই শুনি দামিয়ন চেঁচাচ্ছে—'উঠেছে রে! উঠেছে ভালুকটা!' দামিয়ন এই চিৎকার ছাড়তেই চক্রের সব কিষাণ-কিষাণীরাই সাড়া দিল তাদের নানারকম গলায়:

'ওঠ্, ওঠ্! এই এই!'—চিৎকার করছিল পুরুষেরা।

'আ, আ, আ!—চড়া পর্দায় চেঁচাচ্ছিল মেয়েরা।

ভালুকটা তো চক্রের মধ্যে। দামিয়ন তাকে তাড়িয়ে আনতে লাগল, আর খেদারা সবাই অবিরত চেঁচাতে লাগল। আমি ও আমার দোস্তই শুধু দাঁড়িয়ে আছি চুপচাপ। ভালুকটা আমাদের দিকেই আসবে—সেই প্রতীক্ষা করছি। একদৃষ্টে নজর করে দেখছি আর শুনছি, আর বুক টিপটিপ করছে ভয়ানক। হাতের মুঠোয় বন্দুকটা শক্ত করে ধরে কাঁপছি আমি।

ভাবছি: এই তো এখনি! হঠাৎ এসে পড়বে। আমিও তাক করেই গুলি ছুঁড়ব, আর ও পড়ে যাবে। আর হঠাৎ আমার বাঁ দিকে একটু দূরেই শুনলাম কী যেন পড়ে গেল তুষারের মধ্যে। লম্বা লম্বা ফারগাছের মধ্য দিয়ে চেয়ে আছি, আর দেখি কি হাত পঞ্চাশেক দূরেই গাছের গুঁড়ির আড়ালে কী একটা—যেমন বড় তেমনি কালো। তাক করে অপেক্ষা করছি। ভাবছি—আরো কাছে এগিয়ে আসুক না?

অপেক্ষা করছি আর দেখছি: কান দুটো নাড়াচ্ছে, ঘুরছে, পিছিয়ে যাচ্ছে। এবার তার সম্পূর্ণ দেহটাই দেখতে পেলাম এক পাশ থেকে। সে এক প্রকাণ্ড জানোয়ার। আমি তো উত্তেজনায় গুলি করলাম,—শুনতে পেলাম গুলিটা ফট্ করে বিঁধে গেল একটা গাছে। ধোঁয়ার মধ্য দিয়ে নজর করে দেখছি। আমার ভালুক তখন চক্র এড়িয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল গাছগুলির মধ্যে।

ভাবলাম—'তাহ'লে? আমার সুযোগটা তো হারালাম! ওটা আমার দিকে আর ফিরবে না। আমার দোস্তই ওকে গুলি করে মারবে, নয় তো খেদাদের চক্রের মধ্য দিয়েই পালিয়ে যাবে। যেদিক থেকেই হ'ক, আর একটা সুযোগ আমাকে আর দেবে না।' তা, বন্দুকটায় অবশ্যি আবারো গুলি ভরলাম। আমরা দাঁড়িয়ে পড়লাম নিঃশব্দে। চতুর্দিক ঘিরে হৈ-হৈ করছে কিষাণ-খেদারা। আর, ডানদিকেই আমার দোস্ত যেখানে দাঁড়িয়ে, সেখান থেকে বেশী দূরেও নয়,—একটি মেয়েছেলে প্রবল উত্তেজনায় চিৎকার করছে—'এই তো, এই তো এখানে! এখানে এসো, এখানে। ও ও! আ আ!'

স্পষ্টতই ভালুকটাকে দেখতে পেয়েছে। আমি তো ওর প্রতীক্ষা ছেড়েই দিয়েছি, ডানদিকে তাকিয়ে আছি আমার দোস্তের দিকে। হঠাৎ দেখি কি, হাতে এক লাঠি নিয়ে দামিয়ন ছুটে যাচ্ছে আমার দোস্তের দিকে—পায়ে নেই তুষার-জুতো। সে আমার দোস্তের পাশে গুঁড়ি মেরে বসল—হাতের লাঠিটার মাথাটা এগিয়ে। দেখছি: আমার দোস্ত তার বন্দুকটা তুলে ঐদিকেই তাক করছে। ক্র্যাশ্! গুলি ছুঁড়ল।

আমি ভাবলাম—'তা হ'লে ওকে মারল!'

কিন্তু দোস্ত যে ভালুকটার দিকে ছুটে গেল না—তাও দেখছি। স্পষ্টতই গুলিটা লাগেনি, কিংবা গুলিতে পুরোপুরি কাজ হয়নি।

আমি ভাবছি—ভালুকটা বেরিয়ে যাবে, ফিরে চলে যাবে; তবে আমার দিকে আর দ্বিতীয়বার আসবে না ঠিকই। কিন্তু—ওটা কি?

কী একটা ঘূর্ণীর মতো ছুটে আসছে আমার দিকে—ঘোঁৎ ঘোঁৎ আওয়াজ করতে করতে। আমার একেবারে কাছেই ছিট্‌কে পড়ছে উড়ন্ত তুষার।

সোজাসুজি আমার সামনের দিকে তাকাতেই সেই ভালুকটা! ঝোপের মধ্যে দিয়ে সোজা ধেয়ে আসছে—সোজা আমার উপর, স্পষ্টতই ভয়ে দিশেহারা। ওটা তখন বড়জোর হাত বারো দূরে। আমি দেখতে পাচ্ছি তার কালো বুকটা আর প্রকাণ্ড মাথাটা, উপরে কিছু লাল দাগ। ঐ তো, আমার দিকেই ঘুরপাক খেতে খেতে আসছে—তুষার ছিটকাচ্ছে। ওর চোখ দুটো দেখেই বুঝতে পারছি—আমাকে দেখেইনি। তবে, ভয়ে পাগ্‌লা হয়ে ছুটছে দিশেহারা। ঠিক আমি যে গাছটার তলায় দাঁড়িয়ে, সেদিকেই তার এগোবার পথ। আমিও গুলি করলাম বন্দুকটা তুলে। এখন ওটা এসে পড়েছে একেবারে আমার উপরে আর কি! কিন্তু লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছে গুলিটা, ওকে ছাড়িয়ে চলে গেছে। ও এমন কি আমাকে গুলি করতেও দেখেনি, তবু ধেয়ে আসছে সোজা আমার দিকে। বন্দুকটা নিচু করে গুলি করলাম—আবার ক্র্যাশ্। গুলিটা চলে গেল মাথাটা ঘেঁষে। গুলিটা লেগেছে ঠিকই, কিন্তু ওকে মারতে পারিনি!

ভালুকটা মাথাটা তুলল, কান দুটো পিছিয়ে নিয়ে আমার উপর ধেয়ে এল দাঁত বার ক'রে।

ঝট্ করে অন্য বন্দুকটা নিতে গেলাম, কিন্তু সেটা ধরতে না ধরতেই ওটা ঝাঁপিয়ে পড়ল আমার উপর—তুষারের মধ্যে আমাকে ঠেলে ফেলে চলে গেল আমার উপর দিয়ে।

আমি ভাবছিলাম—'ভাগ্য ভালো, আমাকে ছেড়ে গেছে।'

উঠতে চেষ্টা করছি, কিন্তু কী একটা আমাকে ঠেসে ধরছে নিচের দিকে, উঠতে বাধা দিচ্ছে। ধেয়ে আসার বেগে ভালুকটা আমাকে ছাড়িয়ে গিয়েছিল, কিন্তু ঘুরে দাঁড়িয়েই আমার উপর এসে পড়ল—দেহের প্রকাণ্ড ভারটা চাপিয়ে। অনুভব করছি, আমাকে ঠেসে ধরে তলিয়ে দিচ্ছে ভয়ানক ভারী একটা-কিছু, আমার মুখের উপরে লাগছে গরম কিছু-একটা। বুঝলাম, গ্রাস করছে আমার সমস্ত মুখখানাই। আমার নাকের দিকটা ইতিমধ্যেই চলে গেছে ওর মুখের মধ্যে,—ওর মুখের গরমটা অনুভব করছি, গন্ধ পাচ্ছি ওর রক্তের। আমার দুই কাঁধে ওর থাবা দুটো রেখে আমাকে ঠেসে ধরেছে, তাই নড়তেও পারছি না।

আমার নাক ও চোখের উপর ভালুকটা যখন দাঁত বসাবার চেষ্টা করছে, আমি বাঁচবার উদ্দেশ্যে আমার মাথাটা আমার বুকের মধ্যে গুঁজে ওর মুখ থেকে সরিয়ে রাখবার চেষ্টা করছি—কেবলমাত্র এইটুকু ছাড়া আর তো কিছুই করতে পারছি না। এবার আমি বুঝতে পারছি, নিচের চোয়ালের দাঁত দিয়ে ও আমার কপালটা কামড়ে ধরেছে চুলের তলা থেকে, আর উঁচু চোয়ালের দাঁত দিয়ে এঁটে ধরেছে চেখের তলার দিকের মাংস। আর, এর পরে ও বন্ধ করছে চোয়াল দুটো। কতকগুলি ছুরি দিয়েই কাটছে যেন আমার মুখখানা। ওকে ছাড়াবার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করছি, আর ওটাও তাড়াতাড়ি করছে চোয়াল দুটো এক করে এঁটে ধরতে—যেমন কামড়ে ধরে কুকুরে। আমার মুখখানা কোনো রকমে বাঁকিয়ে, ওর গ্রাস থেকে বার করে নিতে পারলাম; কিন্তু আবরো টেনে নিতে লাগল ওর মুখের মধ্যে। আমি ভাবছি—'এই তো আমার শেষ!'

তারপর মনে হ'ল আমার উপর থেকে উঠে গেল তার ভারটা, উপরের দিকে তাকিয়ে দেখি—ওটা নেই আর! আমার উপর থেকে লাফিয়ে নেমে, পালিয়ে গেছে।

আমার দোস্ত ও দামিয়ন যেই দেখতে পেয়েছিল ভালুকটা আমাকে ঠেলে ফেলে নাস্তানাবুদ করছে, ছুটে এল আমাকে রক্ষা করতে। আমার দোস্তটি তাড়াতাড়ি করতে গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ল, চলার পথ ধরে না এগিয়ে হঠাৎ ছিটকে পড়ল গিয়ে গভীর তুষারের মধ্যে। তুষার থেকে উঠবার জন্যে যখন সে মরি-বাঁচি করছে, ভালুকটা আমাকে আবার কামড়ে ধরছিল। কিন্তু দামিয়ন ঠিকই ধেয়ে আসছিল পথ ধ'রে—হাতে বন্দুক নেই, আছে কেবল একটা লাঠি। ছুটতে ছুটতে চেঁচাচ্ছিল—'বাবুকে খাচ্ছে, বাবুকে খাচ্ছে!

ছুটে আসতে আসতে ভালুকটাকে সে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলছিল—'ওঃ বোকা! কী করছিস রে? ছেড়ে দে, ছেড়ে দে!'

কী আশ্চর্য, ভালুকটা কথা শুনল! আমাকে ছেড়ে দৌড়ে পালিয়ে গেল। উঠে দাঁড়ালাম। তুষারের উপর এত রক্ত, যেন কাটা হয়েছে একটা ভেড়া। আর, খণ্ড খণ্ড মাংস ঝুলে ঝুলে নেমেছে আমার চোখের উপর; তবে আশ্চর্য যে উত্তেজনাবশে আমি কোনো যন্ত্রণাই অনুভব করছিলাম না।

আমার দোস্ত ইতিমধ্যে এসে গেছে আমার কাছে, অন্য সবাইও ঘিরে দাঁড়িয়েছে। আমার ক্ষতগুলি দেখছে; তার উপর তুষার লাগাচ্ছে। আমি কিন্তু আমার ক্ষতের কথা ভুলে গিয়ে শুধু জানতে চাইছি—'ভালুকটা কোথায়? কোন্‌দিকে গেছে?'

আর হঠাৎ শুনছি—'এই যে, এই যে ভালুকটা!'

আমরা সবাই দেখছি, ভালুকটা আবারো ধেয়ে আসছে আমাদের দিকে। আমরা চট্‌ করে বন্দুক তুলে নিলাম, কিন্তু কেউ গুলি করবার আগেই দৌড়ে পার হয়ে গেল ভালুকটা। এবার সে হয়ে উঠেছে ভয়ঙ্কর, আবারো দাঁত বসিয়ে দিতে চাইছে আমার উপর, কিন্তু, এত সব লোক দেখে ভয় খেয়ে গেছে। ওর চলার পথের দিকে তাকিয়ে দেখছি ওর মাথা থেকে রক্ত ঝরছে। আমরা ওর পিছু নিতে চাইছি, কিন্তু আমার ক্ষতগুলিতে খুব যন্ত্রণা হতে থাকায় আমরা বরং চলে গেলাম শহরের দিকে—ডাক্তারের সন্ধানে।

ডাক্তার আমার ক্ষতগুলি বেঁধে দিল রেশমী কাপড় দিয়ে। তাড়াতাড়িই শুকোতে লাগল ঘা।

একমাস পরে আবার আমরা গিয়েছিলাম ঐ ভালুকটাকেই শিকার করতে, কিন্তু আমি ওকে শেষ করবার সুযোগটা আর পেলাম না। চক্রের বাইরে ও আসতেই চাইছিল না, ঘুরপাক খেতে খেতে গর্জন করতে লাগল ভয়ঙ্কর।

দামিয়নই ওকে হত্যা করেছিল। ভালুকটার নিচের চোয়ালটা ভেঙে গেছে, আর ছিটকে বেরিয়ে গেছে একটা দাঁত—আমারি গুলিতে।

কী প্রকাণ্ড জানোয়ার! সারা গায়ে কী চমৎকার কালো কালো লোম!

আমিই ওটার চামড়াটা ছুলে মাল ঠেসে দিয়েছিলাম ভিতরে; এখন ওটা আছে আমারি ঘরে। আমার কপালের ক্ষতগুলি এমনভাবে সেরে গেছে যে এখন আর দাগও দেখা যায় না বড় একটা।

## * দিমিত্রাই মামিন-সিবিরিয়াক *

### ১৮৫২—১৯১২ খ্রী.

রাশিয়ার বাইরে নামজাদা লেখকরূপে পরিচিত না হলেও মামিন-সিবিরিয়াক সত্যই এক অতি-বিশিষ্ট লেখকের সম্মান পেতে পারেন। তাঁর সাহিত্যের বিষয়বস্তু বিশেষ করেই আপন অভিজ্ঞতার রাজ্যের; উরাল প্রত্যন্ত-অঞ্চলের জীবন-চিত্র ইনিই সর্বপ্রথম তুলে ধরেছেন সুদক্ষ কলমে।

প্রগতিশীল ভাবধারায় সহজ-পুষ্ট তাঁর রচনা। উরাল অঞ্চলের সামাজিক-অর্থনীতিক জীবনকে তিনি যেভাবে চিত্রিত করেছেন তাতে তাঁর রচনাবলী হয়ে উঠেছে বাস্তব-ধর্মী এবং যথার্থ প্রগতিশীল। আমাদের এই সংগ্রহের ছোট গল্পটি তাঁর উচ্চাঙ্গ কিশোর-রচনার পরিচয়: বনগ্রাম-জীবনের বহির্যোগ-বিরূপ ক্ষেত্রে কেমন করে নতুন জাগরণ ঘটে তারি সূচনা-চিত্রটি চমৎকার ফুটে উঠেছে এখানে। আকানিচ্ কাকা আর ঠাকুর্দা এই পরিবর্তনের দুই প্রান্তে প্রবীণ ও নবীন: পল্লীবালক পিম্কার কাছে তার আকু-কাকা হ'ল অপরিচিত জগতের সিংহদ্বার-স্বরূপ। পুরানো জীবন ও জগৎ থেকে নতুন দিন নতুন জীবন ও নতুন জগতে প্রবেশ করবার জন্যে পিম্কা উৎসাহে অধীর। পিম্কার প্রথম রেলগাড়ী দেখা কেবল দেখা নয়, অদেখা জীবন ও জগতের দূত-বাহনকে দেখা। রেলগাড়ী তার কাছে অজ-পাড়াগাঁয়ের সীমাবদ্ধ ও কুসংস্কার-সঙ্কীর্ণ জীবন থেকে মুক্তির আহ্বান। পিম্কাকে দেখে মনে পড়বে বিভূতিভূষণের 'পথের পাঁচালী'-র অপুকে।

দিমিত্রাই মামিন-সিবিরিয়াক জন্মগ্রহণ করেন উরাল পার্বত্য প্রদেশের নিশ নি-তাগিল অঞ্চলের ভাইসিম-সাইতাশ কারখানাঞ্চলে

—১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে; বাবা ছিলেন গীর্জা-পুরোহিত। বাল্যশিক্ষা পান ধর্মশাস্ত্র-শিক্ষালয়ে চার বৎসর, পরে চিকিৎসা-শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন পিটার্স'বুর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে; কিন্তু পাঠ শেষ করার আগেই বদলী হন আইন-বিভাগে এবং অর্থাভাবে পড়া ছেড়ে দিয়ে ফিরে আসেন জন্মভূমি উরালে ১৮৭৬-এ। লেখকের বয়স তখন চব্বিশ-পঁচিশ। সেই থেকে সুদীর্ঘ পনের-ষোল বৎসর (১৮৯১ খ্রী. পর্যন্ত) উরালে থেকেই সেখানকার অনগ্রসর জীবনের সামাজিক-অর্থনীতিক অভিজ্ঞতা অর্জন করেন ও তার ভিত্তিতেই রচনা করেন উপন্যাস-মালা: প্রাইভালভ-এর লাখ-লাখ টাকা; তিন-সীমান্ত; সোনা; রুটি; পাহাড়ী নীড়; বন্যসুখ; গল্পমালা: উরালের গল্প (১—৪ খণ্ড); সাইবেরিয়ার গল্প; আর আছে প্রবন্ধমালা। উপন্যাসে আঁকা হয়েছে খনিজীবন এবং বুর্জোয়া-জীবনের ব্যঙ্গচিত্র; পল্লীজীবনের ব্যাপক ও বাস্তব চিত্রগুলি হয়ে উঠেছে মহাকাব্যতুল্য। গণতান্ত্রিক জীবন-দর্শন ও বিপ্লবী আন্দোলনের দ্বারা উদ্বুদ্ধ ছিল লেখকের শিল্পী-মানস। উপন্যাস ও গল্পমালা ছাড়াও লিখেছেন উরালের ইতিহাস; এবং বিশেষ করে শিশু-কিশোরদের গল্প এবং তা মনস্তত্ত্ব-সম্মতরূপে বড়ই সুন্দর। এই সংগ্রহ-গ্রন্থে তারি একটি নমুনা দিয়েছি—'উরালের প্রত্যন্ত অঞ্চলে পিম্‌কা। [উল্লেখ্য, গল্পটি বাংলাভাষায় প্রথম অনুবাদ করেছিলাম—'শিশুসাথী' পত্রিকায়, ১৩৬১ খ্রী. অগ্রহায়ণ, ১৯৫৪ খ্রী.]

লেখকের সমগ্র রচনা প্রকাশিত হয় বারো খণ্ডে; প্রথম উপন্যাসের প্রকাশকাল ১৮৮৩, লেখকের বয়স তখন একত্রিশ বছর।

# ॥ উরালের প্রত্যন্ত অঞ্চলে পিম্‌কা

॥ ১ ॥

চুসোভি নদীর খাড়া উঁচু তীর। সেই তীরে বিস্তৃত যে বন—তারই বুকে একটি গাঁ, নাম শালাকিয়া···যানবাহনের সমস্ত পথই এসে থেমে গেছে এই শালাকিয়ার কাছে এসে—ওপারে আর পথঘাট নেই। মাইল বিশেক দূরে থাকেন এক পাদরী; একমাত্র তিনি ছাড়া কেউই এমুখো হন না কখনোই··· আর প্রত্যেকবারই এসে বিস্ময় প্রকাশ করতে থাকেন—গাঁয়ের সব লোকেরই পদবীটা কিনা 'শালায়েভ'!

'জনসংখ্যার বিবরণী-বহি'-তে আপনার নামটা এখন ঢুকোই কি ক'রে?'—জিজ্ঞেস করেন পাদ্রী—'এই দেখুন না, হাল সনে মরেছে তিনজন শালায়েভ, জন্মেছেও তিনজন শালায়েভ। গত বছরে মাত্রানাদের বেলায়ও হ'ল ঠিক তাই; মাত্রানা মারা গেল দুজন, জন্মালও দুজন!······'

'সেই মান্ধাতার আমল থেকেই ঘটছে এমনটা।' —বুঝিয়ে বলতে থাকেন এক বুড়ো '···আমার ঠাকুর্দার বাবাও ছিলেন শালায়েভ, আমরাও শালায়েভ···'

দূর থেকে ভারী সুন্দর দেখায় এই গাঁটা—বিশেষ ক'রে নদীর বুক থেকে। তীরে তীরে কুটিরের সারি—ঝলমল রোদে দেখা যায় ছবির মতো। গাঁটাকে ঘিরে ধরে আছে গহন-গভীর বন—সবুজ-রঙ্‌ পাঁচিল যেন! এই বনের কোলে-কাছের কুটিরগুলি দেখলে চোখ আর ফেরানো যায় না।

পিম্‌কাদের কুটিরটি এই নদীরই পারে পাহাড়ের গায়ে, জানালা দিয়ে দেখা যায় আঁকাবাঁকা নদী, ছুটে চলেছে দূর থেকে দূরান্তরে।

পিম্‌কা পড়েছে এই দশ বছরে। নিজের গাঁ ছাড়া আর কোথাও যায়নি সে, দেখেওনি আর কিছু। তবে গাঁয়ের সব লোকেই গাঁকে ভালোবাসে প্রাণের মতো—গর্ব করে গাঁ নিয়ে। তাই গাঁয়ের নওজোয়ানেরা নতুন সেনাদলে ভর্তি হয়ে যখন গাঁ ছেড়ে চলে গেল, কী কান্নাটাই না কাঁদল! সারাটা দুনিয়ায় বাস করবার মতো জায়গা যেন একমাত্র শালাকিয়া!

'আঃ, কান্না রাখ্‌ না, যত্‌ত সব হাবার দল!'—আকানিচ্‌ কাকা বলেছিল.

তাদের—'কাঁদছিস কেন, যমের ঘর করতে যাচ্ছিস না তো! তোরাই বরং পরিচিত হবি কত সব লোকের সঙ্গে, জানতে শুনতে পাবি কত কিছু! সারা জীবনটাই শালাকিয়ার এই বনে-বাদাড়ে প'ড়ে থাকায় এমন কী আর আরামটা বল্!'

পিম্কার ভারী ভালো লাগে এই আকু-কাকাকে। সবি জানে তার এই কাকা, আর এমন সুন্দর গল্প করতে পারে! এমন কি ঠাকুমার চেয়েও ঢের ঢের ভালো। ঠাকুমা তো জানে শুধু রূপকথা, সেই যে—'অনেকদিন আগে ছিল এক……'

পিম্কাদের মস্ত বড় পরিবার। কিন্তু সত্যিকার আয়-করিয়ে লোক শুধু দু'জন—বাবা ইয়াগোর আর কাকা আন্দ্রেই। মা সামলায় ঘরবাড়ী। বড় বোন দম্না, তার মাথা ঠিক নেই। ব্যাপারটা হ'ল: গরমকালে একদিন মেয়েরা সবাই বনে গিয়েছিল জাম কুড়োতে। দমনাও গিয়েছিল সঙ্গে। তখনো সে খুকীটি। তা, কেমন ক'রে সে দলছাড়া হয়ে পড়ল। সবাই তো চারদিক খুঁজে খুঁজে হয়রান। কিন্তু, কোথায় সে? তচনচ করা হ'ল গাঁয়ের বনবাদাড়, এবং শেষ পর্যন্ত এই সিদ্ধান্ত করা হ'ল যে, ভালুকেই তাকে ছিঁড়ে ফেলেছে খণ্ড খণ্ড ক'রে। তারপর, পাঁচদিনের দিন ঠাকুর্দাই খুঁজে পেল তাকে। একটা বার্চগাছ আঁকড়ে ধরে চুপটি করে দাঁড়িয়ে ছিল। বুড়ো তো কোনোমতে তাকে বাড়ী নিয়ে আসে আধমরা। সেই থেকেই দমনার মাথা ঠিক নেই। সব সময়েই চুপচাপ—তাকে যাই বলো না কেন! মা এসে বলে বলে করালে তবেই সে কাজ করে, এখনও যেন কচি খুকীটি!

গাঁয়ের ছেলেরা তাকে ক্ষেপাতে বেশ মজা পায়। তারা দলে দলে এসে চেঁচাতে থাকে—'এই দম্না, দম্না! নেকড়েটা হেসেছিল কেমন ক'রে রে! দেখা তো একবার!'

এই কথা যেই বলা, দমনাও হাসতে থাকে ক্ষ্যাপার মতো! চোখ দুটি ঘুরাতে থাকে গোলগোল ক'রে। ভয়ানক দেখায় তখন। দমনা নাকি একটা নেকড়ে দেখেছিল বনে, আর সেই নেকড়েটা নাকি তাকে অট্টহাসিতে ভয় দেখিয়েছিল।

শালাকিয়ার সব লোকেই কাজ করে বনে। পিম্কারা সকলেও। কেউ কাটে গাছ, কেউ বা টেনে নিয়ে আসে নদীর পাড়ে। কাজ খুব সহজ নয়। পিম্কা জানে সেও কাজ করবে—কাঠকয়লা তৈরীর কাজ। বাবাকে সে প্রায়ই বলে—

'বাবা কবে তুমি নিয়ে যাবে বনে?'

'সময় এল ব'লে, পিমকা! তখন তুইও বসে থাকবি না!'

পিম্‌কা দিন গোণে। তার মনে হয়, বনে কাজ করতে গেলেই সে বড় হয়ে উঠবে। পিম্‌কার শুধু একটিমাত্র ভয়, বনে দম্‌নার মতো তাকেও ভূতে না ধরে। সব সময়ে সাবধান থাকতে হবে, ভূতে পথ ভুলিয়ে না নেয়। ঠাকুর্দা কতবার সেই ভূতকে দীর্ঘশ্বাস ফেলতে শুনেছে ঘুটঘুটে অন্ধকারে। একবার এক মেয়েলোককে ওই ভূতেই মেরে ফেলেছিল ক্ষেত নিড়ানির সময়। সবচেয়ে ভয়ানক হ'ল সেই ভূতের বৌ—পেত্নীটা! থাকে সে চুসোভি নদীর জলে। এমন কি বড়রাও ডরায় তাকে। নদীর জলে তার দাপট শোনা যায় বহুদূর থেকে। গরমকালে ছেলেপিলেরা নদীতে চান করতে এলে খোঁজে খোঁজে থাকে সেই জল-পেত্নীটা—ফাঁক পেলেই জ্যান্ত ধরে নিয়ে যায় তার আস্তানায়। শালাকিয়া থেকে মাইল খানেক দূরে খাড়া-খাড়া পাহাড়ের মধ্যে আছে এক পুকুর। সেখানেই তার বাসা। সব্বাই জানে তা। বুড়ো ঠাকুর্দা তো স্বচক্ষেই দেখেছে তাকে। তবে, সে-সব কথা সে বলতে চায় না। পোড়া-কাঠের মতো কালো সে, সারাটা গায়ে ঝুলে ঝুলে আছে বড় বড় লোম! লাল দুটো চোখ—নেকড়ে বাঘের মতো! হ্যাঁ, একমাত্র আকানিচ্‌ কাকাই ভয় করে না সেই ভূতকে বা তার পেত্নীকে। এমন কি গভীর রাতেও সে মাছ ধরতে যায় সেই পুকুরে!

'বুঝলে পিম্‌কা, ঠাকুর্দা যা খুশি বলুক না!' পিম্‌কার কাছে আকানিচ কাকা বলে চুপি চুপি—'তা, তুমি কিন্তু ভয় করবে না, কাউকেই নয়। তা'হলেই আর ভয় পাবে না, কেমন?'

'আচ্ছা, সেই পেত্নীটা যদি আমার ঘাড় মটকে দেয়, তখন?'—পিম্‌কা জিজ্ঞেস করে বসে।

'তা, দেবে না। যদি দিতে আসে তো, সোজা মুখের উপর লাগাবে এক লাথি। আসলে, ভূতপেত্নী ওসব হ'ল বাজে কথা। অন্ধকার রাতে সে তোমার পিছু নেয়, বাঁশবনে গাববনে নিশ্বাস ফেলে—যত্‌তো সব আজগুবী কথা! হ্যাঁ, মেয়েদেরই ভয় দেখাক গে ওরা। তুমি কিন্তু কিছুকেই ভয় করবে না পিম্‌কা, তাহলেই ভয় পাবে না।'

শালাকিয়ার সবচেয়ে সুখের সময় হ'ল বসন্তকাল। দুহাত ফুলে উঠে বরফ-গলা নদী! শত শত নৌকো দুলতে থাকে নদীর বুকে। আর সারা গাঁটাই জড়ো

হয় তাই দেখতে। কত দেশে চলে যাবে ওইসব নৌকো—কত লোক সেই সব দেশে! ভাবতে থাকে পিম্‌কা। সমস্ত গাঁয়ের মধ্যে নৌকোয় চেপেছে একমাত্র আকানিচ্‌ কাকাই। তাই সে-ই শুধু বলতে পারে—নদীগুলি পাড়ে পাড়ে ঝাপটা মারে কেমন ক'রে, পাহাড়ের গায়ে ঘা খেয়ে কেমন করে মারা পড়ে নৌকো, কেমন করে ডুবে মরে লোকজন! দুনিয়ায় কত কীই যে জানবার আছে! সবই কিন্তু আকানিচ কাকার নখাগ্রে! নৌকোগুলি যে-সব জায়গায় চলে যায়, কী সুন্দর সুন্দর তাদের নাম! অনেক নামই একে একে বলে যায় আকানিচ্‌ কাকা।

'ঐ অঞ্চলটায় লোকেরা খুব ধনী। হুঁ, খুউব ধনী!' আকানিচ্‌ কাকা বুঝিয়ে বলতে থাকে—'যা-খুশি নিয়ে যাও—অমনি কিনে ফেলবে! নিতে দেরি আছে, কিনতে দেরি নেই! কাঠ, লোহা, তামা, পেতল, কাঠবেড়ালী, কুকুরছানা, মুরগী—যা তোমার খুশি! সেখানে বাড়ীঘর সব পাথরের, আর নদীতে চলে ষ্টিমার!'

॥ ২ ॥

পিম্‌কা তেরোতে পড়েছে। তারপর একদিন বাবা এসে বলল—'পিম্‌কা, এবার বনে কাজ করতে যাবার সময় হয়েছে। তুইও এখন থেকে মজুর হবি।'

সবে শীতের পথ পড়েছে বনের বুকে। পিম্‌কা তো ভারী খুশি। তৈরী করতে যাচ্ছে সে কাঠকয়লা। বনে ভূতপেত্নী আছে, তা সে বিশ্বাস করে না—তবে ভালুক আছে ঠিকই। পিম্‌কার যদি ভয় করে, বলে না সে কাউকেই। কারণ, সত্যিকার মজুর কখনো ভয় পায় না। পিম্‌কার মা তার ভাবী মজুর-ছেলের জন্যে তৈরী করে রেখেছে জামা—ভেড়ার চামড়ার কোট, হাঁটু অবধি পশমী মোজা, আর টুপি।

পিম্‌কাকে বিদায় দিতে ভারী কষ্ট হয় মার, কেঁদে ফেলে—'শোনো পিম্‌কা, ঠাণ্ডা লাগিও না যেন। তাঁবুতেই থাকবে, ভয়ানক হিম কিন্তু সেখানে।'

পিম্‌কা কিন্তু খুশিভরেই উত্তর দেয়—'আকানিচ কাকার সঙ্গে সঙ্গে থাকব আমি, সব জানে কাকা…কাকা আর আমি ভালুক শিকার করব।'

'বেশ তো, ক'রো! তা, তোমার নাক-কান যেন হিমে জমাট বেঁধে না যায়, সাবধান!'

'না না, ওকে রাখব রান্নার কাজে, গরম তাঁবুর ভিতর!'—বাবা বুঝিয়ে বলে

মাকে—'এখানে বাড়ীতে বসে থেকে হবেটা কী? বাইরে কত কাজ। ঘরকুণোর মতো ল্যাজ গুটিয়ে ব'সে থাকলে তো আর কাজ করা যায় না,—কি বলিস পিম্‌কা! তোর ঠাকুর্দা তোকে দেখে খুবি খুশি হবে। ঠাকুর্দা আর নাতি—বুড়ো আর বাচ্চা। তুই থাকবিও তাঁবুতে ঠাকুর্দারি কাছে কাছে।'

'বাবা, কিছুকেই ভয় করিনে আমি।'

'ঠিকই তো, ভয় করবি কেন? তুই তো মানুষের সঙ্গেই থাকবি মানুষেরি মধ্যে।'

কাঠকয়লা-কারখানার পথটা চলে গেছে বনের ভিতর দিয়ে। পিম্‌কা তো ভারী খুশি। ঠাকুর্দার হাতে-গড়া কাঠের শ্লেজগাড়ীতে চড়ে বনে চলেছে পিম্‌কা।

তুষার পড়া সবে শুরু হয়েছে সমস্ত বনে প্রান্তরে। ঝাউগাছগুলি সারি বেঁধে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঝিমুচ্ছে একের পাশে এক—ঠিক সেনাদলের মতো। বাবা গাড়ী চালাচ্ছিল আর মাঝে মাঝে বলছিল—'ঐ দেখ পিম্‌কা, খরগোশের চলাপথ। ঐ যে তুষারের মধ্যে ছোট ছোট দাগ চলেছে কেমন সুন্দর, দেখলেই ঠিক ধরতে পারবি। আর ঐ যে, ওই পাশ দিয়ে গেছে একটা শেয়াল, লেজ দিয়ে মুছে মুছে গেছে চলার দাগ!'

একটা জায়গায় এসে পিম্‌কার বাবা গাড়ীটা থামিয়ে নজর করে দেখতে লাগল আর একটা চলার দাগ: 'দেখ্, এই পথে গেছে একদল নেকড়ে—ঠিক একদল সেনাদলের মতোই সারি বেঁধে চলে গেছে, আগেরটার পায়ের দাগ ধ'রে ধ'রে। গেছে একে একে একদল, তবু পথের রেখা প'ড়ে আছে একটিমাত্র! এই বনেবাদাড়ে ওদের খাবার জোটে মেলাই, তাই ওরা এখানে খুব ভয়ঙ্কর নয়। খরগোশ, মুরগী, ছাগল, কত জীবই তো রয়েছে বনে! তবে, ওরা কিন্তু খুবি ধূর্ত!'

কাঠকয়লার কারখানায় এসে পৌঁছল সবাই রাতে। পিম্‌কা তো গাড়ীর ভিতরে গোল পাকিয়ে ঝিমুচ্ছিল খালি। জ্বলন্ত কাঠের আলো দূর থেকেই দেখা যাচ্ছিল স্পষ্ট। একপাশে চার-চারটে ঘর। তারি একটায় থাকে ঠাকুর্দা। পিম্‌কার বাবা ইয়াগোর থামল এসে সেখানেই। কিছুদূর থেকে দেখেই লিজ্‌কা-কুকুরটা অভ্যর্থনা জানাল ঘেউ-ঘেউ রবে। লিজ্‌কার ডাকে কুটির থেকে বেরিয়ে এল সকলেই।

'ইয়াগোর নাকি?'—ঠাকুর্দা ডাকে।

'হ্যাঁ আমি,...দেখো এসে, তোমার জন্যে এবার একটা নতুন উপহার

এনেছি···এই পিম্‌কা, পিম্‌কা! আয়, বাইরে উঠে আয়।'

আকানিচ্‌ তখন এগিয়ে গিয়ে গাড়ী থেকে বের ক'রে আনে পিম্‌কাকে। কিন্তু খোকার তো ঘুমই ভাঙে না। আকানিচ্‌ ঝাঁকানি দেয়। যা ভয়ানক শীত! ঠাকুর্দা তো নাতিকে দেখে মহাখুশি—'আসুন, আসুন আমাদের নতুন অতিথি বাবুটি! ভদ্দর লোকটির মতো বসুন এসে। খুব ঠাণ্ডা লেগেছে, না? একটু দাঁড়ান, গরমাগরম রুটি খেলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।'

বড় একটা ঘর। জানালা-কবাটের বালাই নেই। ঘরের পিছন দিকে দেবদারু কাঠের গোলা। ঘরের ভিতরে দোরের পাশেই পাথর দিয়ে তৈরী করা হয়েছে চুল্লী। ঘরের ছাতে একটিমাত্র ফুটো, তার ফলে ঘরে এমন ধুঁয়োর কুণ্ডলী যে তেষ্ঠানো দায়। দেয়ালে ও ছাতে ঝুলছে শুধু ঝুলের ঝালর। ধুঁয়ো গিলে গিলে পিম্‌কা তো কাশতে কাশতে দম বন্ধ হয়ে মরে আর কি!

'বলি, লাগছে কেমন?'—আকানিচ্‌ কাকা পিম্‌কাকে ক্ষেপাতে চেষ্টা করে—'তা ব'লে, ঠাকুর্দার কোলে উঠতে পাবে না কিন্তু!'

ভোরবেলা। পিম্‌কা কুটির থেকে বেরিয়ে এসে দেখে, কাজ চলছে পুরোদমে। ঠাকুর্দা বাড়ীর সামনে বসে ঘোড়া জুতছে নতুন স্লেজ-গাড়ীটায়। বনে কোথাও কাটা হচ্ছে গাছ, আওয়াজ শোনা যাচ্ছে স্পষ্ট। এক টা ফাঁকা জায়গায় ধুঁয়ো উড়ছে গোটা দশেক কাঠের স্তূপ থেকে। হপ্তা দুই ধ'রেই ঢিমিয়ে ঢিমিয়ে জ্বলছে কাঠ—ভালো কাঠকয়লা হবে। প্রত্যেকটা কাঠের স্তূপের পেছনেই আছে এক একজন কর্মকর্তা—সে-ই দেখাশোনা করে সব। কাঠের ভিতর অবধি পুড়ে গেলেই সব মাটি! কর্মকর্তাকে তাই দিনে রাতে তদারক করতে হয়। ঠাকুর্দা এহেন কর্মকর্তা ছিল পুরো চল্লিশটি বচ্ছর। এখন তারই জায়গা নিয়েছে পিম্‌কার বাবা।

পিম্‌কা তাঁবু-জীবনে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে প্রথম দিন থেকেই। খুব ভোরে ওঠা, যা জোটে তাই খাওয়া। তারপরে একটানা কাজ দুপুর নাগাদ। দুপুরে খেয়ে দেয়ে একটু জিরোনো, তারপর আবার কাজ—সন্ধ্যের শেষ আলোটুকু মুছে না যাওয়া পর্যন্ত। সব কাজই বেশ কষ্টসাধ্য—একমাত্র অভ্যস্ত লোকেরাই পেরে ওঠে এহেন কাজ। সবচেয়ে সাংঘাতিক অবস্থাটা হয় অন্ধকার তাঁবুর ভিতর। আর, আধপেটা খাবার খেয়ে কাটতে হয় দিনের পর দিন। রান্নাবান্নার আয়োজনটা পর্যন্ত বন্ধ থাকে।

## ॥ ৩ ॥

সবচেয়ে অগ্নিপরীক্ষার সময় হ'ল বড়দিনের পর্বের ছুটিটা। কাজ করা নিষেধ। অথচ দিনরাত অন্ধকার ঘরে একঠাঁয়ে বসে থাকা সত্যিই ভারী একঘেয়ে ব্যাপার। তাই বাইরে ফাঁকা জায়গায় এসে জ'মে বসে সবাই ; খুব বড় একটা আগুন জ্বেলে তার চারপাশে মণ্ডল হয়ে ওঠে গল্পে গুজবে। প্রধান বক্তা হয় আকানিচ্ কাকা। যোদ্ধা হয়ে একদিন সে ঘুরে এসেছে মস্কো, অন্য সবাইর দৌড় তো কাছের ঐ কারখানা পর্যন্ত! আকানিচ্ কাকাটি আবার আজগুবী কাহিনী পরিবেশন করতে ওস্তাদ।

'মিছে কথা বলবে না যোদ্ধা-ভাই!'—সঙ্গী মজুরেরা বলে রাখে।

'তা, মিছে বলব কেন? তোমরা কিছুই দেখোনি কিনা, তাই সবি ঠেকে অদ্ভুত। এই ধরো ষ্টীমারের কথা। সে এক বিরাট ব্যাপার। হাজার হাজার লোক চলে যেতে পারে তার পেটটার ভিতর ব'সে ব'সে। এই আমাদের সব গাঁটাই যেতে পারে। তারপরে রেলগাড়ী, সে আরও অদ্ভুত। বাজল বাঁশী, ব্যস্! চলে গেছ সে কোন্ রাজ্যে! এই রেলগাড়ীতে আরো বেশী লোক যেতে পারে, আর যেতে পারে জিনিসপত্তরের পাহাড়-পর্বত। চারদিকটা একবার চোখ ফেলে দেখবারও সময় পাবে না। আমাদের জিলা-শহর পর্যন্ত যদি রেল লাইন থাকত, পৌঁছে যেতে একটি ঘণ্টায়! আর এখন? ঘণ্টার পর ঘণ্টা যেতে হবে শামুকের মতো কাৎরাতে কাৎরাতে।'

'বাজে ব'কো না তুমি, যোদ্ধাভাই!'

'দেখো, কিছু যদি না বোঝো তো কথা বলি কেমন ক'রে?'

শুনতে শুনতে পিম্কারও মনে হয় আকানিচ্ কাকা মিছেকথা বানিয়ে বলছে। বিশেষ ক'রে শহরের জীবনধারার যা-সব কথা বলেছে—তা নিশ্চয়ই গালগল্প। পিম্কার ধারণা দুনিয়ার সব মানুষই কাঠ কাটে আর কাঠকয়লা বানায়। তবে হ্যাঁ, কত রয়েছে পাথরের দালান, পাথরের মন্দির, ষ্টীমার, রেলগাড়ী—আরও কত অবাক ব্যাপার!'

মজুরেরা মাঝে মাঝে আকানিচ্ কাকাকে নিয়ে মজা করে—'যোদ্ধাভাই, আকাশে চড়োনি? তা, ব'লে দিলেই তো হ'ল!'

আকানিচ্ এবার রেগে ওঠে, তর্ক লাগায়—'দেখো, তোমাদের কাছ থেকে চলেই যাব আমি। তখন বুঝবে? এর চেয়ে শহরে চলে যাব, কাজ নেব বড় এক ব্যবসায়ীর বাড়ীতে......পরব ধব্ধবে পোশাক, খেতে পাব পেটভরা

খাবার : মাছ-মাংস, চপ-কাটলেট···তার গন্ধেই তো জিভ দিয়ে জল পড়বে! তবে, সবচেয়ে ভালো হ'ল চা। সত্যি বলব কি, চা আমি সবচেয়ে ভালোবাসি।'

'তা, কেমন ক'রে তৈরী করে তোমার এই চা?'

'এক রকমের গাছগাছড়া, চীনদেশের।'

'চার সঙ্গে কি হলুদ বা নূন মাখিয়ে নিতে হয়?'

'কী যে বলো! তোমাদের নিয়ে কী যে করি? কিচ্ছু মাথায় ঢোকে না তোমাদের। চা খায় চিনি দিয়ে।'

'অন্যায়, এসব অন্যায় কথা। শুনলেও পাপ হয়!' —ঠাকুর্দা গশগশ করতে থাকে—'ধরো তোমাদের এই চা খেলাম, খেলাম তোমাদের চপ-কাটলেট, ঘুরতে লাগলাম রেলগাড়ীতে ষ্টীমারে—তখন কাজটা করবে কে? সব কঠিন কাজ থেকেই পালিয়ে গেলাম একে একে—আমি, পিম্‌কা, আমাদের গাঁয়ের সবাই,—তখন কাঠকয়লাটা করবে কে?'

'ঠাকুর্দা, তোমার কাঠকয়লার দরকারটা বা কী?'—আকানিচ্ কাকা বলতে থাকে—'সোজা মাটির তলা থেকেই পাওয়া যায় খনির কয়লা!'

'তোমাদের জন্যে কে সাজিয়ে রেখেছে সেখানে? আঃ, দেখো ভাই, আর একটা গুল মারলে তো!'

ঠাকুর্দা পছন্দ করে না এই আকানিচ্‌কে—মাঝে মাঝে তাড়িয়েই দিত এই আকানিচ্‌কে। গাঁয়ের কিষাণরা মাঝে মাঝে নালিশ জানাত বুড়ো ঠাকুর্দার কাছে—'ঠাকুর্দা, যোদ্ধাভাই বলে শহরে নাকি সবাই সিগারেট টানে—এমন কি নাক দিয়েও টানে!'

বুড়ো রাগে—'কী সব বকছ তোমরা! এসব কথা শোনাও মহাপাপ! আকানিচ্ কাজই করতে চায় না,—সেইটেই আসল কথা!'

আকানিচ্‌ও হারবার পাত্র নয়, বলে—'ঠাকুর্দা, শহরেও কাজ করে সবাই। তবে আমাদের কাজের চেয়ে ঢের ঢের সহজ আর সংক্ষেপ তাদের কাজ। আমাদের চেয়ে তারা কম খাটে, কখনো-বা বেশীও। প্রত্যেককেই সেখানে কাঠকয়লা আগলে থাকতে হয় না। আরো কত ব্যবসায় রয়েছে : কেউ বানায় তুলো, কেউ কাপড়, কেউ বা জুতো। কত লোক কাজ করছে কত কারখানায়।'

পিম্‌কা ভাবতে থাকে : মস্ত বড় দুনিয়াটা—সেখানে থাকে কত অজস্র লোক! কেমন তাদের জীবন-ধারা পিম্‌কা যদি দেখতে পেত সব! খুব সম্ভব, আকানিচ্ কাকা মিছে কথা বলেনি। সে বলেছে, এমন জায়গা আছে যেখানে

কখনো শীতই লাগে না—চিরবসন্ত! মস্তো বড়ো এক জানোয়ার আছে—একটা ঘরের মতো বড়ো। নাম তার হাতী। আকানিচ্ কাকার নিজচোখে দেখা!

তারপর হঠাৎ, নতুন একটা ব্যাপারে পিম্‌কার ঔৎসুক্য তৃপ্ত হ'ল:

সেদিন শীতের রাত। সব তাঁবুগুলি ঘুমে নিঝুম। ভয়ানক তুষার পড়ছে বাইরে। হঠাৎ স্তব্ধ রাত্রির বুক চিরে ধ্বনিত হ'ল লিজ্‌কার ক্রুদ্ধ ঘেউ-ঘেউ! এর পরেই উচ্চ কলরব। একদল লোক এসেছে নতুন রেল-লাইনের জন্যে জমি জরিপ করতে। শালাকিয়ার পথ ভুল ক'রে এসে পড়েছে এই বনে তাঁবুর কাছে।

যোদ্ধা আকানিচ্ কাকা অমনি সবেগে বেরিয়ে এসে অভ্যর্থনা করে আনল দলপতি ইঞ্জিনিয়ারকে—'আসুন, অনুগ্রহ ক'রে ভিতরে আসুন। দয়া ক'রে পদার্পণ করুন, স্যর! আপনাদের একটু সাহায্য করতে পারি তো ধন্যবোধ করব। এই এক্ষুণি উনুন ধরিয়ে জল গরম করে দিচ্ছি। আমাদের দোষত্রুটির জন্যে ক্ষমা করবেন।'

পিম্‌কা তার জীবনে এই প্রথম দেখল বিদেশী লোক। সে গেঁয়ো এক হাবার মতোই হাঁ করে তাকিয়ে রইল শুধু—এই নতুন লোকেরা যেন আর এক জগতের! সে লক্ষ্য করছিল—আকানিচ্ কাকা কীরকম বিনীত ব্যবহার করছিল ওঁদের সামনে, কথায় কথায়ই মাফ চাইছিল! ওদের যিনি দলপতি তিনি তো রেগেই উঠছিলেন—সবকিছুর উপরেই। কী বিশ্রী ঝুল ঝুলছে, কী বিদঘুটে ধুঁয়ো! পথ-প্রদর্শকের উপরেও মহাখাপ্পা—তার জন্যেই তো ভুল-পথে এসে পড়া।

'সত্যিই বড্ড বিশ্রী ধুঁয়ো হচ্ছে! তুষারও জমে উঠেছে সাংঘাতিক!···কিন্তু ক্ষমা করবেন আমাদের, আমরা তো এই বেঘাটেই থাকি বনে···এর চেয়ে ভালো ব্যবস্থা আর কী করতে পারি!'—আকানিচ্ বুঝিয়ে বলতে থাকে।

'তুমি সৈনিক ছিলে কখনো?'—দলপতি জিজ্ঞেস করেন।

'হ্যাঁ, স্যর! ···ম-স্কো গিয়েছিলাম। সত্যি কথা! আর এখানে? তা, মাফ করবেন—শুধু বন আর বন। আর অজ্ঞানতা!'

ভদ্রলোকেরা চা খেলেন, নিজেদের খানা বার করে খেলেন, তারপর ধূমপান করতে লাগলেন। পিমকা নিজেও চা চেখে দেখল। তার অর্থ কয়েকটা পাতা চিবিয়ে দেখল, আর বুঝল যে আকানিচ্ কাকা মিছে কথাই বলেছে। মিষ্টির লেশমাত্রও নেই—কালো-কালো তেতো পাতা কতগুলি!

দলপতি সারা সকালটাই গজগজ করছিলেন—ঘরে এ কী ঠাণ্ডা!

খাবার জলে যা দুর্গন্ধ! আর বেয়াড়া কুকুরের ঘেউ-ঘেউ! সবকিছুর উপরেই তাঁর রাগ। পিম্‌কা হা করে দেখে খালি। তার মনে হয়, তাকেও বুঝি লাগিয়ে দেবে এক ঘা। অবশ্যি, তেমন অঘটন কিছুই ঘটল না।

খুব ভোর-ভোর দলবল চলল এগিয়ে। আকানিচ্ কাকাও তাঁদের সঙ্গী হ'ল; কর্তাদের খুশি করবার জন্মে সে কী যে করবে কিছুই যেন বুঝে উঠছে না।

ঠাকুর্দা তাই দেখে মাথা নাড়তে নাড়তে বিড়বিড় করতে লাগল—'আস্ত এক সাপ! কুণ্ডলী খুলছে একে একে। বলি কি যোদ্ধা ভাই, তুমি তো আমাদের সবাইকেই পথে বসাবে!'

অতিথিরা চ'লে গেল। তাঁবুর সবলোক জড়ো হয়ে এবার আলোচনা শুরু করল। পিম্‌কার বাবা বলল—'যোদ্ধাভাই তো আগেই আমাদের বলেছে রেলগাড়ীর কথা। দেখলে তো ভাই, ফলে যাচ্ছে হাতে হাতে!'

গাঁয়ের লোকেরা তো অবাক, ভাবতে থাকে—বনের মধ্য দিয়ে রেলগাড়ী গেলে তাদের পক্ষে ভালো হবে কিনা।

ঠাকুর্দা গশগশ করতে থাকে—'রেললাইন দিয়ে দরকারটা কী? এ শুধু প্রশ্রয় দেওয়া···এ অন্যায়, এ পাপ! হায় ভগবান, এর আগেই মরলাম না কেন?'

॥ ৪ ॥

ঠিক তিনটি বছর পরেই শালাকিয়া গাঁয়ের পাশে দিয়ে চুসোভি নদীর বুকের উপর দিয়ে—দাঁড়িয়ে উঠল রেলপথের লোহার পুল! আর, যোদ্ধা আকানিচ্ হ'ল এই পুলের প্রথম সঙ্কেতদার অর্থাৎ 'কিনা সিগন্যালম্যান।

গোটা শালাকিয়াই এসে ভিড় করে দাঁড়াল প্রথম-রেলগাড়ী দেখতে। এমন কি ঠাকুর্দাও!

সুদূরে ধ্বনিত হয়ে উঠল প্রথম-রেলের বাঁশী! আনন্দে রোমাঞ্চিত হতে লাগল পিম্‌কার সর্বাঙ্গ।

দেখতে না দেখতে পাহাড়ের পেছনটা থেকে বেরিয়ে এলো রেলগাড়ী—প্রকাণ্ড এক লৌহ-অজগর যেন। আকাশে ছুঁড়ে মারল তার প্রথম চীৎকার, দ্বিখণ্ডিত করে ফেলল বনদেশের এতদিনকার পুঞ্জীভূত স্তব্ধতা। আকানিচ্ কাকা সামরিক কায়দায় সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে, হাতের নিশান উঁচিয়ে তুলে অভ্যর্থনা জানাল প্রথম রেলগাড়ীকে —'সাবাস্! সাবাস্!'

# * আন্তন চেখভ *

১৮৬০—১৯০৪ খ্রী.

জগদ্বিখ্যাত রুশ লেখক আন্তন চেখভ। তাঁর সাহিত্য-সৃষ্টির বিভিন্ন ক্ষেত্রে তীক্ষ্ণতার সঙ্গেই সহৃদয়তা, গভীর জীবন-চেতনার সঙ্গেই

সমবেদনা, আর সেই সঙ্গেই অকৃত্রিম সংস্কৃতি-বোধের পরিচয় সঞ্চারিত হয়ে আছে। বাস্তব জীবনের খণ্ডখণ্ড আশ্রয়েই বিচিত্র চরিত্র-সৃষ্টির দক্ষতায় ইনি রুশজীবনের অসঙ্গতি ও ভালোমন্দ চেতনাকে, এবং আসল ও নকল সংস্কৃতিকে বুঝবার মতো দৃষ্টি প্রয়োগ করেছেন দরদের সঙ্গে,—ব্যঙ্গ সমালোচনায় নয়, সুদক্ষ শিল্পীর মতোই অপ্রভাবিত ভাবে। তাই বিনা আড়ম্বরে জীবন ও চরিত্র-চিত্রগুলিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে অনায়াস সৌন্দর্য। এদিক থেকে চেখভ অতুলনীয়। ব্যক্তি মানুষটি চিন্তাশীল মানুষটি এবং শিল্পী মানুষটি এখানে একেবারেই একাত্ম—ত্রিবেণী-মিলনে একটু অসাধারণ। রূপরীতিতেও রচনাগুলি যেমন সংযত-বাঁধুন তেমনি নিখুঁত—তেমনি আবেগের ফেনিলতা বা নৈতিক শিক্ষাদানের অধীরতা থেকেও মুক্ত, সহজ-স্বাভাবিক।

ব্যক্তিগত জীবনে আন্তন চেখভ ছিলেন যেমন তীক্ষ্ণধী তেমনি মধুর-প্রকৃতি এক হৃদয়বান ব্যক্তি। চেখভের বিশেষ দরদ ছিল অবহেলিত ও দীন-দুর্বলের উপর,—তাদেরকেই তিনি সুন্দর করে এঁকেছেন বিচিত্র রচনায়: তাই একটা চাপা বেদনা ও আহত অনুভব ছড়িয়ে আছে অনেক রচনায়ই। হৃদয়বান লেখককে বিশেষভাবেই

প্রভাবিত করেছিল তখনকার (প্রাক-বিপ্লব) সাধারণ সমাজ-জীবনের বিষণ্ণ-ধূসর পরিবেশ; ব্যঙ্গ-লেখক বা বিপ্লবী-লেখক না হওয়ার জন্যে অন্যরকম জীবনাদর্শ বা জোরালো চরিত্র এঁর হাতে গড়ে ওঠা সম্ভব হয়নি।

আন্তন চেখভ জন্মেছেন আজভ-সাগরের তীরে তাগারোনভ-এ; বাবা ছিলেন ব্যবসায়ী—অবস্থা ছিল বেশ ভালোই। চেখভের প্রাথমিক শিক্ষা হয়েছে নিজেদের জিলা-শহরে, পরে মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ে। চেখভ লাভ করেন ডাক্তারী শাস্ত্রের সর্বোচ্চ উপাধি এম. ডি., কিন্তু সারাজীবন চিকিৎসায় লিপ্ত না হয়ে সাহিত্য-সাধনায় ব্রতী হন। সুদূর ক্রিমিয়ায় কলেরা রোগ মহামারী রূপে দেখা দিলে স্বেচ্ছাসেবক ডাক্তার-রূপে কাজ করেন নিষ্ঠাভরে এবং বহু শ্রম স্বীকার ক'রে। স্বাস্থ্য কোনোদিনই ভালো ছিল না—স্বাস্থ্য আরো ভেঙ্গে পড়ে।

লেখক রঙ্গমঞ্চ সম্পর্কে উৎসাহী ছিলেন: লিখেছেনও বেশ কয়েকটি নাটক; বিয়ে করেন রঙ্গমঞ্চেরই এক অভিনেত্রীকে।

চেখভের প্রথম দিকের গল্প 'হাসির গল্প' ছাব্বিশ বছর বয়সে লেখা, এবং এতেই তিনি প্রথম সাহিত্যিক খ্যাতি লাভ করেন। এই বইয়ের 'এই হ্যাঁচ্চো' (গল্পের মূলনাম 'কেরাণীর মৃত্যু')—ওই প্রথম দিককার রচনারই একটি সুন্দর নমুনা। ক্রমে ক্রমে চেখভ বিচিত্র রুশ-জীবন নিয়ে বহুমুখী রচনায় ব্রতী হন: লেখেন ছোটগল্প, বড়গল্প; নাটক; উপন্যাস; পত্রালোচনা। ছোটগল্পের বিশ্বখ্যাত স্রষ্টারূপেই তিনি সর্বাধিক প্রিয়: ছোটগল্প সংখ্যায়ও অজস্র—বারো খণ্ডে পরিবেশিত। তার মধ্যে বহু গল্পই প্রথম শ্রেণীর: যেমন—দুলালী,* *শিক্ষয়িত্রী,*স্কুলমাষ্টার,*দুঃস্বপ্ন,*চুম্বন,*কেরাস-গার্ল,*বিশপ; বড়গল্প পার্টি। নাট্যসাহিত্য চেরীকুঞ্জ, ভানিয়া কাকা। উপন্যাস 'আমার জীবন'*। বিশ্বসাহিত্যের কালজয়ী শ্রেষ্ঠরচনার রাজ্যে আন্তন চেখভ খুবি উচ্চ আসনে প্রতিষ্ঠিত—এবং বিশেষত তাঁর ছোটগল্প সাহিত্যের জন্যে।

---

* চিহ্নিত রচনাগুলি সম্পাদক-অনুবাদক কর্তৃক উনিশ শতকের চার-দশকে পরিবেশিত। দ্র. পৃথিবীর শ্রেষ্ঠগল্প, ১ম ২য় খণ্ড।

## ॥ এই হ্যাচ্চো ॥

সুন্দর এক রাতে নামজাদা কেরাণী ইভান চের্ভিয়াকভ অপেরার চশমা চোখে, অভিনয় দেখছিলেন স্টলের দুই নং সারিতে ব'সে। মঞ্চের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে তাঁর মনে হচ্ছিল, এই মর্তলোকে তাঁর মতো সুখী বুঝি আর কেউই নেই। আর, এমন সময় হঠাৎ…তা, 'হঠাৎ' শব্দটা হয়ে পড়েছে বড্ড একঘেয়ে, কিন্তু কী করা যায় বলুন। জীবনে এত সব বিস্ময়কর ব্যাপার ঘটে যে, ঐ শব্দটা ব্যবহার না করে উপায় নেই লেখকদের ! অতএব, হঠাৎ—ওঁর কুঁচকে উঠল কপাল, দুচোখ উর্ধ্বদৃষ্টি, শ্বাস অবরুদ্ধ…এবং অপেরার চশমাটা সরিয়ে নিয়েই, নিজের আসনের সামনের দিকটায় ঝুঁকে পড়ে—এই হ্যাচ্চো ! অর্থাৎ কিনা কেরাণীবাবুটি হাঁচলেন। হাঁচি দেবার স্বাধিকার অবশ্যি আছে সকলেরি, আর তা যেখানে তাঁর খুশি। কে না হাঁচি দেয়—চাষীরা হাঁচি দেয়; বড় দারোগা হাঁচি দেয়; এমনকি মন্ত্রীও হাঁচি দেয়, (যদিও তা মাঝেসাঝে)—অর্থাৎ কিনা হাঁচি দেয় সকলেই। কাজেই, ইভানবাবুও বিব্রত হলেন না মোটেই, পকেট থেকে রুমালখানা বার করে নাক মুছলেন। ভব্যসভ্য মানুষটির মতোই আশেপাশে তাকালেন। তা, কারুর কোনোরকম অসুবিধে হয়নি তো ? আর, তাকাতে গিয়ে বড়ই বিব্রত হয়ে পড়লেন কেরাণীবাবু। চোখে পড়ল—ঠিক সামনেই, প্রথম সারিতে বসে এক বেঁটেখাটো বৃদ্ধ,—দস্তানা দিয়ে টাক-মাথাটার উপরের দিকটা এবং ঘাড়ের দিকটা ভালো করে মুছে ফেললেন, আর কী যেন বললেন বিড়বিড় ক'রে। বৃদ্ধকে ঠিকই চিনতে পারলেন কেরাণীবাবু, তিনি হলেন বেসামরিক পরিবহন-দপ্তরের প্রধান—জেনারেল ব্রিঝালভ।

কেরাণী ইভান বাবু ভাবছেন—'সবনাশ, হেঁচে ফেলেছি ঠিক ওঁর মাথাটার উপরেই ! তাহ'লে ? উনি অবশ্যি আমার বড় সাহেব নন, তবু তো কাজটা খারাপ হ'ল। ক্ষমা প্রার্থনা করতে হয়।'

একটু কেশে ইভানবাবু সামনে ঝুঁকে পড়ে জেনারেলের কানের কাছে মুখ রেখে ফিসফিস করে বললেন—'ক্ষমা করবেন স্যর, হেঁচে ফেলেছি,…ইচ্ছে করে নয়।'

'হ্যাঁ, ঠিক আছে ,ঠিক আছে…'

'ঈশ্বরের ইচ্ছায় আপনি আমায় ক্ষমা করবেন, স্তর। আমি…মানে, ব্যাপারটা ঠিক ইচ্ছে করে হয়নি।'

'কী মুশকিল, থামুন দেখি, শুনতে দিন।' কেমন যেন বিমূঢ় হয়ে পড়লেন কেরাণীবাবু ইভান চেরভিয়াকভ, বোকার মতো হাসলেন। এবার মঞ্চের দিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে দেখতে লাগলেন অভিনেতাদের। দেখতে লাগলেন বটে, তবে নিজেকে আর ইহলোকের সবচেয়ে সুখী মানুষটি বলে মনে হ'ল না। অনুশোচনায় বুক তার ফেটে যাচ্ছিল, বিরাম-কালে চলে এলেন ব্রিঝালভের কাছে। একটু ইতস্তত করে সঙ্কোচটা খানিকটা কাটিয়ে উঠে আমতা-আমতা করে বলাটা শুরু করলেন—'দেখুন, ওই যে আপনার গায়ের উপর হেঁচে ফেলেছিলাম…আমাকে ক্ষমা করুন স্তর…মানে, আমি কিনা ঠিক ইচ্ছে করে করিনি…'

জেনারেল বললেন—'ও, সেই কথা…আমি তো ভুলেই গিয়েছিলাম। তা, কথাটা হচ্ছে, আপনি কি এমনি ঘ্যানঘ্যান করতেই থাকবেন?'—অসহ্য অবস্থাটার প্রকাশে বেঁকে উঠল নিচের ওষ্ঠটা।

ইভানবাবু কিন্তু সেদিকে এমনভাবে তাকিয়ে রইলেন যেন তাঁর বিশ্বাস হচ্ছে না। এই কেরাণীবাবুটির মনে হ'ল—'উনি তো বলে দিলেন ব্যাপারটা ভুলেই গিয়েছিলেন! কিন্তু কই, ওঁর চোখমুখ দেখে তো ভালো ঠেকছে না। আসলে, আমার সঙ্গে কথা বলতেই ওঁর আর মর্জি নেই। উঁহু, ব্যাপারটা ওঁকে তো বুঝিয়ে বলতে হবে যে ওটা আমি ইচ্ছে করে করিনি…ওটা হ'ল গিয়ে, এই যাকে বলে প্রাকৃতিক নিয়ম! তা নইলে, উনি হয়ত মনে করবেন আমি বুঝি ওঁর গায়ের উপর থুথুই ফেলতে চাইছিলাম। তা, এখনি সে কথা না ভাবলেও পরে যে ভাববেন না, তার বিশ্বাস কি!…'

বাড়ী ফিরেই ইভান চেরিয়াকভ স্ত্রীর কাছে খুলে বললেন তাঁর অভব্য আচরণের কথা। মনে হ'ল স্ত্রী যেন বিশেষ কোনো গুরুত্বই দিলেন না। প্রথমটায় তাঁর স্ত্রীও অবশ্যি খানিকটা ঘাবড়েই গিয়েছিলেন; যখন শুনলেন ব্রিঝালভ ওঁদের অফিসের কর্তা নন, নিশ্চিন্ত হলেন। তবু তিনি পরামর্শ দিলেন—'তা যাই হ'ক না, ওঁর কাছে তোমার ক্ষমা চাওয়া উচিত; নইলে উনি হয়ত মনে করবেন তুমি ভদ্রতাও জানো না।'

'ঠিকই বলেছ, ক্ষমা চাইতেই তো গিয়েছিলাম। উনি কিন্তু ভারী অদ্ভুত

ব্যবহার করলেন, যা বললেন কোনো মানেই হয় না। তখন অবশ্যি কথাবার্তা বলার সময় নয়।'

পরদিন চুলে ছাঁট দিয়ে নতুন একটি কোট গায়ে চাপিয়ে, ইভান চেরিয়াকভ অফিস যাবার সময় গেলেন ব্রিঝালভের কাছে—তাঁর বিগত আচরণের জন্যে একটা কৈফিয়ৎ দাখিল করবেন। জেনারেল ব্রিঝালভের বৈঠকখানা সরগরম দরখাস্তকারীদের ভিড়ে। উনি স্বয়ং উপস্থিত থেকে গ্রহণ করছেন সব দরখাস্ত। জনকয়েকের সঙ্গে সাক্ষাৎকার শেষ করে উনি চোখ তুলে চাইলেন চেরভিয়াকভের দিকে।

কেরাণীবাবুটি শুরু করলেন—'বলছিলুম কি স্যর, স্যরের বোধ হয় মনে আছে, কাল রাতে, সেই যে, আর্কাদিয়া থিয়েটারে আমি, আমি মানে হেঁচে ফেলেছিলাম, তার মানে হাঁচিটা এসে গিয়েছিল…দয়া করে ক্ষমা…'

'কী মুশকিল! আচ্ছা এক আহাম্মকের পাল্লায় পড়েছি তো!'—এই বলেই জেনারেল পরবর্তী লোকটিকে লক্ষ্য করে জিজ্ঞেস করলেন—'হ্যাঁ, আপনার কী চাই, বলুন?' ফ্যাকাশে হয়ে গেল ইভানবাবুর মুখখানা। ভাবলেন—'আমার কথাটা উনি শুনতেই চাইছেন না! তার মানে উনি চটে রয়েছেন। কিন্তু ওঁকে এরকম চটিয়ে রাখা তো ঠিক হবে না…ওঁকে ঠিক বুঝিয়ে বলাটা দরকার…'

সর্বশেষ দরখাস্তকারীটির সঙ্গে কথা শেষ করে জেনারেল ব্রিঝালভ তাঁর খাস-কামরার দিকে পা বাড়িয়েছেন কি, চেরিয়াভও তার পিছুপিছু বিড়বিড় করে বলতে লাগলেন—'ক্ষমা করবেন স্যর, আমার এমন আন্তরিক অনুশোচনা হচ্ছে যে আপনাকে আবারো বিরক্ত না করে পারছি না…'

ব্রিঝালভ তখন এমনভাবে চেরকিয়াভের দিকে তাকালেন, চেরকিয়াভ কেঁদে ফেলেন আর কি! জেনারেলটি হাত নেড়ে চেরকিয়াভকে ভাগিয়ে দিতে দিতে খেঁকিয়ে উঠলেন—'আমাকে নিয়ে তামাশা, না?'—কেরানীবাবুটির মুখের উপরেই বন্ধ করে দিলেন দরজা।

'তামাশা!'—চেরকিয়াভ ভাবতে লাগলেন—'এর মধ্যে তামাশার কী আছে? উনি নিজে একজন জেনারেল হয়েও কিনা কথাটা বুঝতেই পারছেন না! বেশ, ক্ষমা চাইতে গিয়ে ভদ্রলোককে আমি আর বিরক্ত করছি না। ও থাক গে! বরং একটা চিঠি লিখেই জানিয়ে দেওয়া যাবে, ব্যস্! তা এটা এখানেই শেষ—কখনো আর আসছিই না ওঁর কাছে।'

বাড়ী ফিরে যেতে যেতে ওই রকমেরই একটা চিন্তা চলছিল তাঁর মনে। তবে, চিঠি লেখাটা আর হয়ে উঠল না—শত ভেবেও কিছুতেই ভেবে পেলেন না কথাটা কেমন করে সাজাবেন। কাজেই ব্যাপারটার একটা শেষ ফয়সালার জন্যে পরের দিনই আবার তাকে যেতে হ'ল জেনারেলের কাছে।

জেনারেল সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকাতেই ইভান চেরিয়াকভ শুরু করলেন—'গতকাল আপনাকে একটুখানি বিরক্ত করতে হয়েছিল, তবে তার অর্থটা আপনি যেরকম করতে চেয়েছেন তা কিন্তু নয়! তামাশা করার কোনো মতলবই আমার ছিল না। সেদিন হেঁচে ফেলে আপনার যে অসুবিধে করেছিলাম, ক্ষমা চাইতে এসেছিলাম তার জন্যেই…আপনাকে নিয়ে তামাশা করব—এমন কথা আমার মনেই হয়নি। তা কখনো হয়! কোনো লোককে নিয়ে তামাসা করার ইচ্ছেটা একবার যদি পেয়ে বসে তো কোথায় থাকবে আমাদের মানসম্মান, আমাদের বড়বাবুদের প্রতি ভক্তিশ্রদ্ধা?…'

ক্রোধে বিবর্ণ, কাঁপতে কাঁপতে জেনারেল ব্রিঝালভ হুঙ্কার ছাড়লেন—'বেরোও, এক্ষুনি বেরোও।'

ভয়ে বিমূঢ় চেরাকিয়াভ, বলে উঠলেন—'আজ্ঞে?'

মেজেতে পা ঠুকে ফের চেঁচিয়ে উঠলেন ব্রিঝালভ—'এক্ষুনি বেরিয়ে যাও!'

চেরাকিয়াভের মনে হ'ল, হঠাৎ বুঝি তাঁর দেহের মধ্যে কিছু-একটা যন্ত্র বিকল হয়ে পড়েছে! কানের মধ্যে ভোঁ ভোঁ করছে, চোখে অন্ধকার দেখছেন। দরজা দিয়ে কোনোমতে পিছিয়ে গিয়ে, হোঁচট খেতে খেতে হাঁটতে স্বরু করলেন। কেমন আচ্ছন্নের মতো বাড়ী পৌঁছলেন, কোট গায়েই শুয়ে পড়লেন সোফার উপর: মরে গেলেন।

## ॥ একটি ঘটনা ॥

সকালবেলা। জমাট-বাঁধা তুষারের কী সুন্দর কারুকাজ জানালার শার্সিতে!

আর, তারি ভিতর দিয়ে ঝলমল রোদ এসে পড়েছে বাচ্চাদের শোবার ঘরটায়। ভানিয়ার বয়স ছয় বছর—তার মাথার চুল খাটো করে ছাঁটা, নাকটা তো একটা বোতামের মতো। আর তার বোন নীনা—বেঁটেখাটো মোটাসোটা, মাথাভরা কোঁকড়া চুল, বয়স চার। দুজনেই ঘুম থেকে জেগে উঠেছে, তাদের খাটের রেলিংয়ের মধ্যে দিয়ে খিটখিটে মেজাজে তাকাচ্ছে এ-ওর দিকে!

ধাইমা ভর্ৎসনার সুরে বলছে—'ওঃ, কী বদ ছেলে-মেয়ে রে, বাবা! ভালো ভালো ছেলে-মেয়েদের কখন খাওয়া হয়ে গেছে সকালবেলার খাবার, আর তোমাদের কিনা চোখ খুলতেই একবছর!'

সূর্যকিরণ খেলা করছে কম্বলের উপর, দেয়ালের উপর, আর ধাইমার গায়ের জামার উপর। খেলা করবার জন্যে বাচ্চাদেরকেও ডাকছে যেন, কিন্তু বাচ্চাদের কিনা সেদিকে খেয়ালই নেই। মেজাজটা খারাপ করেই জেগে উঠেছে ওরা। নীনা ওষ্ঠ দুটি ফুলিয়ে, রাগে কেমন একটা মুখভঙ্গী করল, তারপর বিশ্রী গলায় চেঁচিয়ে উঠল—'ধাইমা, খাবার কৈ, খাবার?'

ভানিয়া ভুরু দুটো কুঁচকে তুলল, ভাবতে লাগল কী বিষয় নিয়ে সে-ও ডাক ছাড়বে। চোখ দুটো কুঁচকে তুলে মুখ খুলেছে কি, সেই মুহূর্তেই বৈঠকখানা থেকে শোনা গেল মা-মণির গলা—'পুশিকে দুধটা দিতে ভুলো না, বাচ্চা দিয়েছে।'

ছেলেমেয়ে দুটির মুখের কোঁচকানো ভাবটা সহসা বদলে গিয়ে হয়ে উঠল মোলায়েম—অবাক বিস্ময়ে তাকাল এ-ওর দিকে। আর তারপরে দুজনে একই সঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল তারস্বরে, লাফিয়ে নেমে পড়ল যে-যার খাট থেকে। তাদের অবিরাম চিৎকারে চিরে যেতে লাগল চারদিকই। খালি পায়েই দৌড় লাগিয়ে দিল রান্নাঘরের দিকে,—গায়ে তখনো রাতের পোশাক।

চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলছিল তারা—'বাচ্চা দিয়েছে বেড়ালে, বেড়ালে বাচ্চা দিয়েছে!'

রান্নাঘরের বেঞ্চিটার তলায় রয়েছে ছোট্ট একটা বাক্স—উনুন ধরাতে হ'লে যেটাতে করে কয়লা আনে রান্নার ঠাকুর স্তেপান। বাক্সটার ভিতর থেকে উঁকি মেরে চেয়ে চেয়ে দেখছে বেড়ালটা। ওর মেটেরঙ মুখখানায় ফুটে আছে কী গভীর ক্লান্তি, ওর সবুজ চোখদুটির কালো-সরু রেখার মতো চোখের মণিতে কেমন বিহ্বল এক স্নেহ-দৃষ্টি······মুখখানা দেখে স্পষ্ট বোঝা যায় ওর সুখের ভাণ্ডার ভরে তুলতে বাকী এখন কেবল একজনের—নবজাতদের বাবার······ মিউ মিউ শব্দে ও ডাকতে চাইছে, মুখটিও হা করছে; কিন্তু গলা থেকে বার হচ্ছে কেবল হিস্ হিস্ আওয়াজ। শোনা যাচ্ছে বাচ্চাদের কুঁই কুঁই!

দুটি ভাইবোন পায়ের গোড়ালিতে ভর করে করে বাক্সটির দিকে এগোয়, নিশ্বাস এঁটে রেখে একদৃষ্টে তাকিয়ে দেখে বিড়ালটাকে, নড়ে না পর্যন্ত।······ অবাক হয়ে গেছে তারা, অভিভূত হয়ে পড়েছে,—ওদের পিছু পিছু ধাইমা যে গশ্ গশ্ করতে করতে এগোচ্ছে, শুনতেও পায়নি। দুজনের চোখেই ঝিলমিল করে উঠছে এক পরম আনন্দ।

শিশু-জীবনের শিক্ষায় ঘরপোষা প্রাণীরা যে নিঃসন্দেহেই একটা কল্যাণকর ভূমিকা গ্রহণ করে থাকে—সেটা বড় একটা আমাদের চোখেই পড়ে না। মহাশক্তিধর মর্যাদা-মহিম কুকুর, আলসে কোল-কুকুর, শিকল-পরা অবস্থায়ই মরে-যাওয়া পাখ-পাখালি, শান্তশিষ্ট বুড়ো হুলো—মজা করবার জন্যেই লেজটা জোরে মাড়িয়ে দিলেও বা অসহ্য যন্ত্রণা দিলেও যারা আমাদেরকে ক্ষমার যোগ্যই মনে করে,—তাদের সকলের কথা আমাদের কেই বা ভুলতে পারে? আমার তো বরং কখনো কখনো মনে হয় সহ্য-ক্ষমতা, বিশ্বস্ততা, ক্ষমায় আগ্রহ, আর নিষ্ঠার যেসব চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য আমাদের গৃহপ্রতিপালিত পশুপাখীরা দেখিয়ে থাকে—তা শিশুদের মনের উপর সুস্পষ্ট প্রভাব বিস্তার করে এবং তার সঙ্গে তুলনা করতে গেলে নিষ্প্রভ কোনো শিক্ষাদাতার দীর্ঘ-নীরস বক্তৃতা, বা জল যে অম্লজান ও উদজানের সম্মেলনে সৃষ্টি হয় তা বোঝাবার জন্যেই গৃহ-শিক্ষিকায় যে সব বাস্পোদগার তা ওর পাশে দাঁড়ায়ই না।

'কী ছোট ছোট, এত্তত্টুকু! ঠিক নেংটি ইঁদুরের মতো!'—বিস্ফারিত হয়ে ওঠে নীনার চোখ দুটি, হেসে ওঠে আনন্দে। ভানিয়া গুণতে থাকে—'এক দুই তিন—তিনটে বাচ্চা! তাহলে একটা তোমার, একটা আমার, আর কারুর জন্যে রইল আর একটাও।'

'ঘড়ড়্···ঘড়ড়্···'—মা গলা দিয়ে আওয়াজ বার করে,—ওরা যে নজর

করে দেখছে এতে ভারী ভালো লাগছে তার—'ঘড়ড়্...ঘড়ড়্!' বাচ্চাগুলোকে ওরা চেয়ে চেয়ে দেখে, বেড়ালটির গায়ের নিচ থেকে বাচ্চাদের বার করে নেয়—হাতে হাতে ছানাপিনা করে; এতে সন্তোষ হয় না, জামার উপরে তুলে নিয়ে দৌড়ে চলে ঘরের পর ঘর।

চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলতে থাকে দুজনেই—'মা, মা-মণি, বেড়ালে বাচ্চা দিয়েছে!'

মা বসে ছিলেন বৈঠকখানায় এক নতুন ভদ্রলোকের সঙ্গে। ছেলেমেয়ে দুটোই হয়ে আছে নোংরা, ঠিকমতো পোশাক নেই গায়ে, রাতের জামা দুহাতে উপরে তুলে-ধরা,—অমন অবস্থায় বাচ্চাদের দেখে মা তো থ হয়ে যান, ওদের দিকে তাকান কটমট ক'রে—'জামা নিচে নামাও, অসভ্য ছেলেমেয়ে! লজ্জা হয় না? যাও, দূর হয়ে যাও সামনে থেকে, নইলে যা শাস্তি পাবে—'

বাচ্চারা কিন্তু তোয়াক্কা করে না—মায়ের শসানিকেও নয়, নতুন এক আগন্তুকের উপস্থিতিকেও নয়। বেড়ালের বাচ্চা কটিকে গালিচার উপর ছেড়ে দিয়ে এমন হৈচৈ করতে করতে করতে চলে যায়, কানে তালা লাগে আর কি! বাচ্চাগুলি মিউমিউ করে জানাচ্ছে সকরুণ আবেদন, আর ভদ্রমহিলা ঘুরপাক খাচ্ছেন ওদের চারদিকে।

কিছু পরেই ছেলেমেয়ে দুটিকেই টেনে নেওয়া হ'ল ওদের ঘরে, পাঠ করানো হ'ল নিয়মিত প্রার্থনা, দেওয়া হ'ল সকাল বেলায় খাবার। আর ওরা, তখনি কিনা মণেপ্রাণে চাইছিল ওইসব বৈচিত্র্যহীন নীরস গদ্যের মতো কর্তব্য-কর্মের গণ্ডী থেকে যত তাড়াতাড়ি হয় বাইরে চলে যেতে—আবার গিয়ে হাজির হতে ওই রান্নাঘরেই।

ওদের দৈনন্দিনের অভ্যস্ত জীবনধারা ও খেলাধূলা সবি আজ সরে গেছে কোথায়!

দুনিয়ার আলোতে ওই বেড়ালের বাচ্চাগুলি দেখা দিয়ে ঢেকে ফেলেছে আর সব-কিছুকেই, এনে দিয়েছে আজকার দিনের এই মহা উৎসাহ ও উদ্দীপনা। নীনা বা ভানিয়াকে যদি এক-একটি বেড়াল ছানার জন্যেই দিতে চাওয়া হ'ত বিশসের রসগোল্লা বা একহাজার টাকা—তবু বিনা দ্বিধায়ই তারা কিনা প্রত্যাখ্যান করে বসত এমন লাভের ব্যাপার। ধাই-মা আর পাচকটি ধমকাচ্ছিল—বাধা দিতে চেষ্টা করছিল বারবার। হ'লে হবে কি, রান্নাঘরের বাক্সটির পাশে ওরা সেই যে বসে আছে তো বসেই আছে—দুপুরের খাওয়ার সময়টি পর্যন্তও ওদের নিয়ে মহাব্যস্ত। দুটি ভাই-বোনের চোখে মুখে কী একনিষ্ঠ ভাব, কী গভীর

মনোযোগ, আর কী উদ্বিগ্নতা! বেড়াল-ছানাগুলির এখনকার কথা নয়, বরং ওদের ভবিষ্যৎ নিয়েই বড় ভাবনা। শেষ পর্যন্ত দুই ভাইবোনে একটা সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছল—হ্যাঁ, একটা বাচ্চা থাকবে ওর মায়ের কাছে, মায়ের দুঃখকষ্টে সান্ত্বনা দেবে; একটা থাকবে তাদের গ্রীষ্মাবাসে, আর তৃতীয়টা থাকবে ভাঁড়ারের উপরে—ওখানে অনেক অনেক বড়ো বড়ো ইঁদুর পাবে।

'তা, ওরা আমাদের দিকে তাকায় না কেন রে?'—নীনা বিস্ময় প্রকাশ করে—'ওদের চোখ ভিখিরীদের মতো কানা কেন রে?'

এই জাতীয় প্রশ্নে ভানিয়াও ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে যায়। একটা ছানার চোখ সে ফোটাতে চেষ্টা করে—খুব জোরে চোখের উপর ফুঁ দেয়, কিন্তু কোনই কাজ হয় না এহেন অস্ত্রোপচারেও! দুজনেই বড় চিন্তিত হয়ে পড়ে একটা ব্যাপারে: বারবার সামনে এনে সাধাসাধি করা হচ্ছে, তবুও বাচ্চাগুলি দুধ বা মাংস খাচ্ছে না—কিছুতেই খাবে না। ওদের ছোট্ট ছোট্ট নাকের সামনে যা কিছুই এনে রাখা হচ্ছে, খেয়ে ফেলছে ওদের মা—মেটেরঙের ওদের মা-মণি।

ভানিয়া এবার প্রস্তাব করে—'বেড়াল-ছানাদের জন্যে আমরা ছোট্ট-ছোট্ট ঘরবাড়ী বানাব। নানাধরণের ঘরেই থাকবে ওরা, ওদের মা-মণি এসে দেখা করে যাবে।'

কার্ডবোর্ডে তৈরী কয়েকটা টুপির বাক্স সাজিয়ে রাখা হ'ল রান্নাঘরের কোণে-কানাচে, ভিতরে রাখা হ'ল এক একটি বাচ্চাকে। কিন্তু এই রকম আলাদা আলাদা ব্যবস্থাটা কেমন সময়োচিত মনে হ'ল না: চোখে মুখে মিনতিভরা ব্যথাভরা দৃষ্টি নিয়ে বেড়ালটা একের পর এক বাক্সের কাছে গিয়ে তার সব বাচ্চাদেরকেই নিয়ে এল ঠিক আগের জায়গাটায়।

ভানিয়া মন্তব্য করে—'আচ্ছা, বেড়ালটা তো ওদের মা, তা হ'লে ওদের বাবা কে?'

'হ্যাঁ, ওদের বাবা কে?'—নীনাও বলে।

'নিশ্চয়ই বাবা আছে কেউ।'

ভানিয়া ও নীনা দুজনে মিলে বহুক্ষণ ধরে স্থির করতে চায়—কে হবে ওদের বাবা। সিঁড়ির নিচের একটা কুলুঙ্গির মধ্যে অনেক অনেক ভাঙা খেলনার সঙ্গেই পড়ে ছিল ল্যাজ-নেই বড়সড় একটা কালো ঘোড়া,—শেষ পর্যন্ত পছন্দ হ'ল গিয়ে ওটাকেই। কুলুঙ্গিটা থেকে টেনে বার করে আনল ঘোড়াটাকে, দাঁড় করিয়ে দিল বাক্সটারই পাশে।

ঘোড়াটাকে অবাক করে দিয়ে ভানিয়া বলল—'বুঝলে তো, এখানেই দাঁড়িয়ে থাকবে ; বাচ্চারা যেন ঠিকমতো চলে তা দেখাশোনা করবে।'

এমনি কেবল বলাটাই নয়, করাটাও হ'ল বেশ ভারিক্কী ধরণে—দুটি ভাই-বোনের চোখে মুখে তখন কী ভাবনাচিন্তার ছাপ। বেড়াল-ছানাদের বাক্সটি ছাড়া আর কোথাও যে কোনো জগৎ আছে তা এখন আর ওরা মানতেই রাজি নয়। এখন কি আনন্দ ওদের! কখনো কখনো বা দেখা দেয় দুশ্চিন্তাও, কেমন এক অসহায় ভাব।

দুপুরে খাওয়ার আগে, ভানিয়া বসে আছে তাঁর বাবার পড়ার ঘরে। স্বপ্নালু চোখে তাকিয়ে আছে টেবিলটার দিকে। লণ্ঠনটার চারপাশে ঘুরঘুর করছে একটি বিড়াল-ছানা—স্ট্যাম্প-মারা কাগজপত্তরের উপর। ভানিয়া ওর গতিবিধিটা নজর করে দেখতে চাইছে : প্রথমটায় একটা পেনসিল এগিয়ে দিল ওর ছোট্ট মুখখানির মধ্যটায়, তারপর দিল একটা দেশলাই বাক্স......আর হঠাৎ, তখনি কিনা টেবিলের পাশে দাঁড়িয়ে ভানিয়ার বাবা স্বয়ং। 'এটা কি?—' ভানিয়া শুনতে পায় বাবার ক্রুদ্ধ কণ্ঠ।

'এটা...এটা, পুশির ছানা-মণি, বাপি!...'

'হ্যাঁ এটা তোমাকেই দিচ্ছি! তার আগে এই দেখো—কী করেছ, বদছেলে! আমার দরকারী সব কাগজপত্তর কী নোংরা করে ফেলেছ!' বাবা কেন যে ঠিক ভানিয়ার মতোই বিড়াল-ছানাগুলির কথা বলছে না—ভানিয়া তা বুঝে উঠছে না, অবাক হচ্ছে। উৎসাহিত না হয়ে আনন্দিত না হয়ে বাবা উল্টো কিনা তার কান ধরলেন! আর ঠাকুরকে বললেন কিনা—'এক্ষুনি দূর করে দাও এই নোংরাগুলোকে!'

দুপুরে খাবার সময়েও একটা দৃশ্য ঘটে গেল। দ্বিতীয়-দফা খাবার সময় হঠাৎ শোনা গেল জোরালো এক মিউমিউ শব্দ। কোত্থেকে আসছে শব্দটা? খুঁজতে খুঁজতে ধরা পড়ল শব্দটা আসছে নীনার ঢিলে-ঢালা আঙ্‌রাখাটার তলা থেকে।

বাবা ধমকে উঠলেন—'নীনা, এক্ষুনি চলে যাও টেবিল ছেড়ে।' ঠাকুরকে বললেন—'হ্যাঁ, সব ছানাগুলিকেই ফেলে দাও নোংরা খানাডোবাটায়। বাড়ীঘরে বিড়ালছানা থাকতে দেব না আমি!......'

ভানিয়া ও নীনা ভয় খেয়ে গেছে ভীষণ। খানাডোবায় ডুবিয়ে মারা? এ তো কেবল মৃত্যু নয়, মা-বেড়াল আর কাঠের ঘোড়া-বাবার কাছ থেকে তাদের

সন্তানদেরকেও ছিনিয়ে নেওয়া! তাছাড়াও, বেড়ালের বাক্সটা দিয়ে কী হবে তখন? ভবিষ্যতের সমস্ত পরিকল্পনাটাই তো ভেঙে পড়বে। তারা ভেবে রেখেছে: কী সুন্দর হবে ওদের ভবিষ্যৎ জীবন: একটি ছানা থাকবে মায়ের কাছে—তার সান্ত্বনার মতো, একটি থাকবে দেশের বাড়ীতে, আর অন্যটা কেমন সুন্দর ইঁদুর ধরবে ভাঁড়ার ঘরে তাকের উপরে! ভাইবোন দুজনেই কাঁদতে লাগল—মিনতি করতে লাগল বাচ্চাগুলিকে যেন রেহাই দেওয়া হয়। বাবা রাজি হলেন, তবে একশর্তে: ওরা দুজনে রান্নাঘরে যেতে পারবে না, আর ছানাগুলোকেও ছুঁতে পারবে না।

দুপুরের খাওয়া-দাওয়া হয়ে গেলে পর ভানিয়া ও নীনা ঘোরাফেরা করছে ঘরে ঘরে—বড়ই মনমরা হয়ে আছে। রান্নাঘরে প্রবেশ নিষেধের ব্যাপারটায় তারা বড়ই ভেঙে পড়েছে। কোনোরকমের মিষ্টিই খেতে রাজি হ'ল না—একটুও না। দুষ্টুমি করল খুব, রুক্ষ ব্যবহার করল মার সঙ্গেও। সন্ধ্যেবেলা তাদের মামা এলেন, দুজনেই তাঁকে একপাশে ডেকে এনে তাদের বাবার বিরুদ্ধে নালিশ জানাল—বাবা কিনা, বেড়ালছানাগুলিকে জলে ছুঁড়ে ফেলে মারতে চেয়েছিলেন।

ভাইবোন দুজনেই মামার কাছে যেন প্রার্থনা জানাতে লাগল—'মামা, মামণিকে বলে কয়ে ছানাগুলিকে আমাদের শেবার ঘরে এনে দাও না, মামা! মা-মণিকে বলো না?'

হাত দিয়ে ওদের সরিয়ে দিয়ে বললেন মামা পেত্রুশা—'ও, এই কথা! আচ্ছা? ঠিক আছে।'

এই মামা কখনো একা আসতেন না, বরাবরের মতোই সঙ্গে নিয়ে এসেছেন তাঁর 'নিরো'-কে। সে এক প্রকাণ্ড কালো-কুকুর, জন্মসূত্রে হল্যাণ্ডের: ঝুলে পড়েছে বড় বড় দুটো কান, ল্যাজটা কিনা লাঠির মতো শক্ত। কুকুরটি শান্তস্থির প্রকৃতির—ভাবখানা কেমন যেন বিষণ্ণ গম্ভীর; নিজের মর্যাদা সম্বন্ধে বড় সচেতন। এ বাড়ীর শিশু দুটিকে সে যেন দেখেও দেখে না; ওদের পাশ দিয়ে চলে যাবার সময় লেজ দিয়ে বাড়ি মেরে যায়—ওরা যেন মানুষ নয়, চেয়ার টেবিল! বাচ্চারা ওটাকে মনেপ্রাণে ঘৃণাই করে, কিন্তু বর্তমানের অবস্থাটা ভেবে মান-অভিমানের চেয়ে বরং বড় হয়ে উঠল বাস্তব বিবেচনার দিকটা। দু' চোখের দৃষ্টি মেলে ধরে ভানিয়া বলল—'শোন্ নীনা, আমি বলি কি—ঘোড়াটার চেয়ে বরং নিরো-ই হ'ক ওদের বাবা! ঘোড়াটা তো মরা, কিন্তু ও তো বেঁচে

আছে, বুঝছিস্ না!'

সারাটা সন্ধ্যা পর্যন্ত ওরা কেবল প্রতীক্ষা করছে—বাবা কখন গিয়ে তাস খেলতে বসবেন আর তখনি সম্ভব হবে নিরোকে নিয়ে রান্নাঘরে যাওয়াটা—কেউ দেখতে না পায় এমনভাবে। শেষ পর্যন্ত বাবা গিয়ে বসলেন তাস নিয়ে, মা ব্যস্ত কেৎলি নিয়ে—ছেলেমেয়েকে দেখছেনও না…

বহু আকাঙ্ক্ষিত সময়টি এইবার এসে উপস্থিত। 'আয়, চলে আয়, নীনা!'—ভানিয়া বলে বোনের কানে কানে।

আর, তখনি, মামা ভিতরে এসে বলে উঠলেন—'এই যে, নিরো ছানাগুলোকে খেয়ে ফেলেছে।'

ফ্যাকাশে হয়ে উঠল নীনা ও ভানিয়ার মুখ, তাকাল মামার দিকে। ভীষণ ভয় পেয়ে গেছে ওরা।

'খেয়ে ফেলেছে সত্যিই…' হাসতে থাকে ঠাকুরটা—'সোজা বাক্সটার দিকে এগিয়ে গিয়ে সব কটাকেই খেয়ে ফেলল গপাগপ্।'

বাচ্চা দুটি অপেক্ষা করে আছে: এ বাড়ীর সকলেই ঘাবড়ে যাবে—ঝাঁপিয়ে পড়বে খুনী নিরোটার উপর। কিন্তু, তা নয়। সকলেই চুপচাপ বসে আছে—যে-যার জায়গায়। কেবল মৃদু স্বরে বিস্ময় প্রকাশ করছে—প্রকাণ্ড কুকুরটার কী ভীষণ ক্ষিদে রে বাবা! বাবা ও মা তো হাসছেন। নিরোটা টেবিলের চারদিকে হাঁটছে, লেজ নাড়ছে, ওষ্ঠ চাটছে আত্মপ্রসাদে। একমাত্র মা-বেড়ালটাকেই দেখাচ্ছে অসুস্থ…ল্যাজটা উঁচিয়ে কেবল ঘুরঘুর করছে ঘরময়—সন্দেহের চোখে দেখছে সবাইকে, আর মিউমিউ করছে করুণভাবে।

'ভানিয়া! নীনা! নটা বেজে গেছে, এবার শুতে যাও!'—মা একটু উচ্চস্বরেই বলে উঠলেন।

শুতে গেল ভানিয়া ও নীনা, কাঁদতে লাগল। বহুক্ষণ তারা ভাবতে লাগল ক্ষতবিক্ষত মা-বেড়ালটির কথা, আর উদ্ধত-প্রকৃতি ওই নিষ্ঠুর নিরোটার কথা—তাকে কিনা শাস্তি দিল না কেউই?

## ॥ দুঃস্বপ্ন ॥

ইউনিয়ন বোর্ডের কায়েমী সদস্য কুনিন বছর ত্রিশের যুবক। পিটার্সবুর্গ থেকে তাঁর নিজের জেলা বরিসোভোতে পৌঁছেই তিনি সিঙ্কিনোর ধর্মযাজক ইয়াকভ্ স্মির্নভের কাছে অশ্বারোহী দূত পাঠালেন।

ফাদার ইয়াকভ এসে উপস্থিত হলেন। কুনিন গেটে তাঁর কাছে এগিয়ে গিয়ে বললেন,—'আপনার সঙ্গে দেখা হয়ে খুবই খুশী হয়েছি। এখানে কাজ করছি প্রায় এক বছর ; আরো আগেই যেন আমাদের পরিচিত হওয়া উচিত ছিল। সত্যিই, খুশী হয়েছি আমি। আপনি সানন্দে ভিতরে আসতে পারেন। কিন্তু… …আপনার বয়স তো খুবই কম মনে হচ্ছে!'—কুনিন্ বিস্ময় প্রকাশ করলেন,—'কত হবে?'

'আটাশ…' ফাদার ইয়াকভ আলগোছে কুনিনের বাড়ানো হাতে একটু চাপ দিয়ে বললেন এবং সঙ্গে সঙ্গেই কোনো কারণে রাঙা হয়ে উঠলেন।

কুনিন্ তাঁর আগন্তুক অতিথিকে পড়বার ঘরে নিয়ে গেলেন এবং তাঁকে আরো মনোযোগ নিয়ে দেখতে লাগলেন : কেমন বিশ্রী মেয়েলি মুখ!

ফাদার ইয়াকভের মুখে সত্যিই মেয়েলি আছে অনেক কিছু। উঁচু নাক, উজ্জ্বল লাল গাল, বড়ো বড়ো ধূসর-নীল চোখ, অদৃশ্য-প্রায় রেখার মতো ভুরুর টান, লম্বা লালচুল নরম-হাল্কা—নেমে এসেছে কাঁধ পর্যন্ত ; তারপর, ওষ্ঠের উপরে সবেমাত্র গোঁফের রেখা পড়েছে, সবে দেখা দিয়েছে সত্যিকার একজন পুরুষের গোঁফের সূচনা। আর, তার ছোট্ট দাড়ি কোনো-কম্মেরই নয়, গির্জার ছাত্রদের ভিতরে কোনো কারণে যাকে বলা হয় 'হাবার দাড়ি' : খুবি অল্পস্বল্প, একেবারে তলাটা দেখা যায় এমন ফাঁকা-ফাঁকা—আঁচড়ানো যায় না, চিম্‌টি কেটে ধরা যায়। দেহের এই সামান্য আয়োজনটুকুও সাত-পাঁচ গোছায়। ফাদার ইয়াকভ যেন যাজক সাজবার সঙ্কল্প ক'রে, গাম দিয়ে দাঁড়ি লাগাতে লাগাতে মাঝপথে বাধা পেয়েছেন হঠাৎ। তাঁর গায়ে একটা যাজকের পোশাক, উপরে কফির ফিকে দাগ, দুই কনুয়ের দিকেও বড়ো বড়ো ফুটো দাগ।

'রকমটি বেশ মজার তো!'—কাদা-মাখা পোশাক-প্রান্তের দিকে তাকিয়ে

ভাবতে লাগলেন কুনিন—'ভদ্রলোকের ঘরে বোধহয় এবারেই প্রথম এসেছে, ঠিকমতো সেজেগুজে আসতেও জানে না!'

'বসুন, ফাদার!'—একটা আরাম-কেদারা টেবিলের কাছে সরাতে সরাতে আতিথ্যের ভাবের চেয়ে বরং একটু হাল্কাভাবেই তিনি বললেন—'ব'সে নিন্।'

ফাদার ইয়াকভ মুঠোর মধ্যে কেশে চেয়ারের একেবারে কিনারায় এসে কেমন বিশ্রীভাবে বসে পড়লেন এবং খোলা দুইহাত দুই হাঁটুর ওপরে রাখলেন। তাঁর হ্রস্বদেহ, শুকনো বুক, ঘামতে-থাকা লাল মুখ—সমস্তটাই শুরু থেকে কুনিনের অপ্রীতি জাগিয়ে তুলেছে। কুনিন কোনোদিন ভাবতেও পারেন নি এমন মর্যাদাহীন এবং দীন চেহারার কোনো ধর্মযাজক থাকতে পারে! ফাদার ইয়াকভের ভাবভঙ্গীতে, তাঁর হাঁটুর উপরে হাত রাখায়, চেয়ারের এক কোণে যে বসে আছেন—তাতে পর্যন্ত মর্যাদার অভাব, এমন কি নীচতার স্পর্শ পর্যন্ত লক্ষ্য করলেন কুনিন।

'আপনাকে আমি কোনো কাজের প্রসঙ্গে আহ্বান করেছি, ফাদার!'—কুনিন নিচু-চেয়ারে গা এলিয়ে দিলেন,—'আপনারি একটা দরকারী কাজে সাহায্য করবার ভার নিয়েছি আমি···পিটার্সবুর্গ থেকে এসে টেবিলের ওপরে দেখি মার্শাল নোবিলিটি-র একটা চিঠি: ইয়াগোর দিমিত্রি'ভিচ্ জানিয়েছেন, সিঙ্কিনোতে অবৈতনিক চার্চ-স্কুল খোলা হ'চ্ছে, তার দেখাশুনোর ভার যেন আমিই নিই। ফাদার, আমি খুব খুশী হয়েই সমস্ত মনপ্রাণ দিয়েই······আমি এই প্রস্তাব খুব উৎসাহের সঙ্গেই গ্রহণ করেছি।' কুনিন উঠে ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে লাগলেন—'অবশ্যি, ইয়াগোর দিমিত্রিভিচ্ এবং সম্ভবত আপনিও জানেন যে আমার যথেষ্ট অর্থ নেই। বিষয়-সম্পত্তি সবি বন্ধকে গেছে, জীবন-সদস্য হিসেবে যে মাইনেটা পাই একমাত্র তাই দিয়েই আছি আমি। কাজেই, আপনারা খুব বেশী একটা-কিছু সাহায্য পাবার আশা করবেন না, আমার সাধ্যে যেটুকু কুলোয় করব···তাহ'লে কবে পর্যন্ত স্কুল খুলতে পারবেন ভাবছেন?'

'যখনি আমরা টাকা হাতে পাব।'—বললেন ফাদার ইয়াকভ।

'আপনাদের হাতে তো কিছু টাকা জমা আছেই?'

'নেই বলতে পারেন···কিষাণরা একটা সভায় ঠিক করল তারা প্রত্যেক বছরে তিন্'কপেক' করে দেবে। কিন্তু, জানেন তো, ঐ স্বীকৃতি পর্যন্তই। আর, প্রথম খোলার সময়ই আমাদের দরকার কমপক্ষে দু'শ রুব্‌ল।'

'আচ্ছা? কিন্তু, দুর্ভাগ্যের বিষয় যে আমার হাতে এখন অত টাকা

নেই!'—কুনিন দীর্ঘশ্বাস ফেললেন—'আমি বেড়াবার পথেই সবটা খরচ করে ফেলেছি, উপরন্তু ধারও করেছি। তাহ'লে? আসুন, দুজনে মিলে একবার ভেবে দেখি কোনো পথ করা যায় কিনা।'

কুনিন জোরে জোরে কথা বলেই উপায় ঠিক করতে লাগলেন। তিনি তাঁর মতামতটা বুঝিয়ে বলতে লাগলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে ইয়াকভের মুখে তাঁর সম্মতি বা একমতের ইঙ্গিত খুঁজে দেখছিলেন। কিন্তু সে মুখ উদাসীন অনড়—একটা চাপা লজ্জা ও অস্বস্তি ছাড়া কিছুই সেখানে প্রকাশ পেল না। ঐ দিকে তাকিয়ে যে কেউ ধারণা করতে পারত—কুনিন এমন দুর্বোধ বিষয়ের আলোচনা করছেন যে ফাদার ইয়াকভ কিছুই বুঝতে না পেরে শুনে যাচ্ছেন শুধু ভদ্রতার অনুরোধেই; তিনি যে বুঝছেন না তা ধরা পড়বার ভয়ে সন্ত্রস্তও হয়ে আছেন!

'লোকটি খুব বুদ্ধিমান-জাতের নয়, স্পষ্টই তা দেখা যাচ্ছে।'—কুনিন ভাবছিলেন,—'বরং, মুখচোরা এবং বেশরকম বোকাও।'

ট্রেতে করে দুগ্লাস চা ও ঝুড়ি-ভর্তি বিস্কুট নিয়ে একটা চাকর ঘরে ঢুকতেই ফাদার ইয়াকভও কিছুটা সামলে যেন তাজা হয়ে উঠলেন। এমন কি, তাঁর ওষ্ঠে দেখা দিল হাসিও। তিনি তাঁর গ্লাসটি নিয়ে তক্ষুনি এক চুমুক লাগালেন।

'আমাদের একবার বিশপের কাছে লেখা উচিত নয় কি?'—কুনিন্ উচ্চস্বরেই তাঁর ভাবনা প্রকাশ করতে লাগলেন—'সংক্ষেপে বললে, বোধহয় জানেন যে এই স্কুল খোলার প্রস্তাবটা এসেছে গির্জার প্রধান-কর্তৃপক্ষ থেকেই,—আমাদের কাছে থেকেও নয়, জিলাবোর্ডের দিক থেকেও নয়। তাদেরি কর্তব্য এখন টাকা জোগাড় করে দেওয়া। মনে আছে, পড়েছিলাম যেন, এই উদ্দেশ্যে কিছু টাকাও নির্দিষ্ট করে রাখা হয়েছে। আপনি কি এ বিষয়ে কিছু জানেন না?'

ফাদার ইয়াকভ চা-পানে এতটা আত্মহারা ছিলেন যে সঙ্গেসঙ্গেই এ প্রশ্নের জবাব জোগাতে পারলেন না। ধূসর-নীল চোখ দুটি কুনিনের দিকে তুলে এক পলক ভাবলেন, তারপর যেন প্রশ্নটি মনে করে, মাথা নেড়ে 'না' জানালেন। নেহাৎই পাকযন্ত্রীয় ক্ষুধার এবং সেই জাতীয় একটা আনন্দের ভাব ছড়িয়ে পড়ল তাঁর সমস্ত চোখে-মুখে; চা-পানের প্রত্যেক চুমুকের পরেই তিনি সাগ্রহে ওষ্ঠ দুটি চেটে নিচ্ছিলেন মুখের ভিতরে। তলার সব-শেষ ফোঁটাটি পর্যন্ত পান করে গ্লাসটা রাখলেন তিনি টেবিলের উপরে, এবং পরেই আবার তুলে নিয়ে তলার দিকটা খুঁজে দেখে সেটা টেবিলে রেখে দিলেন…আনন্দের আস্বাদটি মুছে গেল মুখের উপর থেকে।…তারপরে কুনিন দেখতে থাকলেন—তাঁর অতিথিটি ঝুড়ি

থেকে একটা বিস্কুট নিলেন এবং তার একটা টুকরো ভেঙে হাতে নাড়তে নাড়তে চট্ করে পকেটে পুরলেন।

'আচ্ছা? এটা তো ঠিক ধার্মিকের কাজ নয়!'—ঘৃণাভরে ঘাড় কুঁচকে ভাবছিলেন কুনিন—'এটা কি? যাজকীয় লোভ, না, ছেলেমানুষী?'

তিনি তাঁর অতিথিকে আর একগ্লাস চা খাওয়ালেন এবং গেট পর্যন্ত এগিয়ে গিয়ে বিদায় জানালেন, ফিরে এসে সোফায় হেলান দিয়ে বসলেন। ফাদার ইয়াকভের সঙ্গে দেখা হওয়ার প্রতিক্রিয়ায় নিজেকে ছেড়ে দিলেন তিনি অপ্রীতিকর ভাবনার স্রোতে:

গেঁয়ো অদ্ভুত জীব একটি! বিশ্রী, নোংরা, অভদ্র, অসভ্য এবং হয়ত মদও খায়!······হে ভগবান! আর, এ হ'ল ধর্মযাজক, আধ্যাত্মিক জগতের পিতা! এই হ'ল সবার শিক্ষক! প্রতিটি প্রার্থনার পূর্বে যাজক-সহকারী যখন বলেন,—'আশীর্বাদ করুন, মহান্ ধর্মপিতা!'—তখন তাঁর মুখে যে বক্রহাসি বেঁকে দাঁড়ায় তা আমি এবারে বেশ ভাবতে পারি। আঃ, কী চমৎকার ধর্মপিতা! মহান ধর্মপিতা! এক-কণা নেই যার সম্মান-জ্ঞান কি বংশ-মর্যাদা, আর স্কুলের ছেলের মতো যে বিস্কুট লুকোয়! ছোঃ!···হা ঈশ্বর, এমন একটি মানুষকে কাজ দেবার সময় বিশপ কি চোখ বুঁজে ছিলেন? এ হেন শিক্ষককে নিযুক্ত করলে তিনি সবার কাছ থেকে বেশী কী আর আশা করতে পারেন? এখানে এমন একজন চাই যে···

কুনিন ভাবতে লাগলেন রাশিয়ায় ধর্মযাজকের কি রকমটি হওয়া উচিত। যেমন, আমি নিজে যদি তাই হ'তাম···একজন শিক্ষিত ধর্মযাজক। যে তার নিজের কাজ ভালোবাসে, সে অনেক কিছুই ক'রে দেখাতে পারে।···এই স্কুল অনেক আগেই খুলে দিতাম। আর 'ধর্মবাণী'?—পুরোহিত যদি খাটি হয়, কাজের প্রেরণা যদি তার প্রাণ থেকেই আসে, তবে কী আশ্চর্য উদ্বোধনী বাণীই সে দিতে পারে!

কুনিন চোখ বুঁজে মনে মনে একটি বাণী খাড়া করতে লাগলেন, একটু পরেই টেবিলে বসে পড়ে তাড়াতাড়ি একটা লিখে ফেললেন। তারপর ভাবলেন,—ঐ লালচুলো লোকটিকে এটা দিয়ে দেব, গির্জায় পড়ে শোনায় যেন।

পরের রবিবার ভোরে কুনিন সিঙ্কোনোতে গাড়ী করে গেলেন স্কুলের বিষয়ে একটা সমাধান করতে, এবং সেখানেই যখন যাবেন, অমনি গির্জাটাও দেখে আসবেন—ঐ গির্জারি তো তিনি একজন অভিভাবক। পথের অবস্থা সাংঘাতিক

হ'লেও চমৎকার ছিল ভোরবেলাটা। আকাশে উজ্জ্বল সূর্য। এখানে ওখানে বরফ লেগে আছে শাদা পলেস্তারা। রক্তিম রশ্মিজাল ঢুকে তা গলে গলে যাচ্ছিল, আর মাটির বুক বেয়ে গড়িয়ে পড়তে পড়তে জলজল করছিল হীরকের মতো—তাকালে চোখ ঝলসে যাবে এমন। আর, এরই পাশ দিয়ে শীত-শস্যের চারাগুলি সবুজের ঢেউ তুলছিল মাঠের মধ্য দিয়ে। কাকেরা গর্বিত পাখায় ঘুরছে ফিরছে মাথা উঁচু করে; একটা কাক উড়তে উড়তে চট্ করে নেমে পড়বে এবং কয়েকবার লাফ দিয়ে তবেই সে পা স্থির করে দাঁড়িয়ে যাবে।··· কুনিনের গাড়ী দারু-নির্মিত গির্জাটার পাশ পর্যন্ত এসে থামল। গির্জার রং, পুরানো-ধূসর,—দোরের কাছের থামগুলি এক সময় শাদা ছিল, এখন রং একেবারেই ক্ষয়ে গেছে। দোরের উপরের মূর্তিটি তো এক কালো কালির পিণ্ড! কিন্তু এই দারিদ্র্য কুনিনের বুকের মধ্যটা পর্যন্ত নরম করে তুলল, নম্রভাবে চোখ নামিয়ে গির্জার মধ্যে ঢুকে দোরের পাশে দাঁড়ালেন। এইমাত্রই গির্জার কাজ আরম্ভ হয়েছে। একটি বুড়ো সহকারী প্রণামের ভঙ্গীতে নুয়ে ধর্মগ্রন্থ পড়ছিলেন—ফাঁপা অস্পষ্ট সুরে। কোনো 'ডিকন' ছাড়াই ফাদার ইয়াকভ কাজ চালিয়ে নিচ্ছিলেন, এবং ধূপ পোড়াচ্ছিলেন গির্জার চারদিক ঘুরে ঘুরে। এই দীনতা-পীড়িত গির্জার মধ্যে ঢুকবার কালে কুনিনের মনে একটা ব্যথাভরা অনুভূতি না থাকলে তিনি ফাদার ইয়াকভকে দেখে নিশ্চয়ই হেসে ফেলতেন। এই বেঁটেখাটো যাজকটির গায়ে ছিল বিপর্যস্ত-রকম লম্বা এক পোশাক, হলদে-রঙের লোমশ-কিছুর তৈরী—পোশাকের একটা দিক লোটাচ্ছিল মেজেতে।

গির্জা লোকজনে ভরে ওঠেনি। এখানকার পালিত লোকদের দিকে তাকিয়ে কুনিন প্রথমেই একটা ব্যাপারে বড় বিস্মিত হলেন। বুড়ো এবং ছেলে-মেয়ে ছাড়া কাউকেই তো চোখে পড়ছে না।···কর্মক্ষম মাঝবয়সী লোকেরা সব কোথায়? যুবকেরা আর পুরুষেরা? কিন্তু, কিছুক্ষণ ওখানে দাঁড়িয়ে বুড়ো মুখগুলি লক্ষ্য ক'রে, শেষে তিনি বুঝতে পারলেন যে আসলে যুবকদেরই বুড়ো বলে ভুল করেছেন। তিনি অবশ্যি চোখের এই সাধারণ ভুলের উপরে বিশেষ কোনো তাৎপর্য আরোপ করলেন না।

বাইরের মতোই গির্জার ভিতরের দিকটাও ধূসর ঠাণ্ডা। ধোঁয়াটে-কালো দেয়ালে অথবা মূর্তিতে এমন একটুখানি জায়গা নেই যেখানকার রং বিকৃত বা বিনষ্ট হ'য়ে যায়নি কালের হাতে। অনেকগুলি জানালা আছে বটে, কিন্তু ভিতরের মোটামুটি চেহারাটা বিষণ্ণ-ধূসর রকমের,—গির্জার মধ্যে সর্বদাই যেন

নেমে আছে গোধুলি। 'যার প্রাণে কোনো ময়লা নেই, সে-ই এখানে প্রাণ ভরে প্রার্থনা করতে পারে।'—কুনিন ভাবলেন—'রোমের গির্জার ঐশ্বর্য দেখে মানুষ আশ্চর্য হয়, কিন্তু এখানকার দীনতা ও সরলতা সকলের প্রাণই স্পর্শ করে।'

কিন্তু ফাদার ইয়াকভ বেদীর উপরে দাঁড়িয়ে যেই প্রার্থনা শুরু করলেন—তাঁর এই ভক্তিভাবটি উবে গেল ধুঁয়োর মতোই। ফাদার ইয়াকভের বয়স কম; সোজা বিদ্যালয় থেকেই এসেছেন, তাই প্রার্থনা পাঠকালের কয়েকটি বাঁধা-রীতিনীতিটাও এখনো আয়ত্তে আনতে পারেননি! পড়বার সময় তাঁর গলার স্বর একবার উঁচু, একবার নিচু ও অস্পষ্ট হয়ে পড়ছিল। তিনি মাথা নুইয়ে প্রণাম করছিলেন কেমন যেন বেমানান ভাবে, তাড়াতাড়ি এলোমেলো ভাবে পা ফেলে চলছিলেন, আর অতর্কিতেই এক একবার দরজা বন্ধ করছিলেন ও খুলছিলেন। বুড়ো সহকারী লোকটি স্পষ্টতই রোগা ও কালা; প্রার্থনা ঠিকমতো শুনতেও পায় না, কাজেই মাঝে-মাঝেই ভুল হচ্ছিল। ফাদার ইয়াকভের বক্তব্য শেষ হবার আগেই হয়তো বুড়ো সহকারী শুরু করে দিয়েছে তার পুনরাবৃত্তি; আবার ফাদার ইয়াকভের হয়ত শেষ হয়েছে অনেকক্ষণ হয়, কিন্তু বুড়োটি কিনা তখনো শুনে নেবার জন্যে কান খাড়া করেই আছে বেদীর দিকে, তার পোশাক ধরে টান না মারা পর্যন্ত কোনো কথাই আওড়াচ্ছে না। বুড়োটি রোগা, আর হাঁপানির দরুণ কথাও অস্পষ্ট, ভাঙা-ভাঙা।

গাম্ভীর্য ও যথাযথতার ভাবটি নষ্ট হয়েছে সম্পূর্ণভাবেই—বিশেষ করে হয়েছে একটি ছোট ছেলে বুড়োর পেছনে যোগ দেওয়ার জন্যে। ঐকতানের জায়গাটিতে রেলিংয়ের উপর দিয়ে ছেলেটির মাথা তো দেখা যায় না বললেই হয়। ছেলেটি এমন চড়া গলায় গান করছিল, মনে হয় যেন সুরের ধার সে ভুলেও ধারতে চায় না। কুনিন কিছুক্ষণ দেখলেন ও শুনলেন, তারপর সিগ্রেট ধরাবার তাগিদে বাইরে এলেন। তিনি একেবারেই হতাশ হ'য়ে পড়েছেন, ওই ধূসর গির্জার দিকে বিস্বাদ না নিয়ে তাকাতেই পারছেন না।

'মানুষের মধ্যে ধর্মভাবের অবনতি হচ্ছে বলে অভিযোগ আসে।'—দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। এমনটা হবে না তো হবে কী? এমনি আর কয়টি পুরুত এনে খাড়া করলে আরো ঢের ঢের উন্নতি হবে!'

কুনিন তিন-তিনবার গির্জার ভিতরে গেলেন আর প্রত্যেকবারেই বাইরে খোলা হাওয়ায় ফিরে আসার জন্যে যেন লুব্ধ হয়ে উঠলেন। প্রার্থনা শেষ

হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করে তিনি ফাদার ইয়াকভের ঘরে এলেন। পুরোহিতের ঘরখানি বাইর দিক থেকে দেখে—কিষাণদের ঘর থেকে নতুন-কিছু বলে মনে হয় না; শুধু ঘরের চালের ওপরটা একটুখানি পরিপাটি, আর জানালায় একটু-আধটু পর্দাও আছে। ফাদার ইয়াকভ কুনিনকে একটি ছোটোখাটো ঘরের মধ্যে নিয়ে গেলেন। ঘরটির মেজে মাটির, এবং দেয়াল শস্তা কাগজে ঢাকা; ফ্রেমে-বাঁধানো ফোটো এবং পেণ্ডুলামের ওপরে কাঁচি-আঁকা দেয়াল-ঘড়ি—এইসব দিয়ে আড়ম্বরের একটা করুণ প্রচেষ্টা করা সত্ত্বেও ঘরের সাজসজ্জার স্বল্পতাই কুনিনের কাছে স্পষ্ট হয়ে দেখা দিল। আশেপাশের জিনিষের দিকে তাকিয়ে যে কেউ ভাবতে পারত যে ফাদার ইয়াকভ বুঝি বাড়ী-বাড়ী ঘুরে ঘুরে একটু-আধটু করেই এইসব জোগাড় করেছেন। এক জায়গা থেকে দিয়েছে তে-পায়া গোল টেবিল, এক জায়গা থেকে টুল, আর এক জায়গা থেকে একটা চেয়ার—পিছনে উল্টে পড়েছে যার পিঠের দিকটা, অন্যত্র থেকে আর একটা চেয়ার—পিঠটা সটান-সোজা বটে, তবে বসবার জায়গাটি একদম তলিয়ে-পড়া; অন্য এক উদার লোকের কাছ থেকে পেয়েছেন সোফার মতো কি-একটা—এটার বসবার জায়গাটা সমতল এবং আড়াআড়ি ভাবে বেতে-বুনানো। এইটার গাঢ় লাল রং থেকে তীব্র গন্ধ বেরুচ্ছিল। কুনিন প্রথমে এরই একটা চেয়ারে বসবেন ঠিক করলেন, কিন্তু একটু ভেবে টুলের উপরে গিয়ে বসলেন।

'আপনি বোধ হয় এই প্রথম আমাদের গির্জায় এলেন?'—ফাদার ইয়াকভ বেমানান জায়গার মস্ত বড় একটা পেরেকে তার টুপিটা ঝুলিয়ে রেখে জিজ্ঞেস করলেন।

'হ্যাঁ, তাই তো! বলছি কি, ফাদার, আমাদের কাজের কথা আরম্ভ করার আগে আমাকে এক কাপ চা খাওয়াতে পারেন? সমস্ত আত্মা পর্যন্ত শুকিয়ে উঠেছে।'

চোখ পিট্‌পিট্‌ করতে লাগলেন ফাদার ইয়াকভ, দম যেন বন্ধ হ'য়ে আসার উপক্রম হচ্ছে—এমনি অবস্থায়ই দেয়ালের ওদিকে চলে গেলেন। পরেই শোনা যেতে লাগল চুপিচুপি আলোচনা।

'বৌয়ের সাথে বোধ হয়!'—কুনিন ভাবতে লাগলেন,—'এই লালকেশী ভদ্রলোকের বৌটি আবার কেমন মজার হবে, কি জানি!'

কিছুকাল পরেই ফাদার ইয়াকভ ঘেমে লাল হয়ে, ফিরে এলেন এবং হাসবার চেষ্টা করে সোফার কিনারায় এসে বসলেন

'এখনি উনুন ধরিয়ে নিচ্ছে।'—অতিথির দিকে না ফিরেই ফাদার বললেন।

'সর্বনাশ! উনুন ধরায়নি এখনো!'—কুনিন যেন আঁৎকে উঠলেন। তবে যে পুরো এক যুগই বসে থাকতে হবে।...'বিশপের কাছে লেখা চিঠির একটা মোটামুটি খসড়া নিয়ে এসেছি। চায়ের পরেই পড়ছি, সেখানে যোগ করে দেবার মতো আরো কিছু হয়ত আপনার থাকতে পারে।'

'আচ্ছা, বেশ।'

সব চুপচাপ। ফাদার ইয়াকভ দেয়ালের ওদিকটায় আড়াল-চাউনি ফেললেন এবং হাত দিয়ে চুল পালিশ করে নাক ঝাড়লেন। 'চমৎকার রোদ তো?'—ফাদার ইয়াকভ বলছিলেন।

'হ্যাঁ, কাল একটা নতুন জিনিষ পড়েছি।...ভলস্কি জেলাবোর্ড স্থির করেছে তাদের স্কুল গির্জার হাতে দিয়ে দেবে—ব্যাপারটা বেশ!' কুনিন এবার উঠে মাটির মেজেতে পায়চারি করতে করতে তাঁর মনের ভাব প্রকাশ করতে লাগলেন—

'সেটা ঠিকই হ'ত—ধর্মযাজকেরা সত্যিই যদি তাঁদের উঁচু আসনে বসবার উপযুক্ত হতেন এবং তাঁদের কর্তব্যটা বুঝতে পারতেন! আমার কপালই খারাপ, যে কয়জন ধর্মযাজকের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে তাঁদের শিক্ষা-সংস্কৃতির মাপকাঠি ও নৈতিক গুণ এমনি-ধারা যে, পুরোহিত না হয়ে যুদ্ধ-ব্যাপারের সেক্রেটারী হ'লে তবু-বা কিছুটা মানাত! এটা সবাই স্বীকার করবে, খারাপ এক শিক্ষকের চেয়ে খারাপ একজন যাজক দিয়ে ক্ষতি হয় অনেক বেশী।'

কুনিন ফাদার ইয়াকভের দিকে তাকিয়ে দেখলেন: তিনি নুয়ে পড়ে কোনোকিছু নিয়ে একমনে ভাবছেন, নিশ্চয়ই অতিথির দিকে খেয়াল নেই!

'ইয়াকভ, এদিকে এসো!'—ভাগ-করা দেয়ালের ওপার থেকে মেয়েলি গলায় ডাক এল। ইয়াকভ চমকে উঠে ভিতরে গেলেন। আবার চুপিচুপি আলোচনা। কুনিন চায়ের তৃষ্ণায় ব্যাকুল হয়ে উঠেছেন।

'না, এখানে চায়ের জন্যে দেরী করে লাভ নেই!'—সোনার হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে তিনি ভাবলেন,—'আর তাছাড়া, খুব স্বাগত অতিথি নই আমি, ভদ্রলোকটি নিজে এখন পর্যন্ত একটি কথাও তো বলতে চাননি। শুধু বসেই রইলেন আর পিট্‌পিট্‌ করে তাকালেন!'

কুনিন তাঁর টুপিটা নিয়ে ফাদার ইয়াকভ ফিরে আসা মাত্রই বিদায় জানালেন। এই ভোর বেলাটাই একেবারে মাটি হয়ে গেল—বাড়ী ফিরবার

পথে রাগের মাথায় ভাবতে লাগলেন,—'বোকা গাধা কোথাকার, একটা অপদার্থ! গেল-শীতের যেমন আমি তোয়াক্কা করি না, সেও স্কুলের বিষয়ে তার চেয়ে বেশী কেয়ার করে না……না, একে নিয়ে করার নেই কিছুই। আমাদের সমস্তই মাটি হবে। মার্শাল যদি জানতেন—এ জায়গায় পুরোহিতটি কী চীজ, তাহ'লে তিনি আর স্কুল নিয়ে এতটা মাথা ঘামাতেন না। আমাদের প্রথম কর্তব্যই একজন আদর্শ পুরুত খুঁজে নেওয়া,—তারপরেই স্কুলের বিষয় ভাবা।' কুনিনের এবার ফাদার ইয়াকভের উপর ঘৃণাই হচ্ছিল।

ধর্মভাবের যেটুকু অবশেষ কুনিনের বুকের এককোণে ঠাকুমার রূপকথার সঙ্গেই সঞ্চিত ছিল সেটুকুর উপরেই আঘাত হেনে বসল ঐ লোকটি: ঐ লোকটির লম্বা-শিথিল পোশাক-জড়ানো দীন চেহারা, মেয়ে-মার্কা মুখ, কাজ চালানোর অদ্ভুত ভাবভঙ্গী, তার সংযত-নীরস সম্মান-বোধ—তার সমস্ত কিছুই। ফাদার ইয়াকভ তার নিজের কাজের ব্যাপারেই কুনিনের সহৃদয় আগ্রহকে এমন বিতৃষ্ণ-ভাবে এমন অমনোযোগে গ্রহণ করেছে যে কুনিনের আত্ম-মর্যাদা নিশ্চয়ই তা বরদাস্ত করতে পারে না…

সেদিন সন্ধ্যায় বহুক্ষণ ধরে তাঁর ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে করতে কুনিন ভাবছিলেন। তারপর একটা সঙ্কল্পের মতোই তিনি টেবিলে বসে প'ড়ে বিশপের কাছে একটা চিঠি লিখে ফেললেন। টাকার কথা লিখে ও স্কুলের জন্যে আশীর্বাদ প্রার্থনা করার পরে সিঙ্কিনোর পুরুতের বিষয় খোলাখুলি ভাবেই তাঁর স্বকীয় মতামতটা জানালেন: লিখলেন—'লোকটির বয়স কম, উপযুক্ত শিক্ষা পায় নাই, অসংযত জীবন কাটায় বলিয়াই মনে হয়। যুগ যুগ ধরিয়া রাশিয়ার লোকেরা ধর্মনেতার যেরূপ আদর্শ ধরিয়া রাখিয়াছে—এই লোকটির মধ্যে তাহার বড় একটা কিছুই নাই।'

চিঠি লেখা শেষ করে কুনিন একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন, এবং এই ধারণা নিয়েই শুতে গেলেন যে, তাঁর দ্বারা আজ একটা ভালো কাজ হ'ল।

সোমবার ভোরবেলা, তখনো তিনি বিছানায় শুয়ে আছেন। এমন সময় খবর পেলেন যে ফাদার ইয়াকভ আসছেন। একবার উঠতেও ইচ্ছা হ'ল না; ভৃত্যকে বললেন,—'বলো, তিনি বাড়ী নেই।' মঙ্গলবার চলে গেলেন বোর্ডের সভায়। শনিবার বাড়ি ফিরলে ভৃত্যটি সংবাদ দিল যে তাঁর অনুপস্থিতির প্রত্যেক দিনই ফাদার দেখা করতে এসেছিলেন।

কুনিন ভাবলেন: বোধ হয় আমার বিস্কুটের আস্বাদ পেয়ে বসেছে!

ফাদার ইয়াকভ এসে হাজির হ'লেন রবিবার বিকেলে ; এবারে শুধু তাঁর আলখাল্লার প্রান্তটাই নয়, এমন কি তাঁর টুপি পর্যন্ত কাদার দাগে নোংরা। প্রথম দেখা করার দিনের মতোই তিনি লাল হয়ে ঘামছিলেন, এবং ঠিক সেই-দিনের মতোই চেয়ারের কিনারায় এসে বসলেন। কুনিন ঠিক করলেন : স্কুলের বিষয় একটি কথাও বলবেন না—উলুবনে মুক্তো ছড়াবেন না। ফাদার ইয়াকভ শুরু করলেন,—'পাভেল কুনিন, স্কুলের জন্যে একটা বইয়ের তালিকা এনেছি।'

'ধন্যবাদ।'

এদিকে কিন্তু সব-কিছুতেই ধরা পড়ছিল, ফাদার ইয়াকভ ঐ তালিকা ছাড়া আর কিছুর জন্যেই এসেছেন। তাঁর সমস্ত চেহারায়ই অত্যন্ত এক উদ্বিগ্ন ভাব, এবং সেই সঙ্গেই মুখের চেহারায়ও প্রকাশ পাচ্ছিল কোনো সঙ্কল্প—হঠাৎ কোনো ভাবনায় পেয়ে বসলে যেমনটা হয়। নিতান্ত জরুরী কিছু বলবার জন্যে তিনি আপ্রাণ যুদ্ধ করছিলেন, নিজের ভীরুতাটা ঝেড়ে ফেলতেও চেষ্টা করছিলেন যথাসাধ্য। 'বোবা-হাবার মতো বসেই আছে!'—কুনিনের রাগ হচ্ছিল—'বেশ তো আরামে বসে আছে! এর সঙ্গে বক্‌বক্‌ করবার সময় নেই আমার!'

চুপচাপ থাকার এই বিশ্রী আবহাওয়াটা ফেরাবার জন্যে, আর তাঁর বুকের ভিতরের যে দ্বন্দ্ব তা ঢাকবার চেষ্টায় হাসছিলেন এই ধর্মযাজকটি। ঘামানো লালমুখ নিঙড়ে-আসা হাসিটুকু তাঁর ধূসর-নীল চোখের স্থির-দৃষ্টির পাশে এত বিসদৃশ ঠেকছিল যে কুনিন মুখ ফিরিয়ে রইলেন, আর একমুহূর্তও এখানে বসে থাকতে তাঁর বিরক্তিই লাগছিল।

'কিছু মনে ক'রবেন না, এখনি আমাকে বাইরে যেতে হবে।'

ফাদার ইয়াকভ চমকে উঠলেন, যেন কেউ ধাক্কা দিয়েছে ঘুমের মধ্যেই! তবু তখনো তিনি সেই হাসিমুখেই এবং বিমূঢ় ভাবে গায়ের উপরে গুটিয়ে নিলেন পোশাকের প্রান্তটা। লোকটাকে বিশ্রী ও বিরক্তিকর লাগা সত্ত্বেও কুনিনের হঠাৎ যেন তাঁর জন্যে দুঃখই হচ্ছিল। তাই রুক্ষতাকে তিনি একটু মোলায়েম করতে চেষ্টা করলেন—'ফাদার, তা হ'লে আর একবার আসবেন যেন। আর, আমার বেরোবার আগে আপনার একটু সাহায্যও চাই। সেদিন কেমন করে যেন দুটো 'প্রার্থনা' লিখে ফেললাম—আপনাকে দেখতে দিচ্ছি, যদি ভাল লাগে নিয়ে নেবেন যেন।'

'তা, বেশ তো!'—টেবিলের উপরকার ছুটো প্রার্থনা-বাণীর উপরে হাত রেখে ফাদার ইয়াকভ বললেন—'হ্যাঁ, এখনি নিয়ে নিচ্ছি!'

কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে, দ্বিধা করছেন তখনো। পোশাকটা গায়ের চারদিকে গুটিয়ে হঠাৎ তিনি হাসবার চেষ্টা রেখে, সঙ্কল্পের মতোই মাথা তুললেন—'প্যাভেল কুনিন!'—স্পষ্টতই জোরে এবং স্পষ্টভাবে বলতে চেষ্টা করলেন।

'আপনার আমি কি করতে পারি, বলুন?'

'শুনেছি যে আপনি, মানে—আপনি আপনার সেক্রেটারীকে কাজ থেকে বরখাস্ত করেছেন এবং নতুন আর একজনের খোঁজ করছেন——'

'হ্যাঁ, তা বটে। কেন, একাজে আপনি কি কাউকে দিতে চান?'

'আমি, মানে দেখছেনই তো, আমি,—কাজটা কি আমাকেই দিতে পারেন?

'কেন, আপনি কি গির্জা ছেড়ে দিচ্ছেন?'—কুনিন বিস্মিত হয়ে গেলেন।

'না, না, তা নয়, ভগবান না করুন!'—ফাদার ইয়াকভ তাড়াতাড়ি করে বলে উঠলেন, এবং কোনও কারণে মুখ তার ফ্যাকাশে হয়ে উঠল, সমস্ত শরীর কাঁপতে লাগল—'অবশ্যি আপনার যদি দ্বিধা থাকে—তা হ'লে, তা হ'লে ও কিছুই না, ও থাক। অবশ্যি, মাঝ-ফাঁকে কাজটা করে নিতে পারতাম! কিছু আয় বাড়িয়ে নেওয়াও দরকার। তা থাক, ও জন্যে চিন্তা করবেন না।'

'হুঁ, আপনার আয়! কিন্তু আপনার বোধ হয় জানা নেই যে আমার সেক্রেটারীকে মাসে শুধু বিশ রুবল দিয়ে থাকি।'

'হায় ভগবান, দশ হ'লেও তো নিই।'—ফাদার ইয়াকভ চারদিকটা তাকাতে তাকাতে আস্তে আস্তে বললেন—'দশ রুবলই যথেষ্ট! আপনি, আপনি বিস্মিত হচ্ছেন, আর সবাইও হচ্ছে! লোভী যাজক, জবরদস্ত যাজক, টাকা দিয়ে লোকটা করে কি! আমার নিজেরো মনে হয় আমি লোভী বটে···নিজেকেই ধিক্কার দিই আমি, অপরাধী মনে করি···লোকের মুখের দিকে তাকাতেও আমার লজ্জা হয়···প্যাভেল কুনিন, আমার বিবেকের দিকে তাকিয়েই এইকথা বলছি, ভগবানও দেখছেন তো সবি!'

একবার দম নিয়ে আবার বলে চললেন ফাদার ইয়াকভ:

'এখানে আসতে আসতে আস্ত একটা স্বীকারোক্তির মতোই খাড়া করে এনেছিলাম, কিন্তু···একবর্ণও এখন মনে করতে পারছি না। আমি গির্জা থেকে ফি-বছর দু'শ রুবল পাই, আর সবাইও অবাক হয়ে ভাবে: এত টাকা দিয়ে

লোকটা করে কি? এবারে আমি সব কথা সত্য করে খুলে বলছি। আমার ভাই পিওতোর-এর স্কুলের জন্যে দিতে হয় চল্লিশ রুবল। সেখানে সবি সে জোগাড় করে নিয়েছে, কাগজ-কলমের খরচটাই আমাকে যোগাতে হয়।'

'একি করছেন? আপনাকে খুবি বিশ্বাস করি আমি। আর, কি জন্যেই বা এইসব বলছেন!'—কুনিন হাত বাড়িয়ে বলে উঠলেন। এই নতুন লোকটির বিশ্বস্ত সব গোপন কথার এমন আকস্মিক প্রকাশ তাঁর কাছে মনে হচ্ছিল একটা ভয়ানক আঘাতের মতোই। কিন্তু ফাদার ইয়াকভের সজল দৃষ্টি থেকে নিজেকে সরিয়ে নেবার কোনো পথও পাচ্ছিলেন না।

'তারপর, আমার এই জায়গায় থাকার জন্যে বাড়ীওয়ালার সব পাওনাটা এখনো মিটিয়ে দিতে পারিনি। এখানে থাকার বাবদ তারা ত্রিশ রুবল দাবী করেছে, মানে—মাসে দশ রুব্‌ল। এবারে আপনি বুঝতে পারেন, বাকী থাকে কী! এবং এ ছাড়া, ফাদার আভ্রেমিকে যে করেই হ'ক মাসে অন্তত তিন রুব্‌ল না দিলেই নয়।'

'ফাদার আভ্রেমি কে?'

'যিনি আমার আগে সিঙ্কিনোতে ছিলেন; অপারগ বলে তাঁর জীবিকার এই পথ বন্ধ করে দেওয়া হয়। কিন্তু তিনি এখনও এই সিঙ্কিনোতেই থাকেন। এ ছাড়া তাঁর আর জায়গা নেই, তাঁকে আশ্রয় দেবে কে? বুড়ো হয়েছেন, তবু তো কোনোখানে তাঁর জায়গা চাই—খাবার চাই। এ অবস্থায় তাঁকে পথে পথে ভিক্ষা করতে দিতে পারি না। একটা কিছু হ'লে, আমারই বিবেকে লাগবে—সে হবে আমারই অপরাধ! ঋণে তাঁকে ঠেসে ধরেছে চারদিক থেকে, আর তাঁকেই যদি কিছু না দিতে পারি তো সে হবে আমারি অন্যায়।'

ফাদার ইয়াকভ তাঁর আসন থেকে সোজা উঠলেন এবং নিচের দিকে ব্যাথা-হতের মতো তাকাতে তাকাতে ঘরের মধ্যে বড় বড় পা ফেলে হাঁটতে লাগলেন—

'ভগবান! হা আমার ভগবান!'—হাত দুটো তিনি একবার উপরে তুললেন—'প্রভু, আমাদের ত্রাণ করো। এতটুকু বিশ্বাস ও শক্তি যদি না থাকে তো কেন একাজ নিলাম? আমার হতাশার আর অন্ত নেই। মা, মেরী-মা! আমাকে বাঁচাও।'

কুনিন বললেন—'আশ্বস্ত হন, ফাদার!'

ফাদার ইয়াকভ বলেই চললেন—'খাবার অভাবে আমি শেষ হয়ে এসেছি—অনুগ্রহ করে আমাকে ক্ষমা করবেন। শক্তির শেষ-কিনারায় এসে পৌঁছেছি,

অ মি আজ যদি ভিক্ষার জন্যে মাথা নোয়াই, সবাই আমাকে সাহায্য করবে—তা জানি, কিন্তু তা তো পারি না, মনে আঘাত লাগে। কিষাণদের কাছ থেকে কেমন করে ভিক্ষা নেব? আপনি তো এখানে বোর্ডে আছেন, আপনি তো জানেন ভিখিরীর কাছে কেমন করে হাত পাতি? আর, ধনী জমিদারদের কাছে? তাও পারি না,—সম্মানে লাগে, লজ্জা লাগে।'

ফাদার ইয়াকভ দুই হাত দিয়ে বিক্ষুব্ধভাবে মাথা চুলকোতে লাগলেন,—'ভগবান! ঘৃণা হয়, আমার উপর ঘৃণা হয়। আমার মর্যাদায় তো আঘাত লাগে, আর কেউ যে আমার দীনতা চেয়ে চেয়ে দেখবে আমি তা' সহ্য করতে পারি না। আপনি সেদিন আমার ঘরে এলেন, প্যাভেল কুনিন, ঘরে চা ছিল না, এক ফোঁটাও না। অথচ আত্মমর্যাদার অনুরোধে আপনাকে তা বলতে বেধেছে। আমার পোশাক দেখে নিজেরই লজ্জা হয়—দাগে দাগে ভরা…ধর্মযাজকের কি এমন গর্বিত হওয়া উচিত?'

ফাদার ইয়াকভ পড়ার-ঘরের মধ্যে স্থির হ'য়ে দাঁড়ালেন, এবং কুনিন যেন লক্ষ্য করেননি এমনভাবে নিজের কাছে নিজেই যুক্তি প্রয়োগ করতে লাগলেন—'আমি না হয় ক্ষুধা অসম্মান স'য়ে রইলাম—কিন্তু হায় ভগবান, আমার স্ত্রী রয়েছে! স্বচ্ছল ঘর থেকেই তাকে এনেছি, কষ্ট-কাজ করা তার অভ্যাস নেই। আদুরে নরম মেয়ে সে; চা-কেক-রুটি, বিছানায় ধবধবে চাদর—এই সবেই সে অভ্যস্ত হয়ে এসেছে—বাপের বাড়ী থাকতে সে পিয়ানো বাজিয়ে গাইত। বয়স কম, এখনও বিশে পা দেয়নি। নিশ্চয়ই তাঁর সাধ হয় একটু ফিটফাট থাকে, আলাপ-পরিচয় করে, আমোদ করে, বাইরে সবার মধ্যে বেড়াতে যায়। আর, সে আমার সঙ্গে থাকে কিনা রাঁধুনি মেয়ের চেয়েও জঘন্য অবস্থায়! লোকে দেখবে ব'লে রাস্তায় বেরুতে তার লজ্জা হয়। ভগবান! হায় ভগবান! কোনো বাড়ী যাওয়ার সুযোগে একটা আপেল বা কিছু বিস্কুট যদি আনতে পারি, তবে তাই হয় তাঁর একমাত্র ভালো খাবার—'

ফাদার ইয়াকভ আবার দুই হাত দিয়ে মাথা চুলকোতে আরম্ভ করলেন—'এতে আমাদের মধ্যে ভালোবাসা দাঁড়াতে পারে না, এ ওকে অনুগ্রহ করি শুধু! করুণার দৃষ্টি ছাড়া একটিবারও তাঁর দিকে তাকাতে পারি না। হা ঈশ্বর! পত্রিকায় পড়লেও লোকে বিশ্বাস করতে চাইবে না—এমন অবস্থা! চিরদিনের মতো কবে সব শেষ হবে, কবে—'

তাঁর গলার স্বর শুনে কুনিন ভয় পেয়ে গেলেন এবং প্রায় চীৎকার করেই

উঠলেন, 'শান্ত হ'ন ফাদার, জীবনটাকে এমন কালো করে দেখছেন কেন ?'

'অনুগ্রহ করে ক্ষমা করবেন, প্যাভেল কুনিন!'—ফাদার ইয়াকভ নেশাগ্রস্তের মতোই বিড়বিড় করে বলতে লাগলেন—'ক্ষমা করুন সব—ও কিছুই না, এ সব খেয়াল করবেন না। আমাকেই আমি দোষ দেই এবং চিরদিন আমাকেই দোষ দেব, চিরদিন—'

ফাদার ইয়াকভ তাঁর চারদিকে তাকিয়ে আবার চাপা গলায় বলতে লাগলেন—

'জানেন, একদিন খুব ভোরে নিস্কিনো থেকে লুচ্‌কোভো যাবার পথে দেখি কি : একটি মেয়ে নদীর পারে কি যেন করছে—কাছে এগিয়ে গিয়ে নিজের চোখকেই বিশ্বাস করতে পারলাম না। সর্বনাশ! এ যে ডাক্তার আইভান সের্‌গিভিচের স্ত্রী! বসে বসে কাপড় কাচছেন—ডাক্তারের স্ত্রী, নাম-করা বোর্ড স্কুলের মেয়ে! খুব ভোরে ভোরে উঠে আধমাইল খানেক দূরে গিয়ে নিয়েছেন—লোকে তাঁকে দেখতে না পায়—তিনি তাঁর আত্মসম্মান ঝেড়ে ফেলতে পারেননি। যখন বুঝলেন, আমি তাঁর দীন অবস্থাটা দেখে ফেলেছি, অপমানে যেন একেবারে মাটির সঙ্গেই মিশে যাচ্ছিলেন। কেমন বিমূঢ় হয়ে তাড়াতাড়ি তাঁকে সাহায্য করতে গেলাম,—তিনি কিন্তু তাঁর জামা কাপড় লুকিয়ে ফেললেন ; ভয় হচ্ছিল, যদি তাঁর ছেঁড়া শেমিজ দেখে ফেলি—'

'এ যে একেবারেই বিশ্বাস হয় না!'—ফাদার ইয়াকভের বিবর্ণ মুখের দিকে তাকিয়ে কুনিন যেন ভয় পেয়েই বলে উঠলেন।

'সত্যিই বিশ্বাস হয় না, প্যাভেল কুনিন! একজন ডাক্তারের স্ত্রী নদীতে এসে কাপড় কাচবে—এ রকম ঘটনা কেউ কখনো শোনেনি, কোনো দেশেই এমন ঘটে না। তাঁর শুভাকাঙ্ক্ষী ও ধর্মপিতা হিসেবে তো আমারি এসব দেখা উচিত। কিন্তু আমারি বা উপায় আছে কি? তাই তো, এই আমি নিজেই তো তাঁর স্বামীকে চিকিৎসার জন্যে ডাকি, অথচ একটি পয়সাও দেই না!

'সত্যিই বলেছেন, এসব বিশ্বাস হয় না। নিজের চোখকেই কেউ বিশ্বাস করে উঠতে পারে না, এমন! গির্জায় প্রার্থনার সময় হয়তো লক্ষ্য করেছেন—গির্জা বেদী থেকে তাকিয়ে দেখি যখন সামনের জনতা : আব্রেমি খেতে পায়নি, আমার স্ত্রী ঐ, ঐ ডাক্তারের স্ত্রী—হিমজলে হাত তাঁর মৃত্যু-নীল হয়ে গেছে,—(হয়তো আপনার বিশ্বাস হবে না) আমি তখন নিজেকে হারিয়ে

ফেলি, বোকার মতো স্তব্ধ হয়ে শুধু দাঁড়িয়ে থাকি, আমার সহকারীটি ডাক দিলে তবেই সম্বিৎ ফিরে পাই। কী সাংঘাতিক!'

ফাদার ইয়াকভ্ আবার চারদিকে ঘুরতে আরম্ভ করলেন, হতাশায় হাত দুটি উপরে তুলে বলতে লাগলেন—'প্রভু যীশু! হা প্রভু! ঠিকমতো আমি গির্জার কাজ চালাতে পারি না; আপনি এখানে স্কুলের কথা বলেন, আর আমি কুঁড়ের মতো একঠায় বসে থাকি শুধু—একটি কথাও বুঝে উঠতে পারি না। শুধু খাবার, খাবার, সবার খাবার ছাড়া আর কোনো কথাই মনে আসে না—এমন কি বেদীর সামনেও! কিন্তু—থাক্—কেন আমি এসব বকছি!'—ফাদার ইয়াকভ্ হঠাৎ নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে উঠে দাঁড়ালেন—'ও, আপনি বাইরে যাবেন বলোছলেন। ক্ষমা করুন, ও কিছু না, ক্ষমা করুন—'

কুনিন নীরবে ফাদার ইয়াকভকে হাত ধরে বিদায় জানিয়ে একদৃষ্টে তাঁর পথের দিকে তাকিয়ে রইলেন কিছুক্ষণ, পরে পড়ার ঘরে ফিরে এসে জানলায় দাঁড়িয়ে দেখতে থাকলেন: ফাদার ইয়াকভ বাড়ী থেকে বেরিয়ে তাঁর মরচে-পড়া মস্ত টুপিটা চোখের উপর পর্যন্ত টেনে নামিয়েছেন, তারপর মাথা নিচু করে ধীরে ধীরে রাস্তা ধরে চলছেন,—যেন তাঁর আকস্মিক উচ্ছ্বাসের জন্যে লজ্জিতহ হয়ে আছেন।

'তাই তো!'—কুনিন ভাবছেন—'ঘোড়া তো দেখতে পাচ্ছি না!' ফাদার যে পায়ে হেঁটে রোজ রোজ তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন—কুনিন একথা ভাবতে পর্যন্ত সাহস পাচ্ছেন না। সিন্কিনো তো পাঁচ-ছ' মাইলের পথ, পথে এত কাদা যে চলা অসম্ভব। এবারে তিনি দেখতে পেলেন তাঁর নিজের কোচোয়ান আন্দ্রেকে ও চাকর ছেলেটাকে। তারা গর্তের উপরে লাফ দিয়ে দিয়ে ফাদার ইয়াকভের গায়ে কাদা ছিট্কিয়ে দৌড়ে আসছে তাঁরি আশীর্বাদ চাইতে। ফাদার ইয়াকভ্ টুপি খুলে ধীর-শান্তভাবে আন্দ্রেকে আশীবাদ করলেন; তারপর ছেলেটিকে আশীর্বাদ করে তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন।

কুনিন চোখের উপর হাত মুছে নিতে তা' যেন ভিজে মনে হ'ল। জানালার সুমুখ থেকে দূরে এসে আচ্ছন্ন চোখে তিনি চারদিকে তাকাতে লাগলেন, তখনো যেন ঘরের মধ্যে শুনতে পাচ্ছিলেন ফাদারের ভীরু-করুণ কণ্ঠস্বর। টেবিলের দিকে তাকালেন—ভাগ্যিস্, তাড়াতাড়িতে প্রার্থনাগুলি নিতে ভুলে গেছেন ফাদার ইয়াকভ! কুনিন ধেয়ে গিয়ে সেগুলোকে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলে, ঘৃণাভরে ছুঁড়ে ফেললেন টেবিলের নিচে।

সোফায় বসে পড়ে আহতমনে ভাবতে লাগলেন—'আর, আমি নিজে জানতে পারিনি! এক বছরের উপরে এখানে আছি আমি—পল্লীমঙ্গল-সমিতির সদস্য আমি—'অনারারি জাষ্টিস্ অব্ পিস্', আমি স্কুল-কমিটি-র সভ্য! ধামাধরা চাকর একটা, আস্ত একটি গাধা! আমাকে এক্ষুণি গিয়ে ওদের সাহায্য করতে হবে, —আর দেরী না করে এক্ষুণি যেতে হবে।'

কুনিন অস্বস্তিভরে এপাশ ওপাশ করতে লাগলেন, গাল চেপে ধ'রে—মাথা খুঁড়ে সব বুঝে দেখতে লাগলেন:

বিশ তারিখে মাইনে পাব—দু'শ রুব্ল···ভালো কোনো অছিলা খুঁজে ওঁকে দেব কিছু, কিছু দেব ডাক্তারের স্ত্রীকে—কোনো একটা বিশেষ কাজের অনুরোধে এখানে ডেকে এনে একটা অসুখ বানিয়ে নিলেই হবে। তাহ'লে নিশ্চয়ই তাঁদের আত্মসম্মানে আঘাত লাগবে না। আর, ফাদার আভ্রমিকেও সাহায্য করতে হবে। আঙুলের উপরে তিনি মাইনেটা গুণে গুণে দেখলেন। ভাবতেই ভয় হচ্ছিল—ঐ দু'শ রুব্লে তাঁর চাকর, সরকার ও মাংসের পাওনাদারকে দিয়ে কুলিয়ে ওঠাই তো শক্ত। এই বিগত দিনের কথাও তিনি না ভেবে পারলেন না: সেদিনও তাঁর বাবার টাকা বোকার মতো দু'হাতে উড়িয়েছেন, বিশ বছরের এক ফুলবাবু সেজে রূপসী গণিকাদের দামী দামী পোশাক দিয়েছেন, তাঁর কোচোয়ান কাজ্মাকেও দিয়েছেন ফি-রোজ দশ রুব্ল, অভিনেত্রীদের পায়ে উপহার ঢেলেছেন সম্মানের খেয়ালে। হায় হায়, কত কাজেই না লাগত ঐ নষ্ট করে-ফেলা এক-রুব্ল' তিন-রুব্ল ও দশ-রুব্লের নোটগুলি। আর, ফাদার আভ্রমি কিনা বেঁচে আছেন মাসে মাত্র তিন রুবলের উপর! কুনিন ভাবতে লাগলেন—একটা রুব্ল হাতে পেলে ফাদারের স্ত্রীর একটা শেমিজ হয়, এবং ডাক্তারের স্ত্রী একটা ধোবা ঠিক করে নিতে পারে। কিন্তু না, এবারে তাঁদের দেখবই, যেমন করেই হ'ক তাঁদের সাহায্য করবই।'

গোপনে বিশপের কাছে যে একটা চিঠি পাঠিয়ে দিয়েছেন,—সে কথা মনে পড়তেই হঠাৎ যেন তাজা হওয়ার অভাবেই তিনি চুপ্‌সে এলেন! সেকথা মনে হতেই তাঁর অন্তরাত্মার সামনে এবং তাঁর অজ্ঞাত এক সত্যের সামনে তিনি একেবারে আচ্ছন্ন হয়ে পড়লেন লজ্জায়।

আরামে আরামে সকলের কল্যাণ করবার মতো এমন নিষ্ক্রিয় শুভ-কামনা তিনি জন্মের মতোই ত্যাগ করলেন, এবং সেদিন থেকেই তাঁর জীবন মোড় নিল নতুন পথে।

## * ফিয়দর সোলোগুব *

১৮৬৩—১৯২৭ খ্রী.

ফিয়দর সোলোগুব বিপ্লব-পূর্ব রুশ সাহিত্যের একজন বিশিষ্ট সাহিত্যিক: গল্পকার, উপন্যাসিক এবং কবি,—তবে কবি-রূপেই ইনি বেশী পরিচিত। এমনকি এঁর গদ্য-রচনায়ও কবিধর্ম সঞ্চারিত হয়ে আছে। রুশসাহিত্যে রূপকবাদী লেখকদের মধ্যে সোলোগুবের আসন খুব উঁচুতে; এঁর 'ক্ষুদে দানব' রূপক-উপন্যাসটি প্রকাশিত হ'লে বিশেষ সাহিত্য-খ্যাতি প্রতিষ্ঠিত হয়। অন্যান্য কয়েকটি উপন্যাস হ'ল কয়েকখণ্ডে সম্পূর্ণ 'মরণের মায়াজাল'; বিখ্যাত গল্পগ্রন্থ 'পোড়ো বাড়ী' 'বানানো উপাখ্যান'।

এই বইতে পরিবেশন করেছি দুই ধরণের দুইটি গল্প: রূপকথা-সম্ভব অতি-রোমান্টিক একটি আশ্চর্য-মধুর গল্প 'তুরান্দিনা', এবং দিগ্বিজয়ী অত্যাচারীর মুখোমুখী এক বীর কিশোরের গল্প 'ধ্বংস হও, দস্যুদল।' গল্পটি রূপক-ধর্মী। অন্তরালে উদ্দীপিত এক উচ্চ জীবনাদর্শ: উৎপীড়নের মধ্য থেকেই জন্মলাভ করে মৃত্যুঞ্জয়ী এক বিদ্রোহী শক্তি—দস্যুরাজের বিজয়ী-ভূমিকার শেষ-অঙ্কের অবসান ঘটে অপমৃত্যুতে। তাই তো দুঃশাসনের রাজত্বে দেশে দেশে জন্ম নিয়েছে লীন-এর মতো কতো না মৃত্যুঞ্জয়ী শিশু। রুশ-জার্মান যুদ্ধে এবং ভিয়েতনামের যুদ্ধে মৃত্যুর মধ্যেই মৃত্যুঞ্জয়ী আদর্শ তুলে ধরেছে সংগ্রামী শিশু ও কিশোর-কিশোরীরাও। লেখকের অন্য কয়েকটি ভালো গল্প হ'ল 'অজাত-

শিশুর চুম্বন* ; 'স্বত-বৃত ন্যায়বিধান যন্ত্র*'; 'মৌরিরি নদীর ওপারে।'* [ তারকা-চিহ্নিত রচনাগুলি বহুকাল পূর্বেই বর্তমান গ্রন্থাকার কর্তৃক পরিবেশিত ]। সোলোগুবের ভাষা যেমন কাব্যধর্মী তেমনি মার্জিত-সুন্দর, এবং রচনায় স্বদেশপ্রীতির এবং আদর্শবোধেরও পরিচয় মেলে।

ফিয়দর সোলোগুব লেখকের মূলনাম নয়, মূলনাম হ'ল ফিয়দর কুজ্‌মিচ্‌ তেতার্নিকভ। বাল্যজীবন কেটেছে দুঃখে দারিদ্র্যে ; বাবা ছিলেন চর্মকার, বাবার মৃত্যু হ'লে মা এক বড়লোকের বাড়ীতে পরিচারিকার কাজ নিতে বাধ্য হন—শিশু-সন্তানটি সঙ্গে নিয়ে। শিশু ফিয়দরও মনিবের বাড়ীতে প্রতিপালিত হন মায়ের সঙ্গে ; সহৃদয় মনিব ফিয়দরের পড়াশোনার ব্যবস্থা করে দেন, এবং তাঁরই সহায়তায় বিদ্যালয়ের শিক্ষান্তে পিটার্সবুর্গে অধ্যয়ন করেন শিক্ষণ-প্রতিষ্ঠানে এবং ফিরে এসে বিদ্যালয়-শিক্ষকরূপে কাজ করেন এক মফঃস্বল শহরে ; পরে নিযুক্ত হন জিলার প্রাথমিক বিদ্যালয়-সমূহের পরিদর্শক পদে, এবং শেষ পর্যন্ত স্থানান্তরিত হন পিটার্সবুর্গে।

১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে বিফল বিপ্লবের সময় সোলোগুব বিপ্লবের অনুকূলে ছিলেন, কিন্তু ১৯১৭-র মহান বিপ্লবের সময় তার সঙ্গে যোগ রাখেননি বা সমর্থনও জানাননি। স্পষ্টতই বিপ্লবের পরে লেখকের মূল্যায়নে কিছু বাধা ঘটেছে। সোলোগুবের শেষজীবন কেটেছে বৈচিত্র্যহীন ও সংঘাতশূন্য ধূসরতায়। মৃত্যু হয় ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে পঁয়ষট্টি বছর বয়সে।

## ॥ তুরান্দিনা : রূপকথা ॥

পিতার বুলানিন এবারকার গরম দিনগুলি কাটাচ্ছিলেন পল্লী অঞ্চলেই, ভাইপোর ঘরের সকলের সঙ্গে। ভাইপোটি শব্দশাস্ত্রের শিক্ষক। বুলানিন ত্রিশ বছরের তরুণ ব্যবহারজীবী, বিশ্ববিদ্যালয়ের সিংহদ্বার পার হয়ে এসেছেন সবে মাত্র বছর দুই।

গেল বছরটা ভালোই কেটেছে বলা চলে। বেশ কৃতিত্বের সঙ্গেই তিনি দু-দুটো ফৌজদারী মামলায় দাঁড়িয়েছেন—সরকার কর্তৃক মনোনীত হ'য়ে, এবং স্বেচ্ছায়ই নিয়েছেন একটা দেওয়ানী মামলার ভার। তাঁর চমৎকার সওয়ালের জোরে তিন-তিনটে মামলাতেই জিতেছেন তিনি। এরি একটা মামলায় বেচারী এক দর্জি-মেয়ে মুক্তি পেল। এই মেয়েটি আর একটি মেয়ের গায়ে ছুঁড়ে মেরেছিল মস্ত বড় একটা লোহার টুকরো ; ছুঁড়েছিল কারণ তারই প্রণয়ী কিনা বিয়ে করতে যাচ্ছিল এই মেয়েটাকে। দেওয়ানী আদালত এক্ষেত্রেও রায় দিলেন দেড়শ রুবল বাদীর একান্ত-ন্যায্য পাওনা। অবশ্যি বিচারক বিবাদী বলছিল বারবার, টাকাটা আগেই দিয়েছে সে। এই সমস্ত কাজের জন্যেই কৃতী পিতার পেলেন অবশ্যি মাত্র পনের রুব্‌ল। কারণ, টাকাটা যার হাত দিয়ে এসে পেঁাছল সে নিজেই মেরে দিয়েছে আর বাকীটা!

এবার তাহলে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে মাত্র পনেরটি রুবলে সারাটি বছর চলে না। কাজেই পিতারকে তাকাতে হ'ল তাঁর খুঁটির দিকে,—অর্থাৎ কিনা বাড়ি থেকে বাবার পাঠানো টাকা ক'টির দিকে। এদিক থেকে এ পর্যন্ত আর কিছু না হ'লেও, তাঁর যশ হ'ল যথেষ্টই। তবে, এরি মধ্যেই যে খুব একটা-কিছু তাও নয়। বাবার পাঠানো টাকাটাও সুনির্দিষ্ট ও সুপরিমিত। কাজেই পিতারের মনটা ভরে থাকে এক ধূসর ব্যথায়। জীবনটাকে দেখেন তিনি নিরাশ চোখে। তাঁর মুখের উপরে নেমে থাকে না-বলা ব্যথার এক কোমল ছায়া ; আর তাই দেখেই কিন্তু ভুলে যেত তরুণীরা, মুগ্ধ হ'ত···

একদিন সন্ধ্যেবেলা। তুমুল ঝড় হয়ে গেছে কিছু আগেই, হাওয়ায় হাওয়ায় তার তাজা নিশ্বাস। পিতার বেড়াতে বেরিয়ে গেলেন একাই।

মাঠের সরু আল ঘুরে ঘুরে চলেছেন, যেতে যেতে এসে পড়লেন বাড়ি থেকে অনেক দূরেই। সামনেই নয়ন-ভোলানো শ্যামল প্রকৃতি; উজ্জ্বল নীলাকাশ ঝুঁকে আছে চারদিকে—চাঁদোয়া-বিতানের মতো! কত ছিন্ন-মেঘের খেলা সেখানে, অস্তসূর্যের নরম সোনালিত রঙিয়ে উঠেছে ফুলের মতো। সামনের পথটা চলে গেছে একটা নদীস্রোতের উঁচু পাড় ঘুরে: জলধারাটি সঙ্কীর্ণ খাতের মধ্যে দিয়ে চলেছে এঁকে বেঁকে—ছোট ঢেউয়ে দুলে দুলে, ঠিক আদুরে মেয়ের মতো! স্রোতের অগভীর জল স্বচ্ছ-সবুজ; চেয়ে চেয়ে সারা প্রাণ শান্তির আরামে ভ'রে আসে। মনে হয়, যেন সে ডাকছে,—তার শ্যামল বুকের মধ্যে একটু নেমে দাঁড়ালেই যেন সমস্ত প্রাণ ভরে উঠবে এক সরল সুখের মায়াতে। সেখানে স্নান করে যে শিশু-কিশোর দল—গোলাপের মতো যাদের সুন্দর সুকুমার তনু,—জীবনটাও হয়ে উঠবে যেন তাদেরি মতো নিটোল, চলার গতিও হবে তাদের মতোই সহজ স্বচ্ছন্দ।

কিছু দূরেই এলিয়ে পড়েছে প্রশান্ত এক বন-ছায়া; নদীর ওপারে বিশাল এক প্রান্তর, অর্ধচন্দ্রাকার। তারি মধ্যে এখানে-ওখানে গাছপালা আর গ্রাম,—মাঝখান দিয়ে আঁকা-বাঁকা এক ধূলো-মাটির পথ, ঠিক একটা ফিতের মতো। সূর্যালোকে ঝলমল করছে দূরান্তের গির্জা ও স্মৃতিস্তম্ভের উপকার ক্রুশ-চিহ্ন—ঠিক যেন এক ঝাঁক সোনার তারা! সবকিছুই প্রাণের মতো সজীব-সুন্দর, সরল! তবু পিতারের প্রাণে ব্যথার ছায়া। চারদিকের এই সৌন্দর্যে তাঁর বিষাদ যেন জেগে উঠল আরো দ্বিগুণ হ'য়ে। কোনো দুষ্ট গ্রহই তাঁকে যেন আজ মোহময় এক স্বপ্নের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে নিয়ে চলেছে কোন্ সর্বনাশের পথে!

কারণ, পিতার বুলানিনের কাছে দুনিয়ার এই সমস্ত সৌন্দর্য, নয়ন-ভুলানো এই মায়া, দুনিয়ার দেহময় কামনা-উচ্ছল যত মধু-মাধুর্য—সমস্তই একটা ছদ্মবেশ শুধু। যেন সোনালি মায়াজাল পেতে রেখেছে কোনো সর্বনাশা শত্রু—মানুষের আড়ালেই যাতে থেকে যায় সব অপবিত্রতা ও অপূর্ণতার দৈন্য, আর প্রকৃতির যত দুষ্ট প্রভাব।

তবু এই জীবন তো সৌন্দর্যে ঝলমল, এর নিশ্বাসেও কত মধুগন্ধ! কিন্তু পিতার ভেবে দেখেছেন: এই সমস্তের মূলে রয়েছে নিছক এক গন্ধময় কার্য-কারণের লৌহ-শৃঙ্খল, এক দুর্ভর দাসত্ব,—মানুষ যা থেকে কোনোদিনই আর মুক্তি পাবে না।

এমনধারা দুশ্চিন্তায় বিক্ষত হ'য়ে পিতার বুলার্নিন অত্যন্ত অসুখী বোধ করতেন। তাঁর মধ্যে যেন জেগে ওঠে সেই প্রাচীন দানবের অসন্তুষ্ট আত্মা…গ্রামপ্রান্তে যে গর্জন করত। ভাবছিলেন তিনি—

'কারো জীবনে যদি নেমে আসত আর এক রূপকথা, আর ভেঙেচুরে দিত অদৃষ্ট-পাষাণের এই চিরস্থির ব্যবস্থা। আহা রূপকথা! তুমি মানুষের পথ-ভোলা কামনার দেশ, তোমাকে রচনা করেছে কত বন্দী মানবের অবরুদ্ধ তৃষা। দাসত্বের সঙ্গে কিছুতেই কোনদিন যারা মেলাতে পারেনি তাদের প্রাণ, তোমাকে গড়েছে তো তারাই। রূপকথা, প্রাণ-ভোলানো রূপকথা! বলো, তুমি কে?'

গতকালের পত্রিকায় একটা প্রবন্ধ পড়েছিলেন পিতার, সে-কথা মনে পড়ল? প্রবন্ধটির কোনো কোনো জায়গা নাড়া দিয়েছিল তাঁর প্রাণে। সেখানে উল্লেখ করা হয়েছে এক প্রাচীন প্রবাদকাহিনীতে বর্ণিত বনদেবী তুরান্দিনার কথা। সেই বনদেবী ভালোবাসল এক রাখালকে, এবং নিজের সুখের রাজ্য ছেড়ে চলে গেল তার প্রণয়ীর পাশে! তারপর দুজনে মিলে ভরা ভালোবাসায় কাটিয়ে দিল কত যে বসন্ত। শেষে একদিন, বন-রাজ্যের রহস্য-গভীর আহ্বান এল। সে চলে গেল; আর মানুষের, কাছে চিরদিনের মতো রয়ে গেল সেই সুখ-বসন্তস্মৃতির আলোটুকু!

পিতার সেই স্বপ্নের মধ্যেই ডুবে গেলেন—আহা, সেই স্বপ্ন-কমলের বুকের মাঝে মায়াময় কয়টি বছর, ফুলের মতো সেই দিনগুলি!…সহসা পিতার বিহ্বল গলায় ডাক দিয়ে উঠলেন—'তুরান্দিনা, কোথায় তুমি?'

॥ ২ ॥

আকাশে ঢলে পড়েছে সূর্য। দিগন্ত-বিস্তৃত প্রান্তরে পড়েছে সন্ধ্যার শান্ত ছায়া। পাশের বনদেশ নীরব-নিঝুম। একটুও সাড়াশব্দ নেই কোথাও, নিস্তব্ধ হাওয়া, বর্ষা-ভিজা ঘাসের ডগাগুলি দাঁড়িয়ে আছে নিস্পন্দ নিথর।

এ যেন এক পরম লগ্ন, চিরদিনের মতো যখন সফল হবে মানুষের সকল কামনা! প্রত্যেক মানুষের জীবনেই একবার মাত্র আসে এমন মাহেন্দ্র ক্ষণ। নিস্তব্ধ চারদিক যেন তারি প্রতীক্ষায় উন্মুখ।

সামনের স্বপ্নোজ্জ্বল কুয়াশার দিকে তাকিয়ে পিতার ডাক দিলেন আবার; তাঁর প্রাণমনের সমস্ত শক্তি দিয়ে—'তুরান্দিনা, কোথায় তুমি?'

তখন সেই সন্ধ্যার নিঝুম-নীরব মায়ায় ঢেকে গেল পিতারের সমস্ত সত্তা, —তাঁর ব্যক্তিগত সব বিচ্ছিন্ন কামনা একাত্ম হয়ে গেল বিশ্বময়ী বাসনার বুকে! অপূর্ব অদ্ভুত এক শক্তির অধিকার নিয়েই এবারে ডাকলেন তিনি, মানুষের সমস্ত জীবন ভ'রে উচ্চারিত একটিমাত্র বাণীর মতো—'তুরান্দিনা, কোথায় তুমি?' আর তখনি শোনা গেল একটি মধুর কণ্ঠ—'এই যে আমি!'

কেঁপে উঠলেন পিতার বুলানিন, চারদিকে তাকালেন। না, সমস্তই তো আগেরি মতো সুপরিচিত ও সাধারণ; এক নিমেষে তাঁর প্রাণও হ'য়ে দাঁড়াল সাধারণ এক মানুষের প্রাণ—বিশ্বপ্রাণ থেকে বিচ্ছিন্ন! আবার তিনি নেমে এলেন একজন সাধারণ মানুষের আসনে,—যারা তোমার আমারই মতো নির্দিষ্ট স্থান ও কালের প্রাচীরে আবদ্ধ। কিন্তু, এদিকে? তাঁর সামনেই যে দাঁড়িয়ে আছে—যাকে আবাহন করেছেন!

অনিন্দ্য এক কুমারী সে, মাথায় জড়ানো সোনালি মালা, গায়ে আধো-ঢাকা একটি তুষার-শাদা পোশাক। তার দীর্ঘ চুলের রাশি নেমে এসেছে কোমরের নিচে, সাঁঝের নরম সোনালির মতো সুন্দর তার রঙ্! যুবকটির দিকে অপলক চোখে সে চেয়ে আছে শুধু, নীল দুটি চোখে তার স্বর্গের হাসি। আকাশের নীলও অমন শান্ত-নির্মল নয়। তার দেহ-প্রতিমার প্রত্যেকটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এত অনিন্দ্যসুন্দর! হাত ও পা দুটি এত নিখুঁত ও নরম! পোশাকের প্রত্যেকটি ভাঁজে ভাঁজে ফুটে উঠেছে অনিন্দ্য তনু-রেখা। কুমারীর সমস্ত রূপ-লাবণ্যই যেন এসে ধরা দিয়েছে তার অঙ্গে অঙ্গে। ঠিক যেন এক বনদেবী—স্বর্গ থেকেই নেমে এলো! সত্যসত্যই এক বনদেবী! কেবলমাত্র তার কালো দুটি জোড়া-ভুরু একটুখানি কুঞ্চিত-কুটিল। আর, রঙ্ তার মলিন —যেন সে জ্বলন্ত সূর্যের দেশের মানুষ।

বিস্ময়ে পিতারের মুখ দিয়ে একটা কথাও ফুটছে না! বনপরীই কথা বলল প্রথম: 'তুমি ডেকেছ আমাকে, আমি তাই এসেছি। ঠিক লগ্নটিতেই ডেকেছ তুমি; আমিও একটি আশ্রয় খুঁজছিলাম মানুষের দেশে! আমাকে তোমার বাড়িতে নিয়ে চলো। আমার সঙ্গে আছে শুধুমাত্র মাথার এই মুকুটটি, এই পোশাক, আর এই ছোট্ট ব্যাগটি। আর কিছু নেই!'

এত নরম তার কণ্ঠস্বর, যেন পৃথিবীর কল-কোলাহলের মধ্যে থেকে শোনাই যাচ্ছিল না! কিন্তু ভাষা তার এত নির্মল যে তার একটু আওয়াজের কাঁপন শুনতে পেলে সজাগ হয়ে উঠবে দুনিয়ার সবচেয়ে উদাসীন লোকটির প্রাণও।

মেয়েটি যখন তাকে বাড়িতে নিয়ে যাবার কথা বলছিল আর বলছিল তার সঙ্গের তিনটে জিনিসের কথা, পিতার তখনি লক্ষ্য করে দেখলেন তাকে। তার হাতে রয়েছে লালরঙের একটা থলে, সোনালি ফিতে দিয়ে মুখ বাঁধা,—ভারি সরল-সুন্দর দেখতে থলেটি! মহিলারা সিনেমায় যাবার সময় যে-রকম ব্যাগে ক'রে গগ্‌ল্‌স নিয়ে যায়, অনেকটা তেমনি।

পিতার এবার জিজ্ঞেস করলেন—'আপনি কে?'

'আমি তুরান্দিনা, তুরান্দিন রাজার মেয়ে। আমার বাবা আমাকে ভালোবাসতেন খুবি; কিন্তু একবার আমি একটা অন্যায় কাজ ক'রে ফেললাম—ঔৎসুক্যের বশেই যদিও: প্রকাশ ক'রে দিলাম মানুষের ভাগ্য ও ভবিষ্যের গোপন রহস্য! ফলে, বাবা অসন্তুষ্ট হলেন খুবি, আমাকে তাড়িয়ে দিলেন তাঁর রাজ্য থেকে। কোনো একদিন অবশ্যি ক্ষমা করবেন, তখন আবার চলে যাব সেখানেই। কিন্তু এখন কিছুদিন মানুষের মাঝেই থাকব। তিনটে জিনিসও নিয়ে এসেছি তাই,—সোনার মুকুট, শাদা একটা জামা এই দেহের আবরণ, এবং এই থলেটি—আমার যতো কিছু দরকার সবি রয়েছে এতে। ভালোই হ'ল, তোমার সঙ্গেই দেখা। তুমি ভালো মানুষ, অসুখীদের জন্যে চেষ্টা ও দরদ আছে তোমার, মানুষের মধ্যে সত্য প্রতিষ্ঠার জন্যে প্রাণ দিতে পারো! তুমি আমাকে সঙ্গে নিয়ে চলো তোমার বাড়িতে, নিয়ে চলো; এজন্যে কোনোদিনই তোমাকে আফশোষ করতে হবে না।'

পিতার তো ভেবেই কূল-কিনারা পান না—কী বা ভাববেন আর কী বা করবেন। তবে এটা ঠিক যে, এই ভীরু মেয়েটি—আধা-ঢাকা যার দেহ, এত মৃদু ও নম্র যার কথা—তাকে কোথাও আশ্রয় দেওয়া উচিত। বনে তাকে একা ফেলে রেখে যাওয়াটাও চলে না, ধারে কাছে কোনো জন-বসতিও নেই। একবার ভাবলেন, হয়ত বা পলাতকা! আসল নামটা ঢাকা দিয়ে খুশিমতো একটা গল্প চালিয়ে দিচ্ছে নিজের নামে! হয়ত বা পাগলা গারদ থেকেই এসেছে পালিয়ে, বা নিজের বাড়ি থেকেই! তবে, তার মুখের ভাবে বা চেহারায় অবিশ্যি এমন কিছু নেই যে এসব সন্দেহ জাগতে পারে। কেবলমাত্র তার পোশাকটাই যা অপর্যাপ্ত, মুখের কথাও বিচিত্র—এই যা। মেয়েটি একেবারেই শান্ত, নম্র। নিজের নাম যে সে তুরান্দিনা বলছে—তা হয়ত কাউকে ঐ নাম ধরে সে ডাকতে শুনে থাকবে, অথবা পড়েছে তুরান্দিনার রূপকথা।

॥ ৩ ॥

এমনি ভাবতে ভাবতে পিতার এই অচেনা সুন্দরী মেয়েটিকে বললেন—'আচ্ছা শুনুন তো, আমার সঙ্গেই নিয়ে যাচ্ছি আপনাকে। কিন্তু আগেই আপনাকে জানিয়ে রাখছি,—সেখানে একা থাকি নে আমি, কাজেই আমার কাছে আপনার সত্যি পরিচয়টা দিলেই ভালো করতেন। ভয় হচ্ছে, আমার আত্মীয়-স্বজন একথা মোটেই কানেই তুলবে না যে আপনি হলেন তুরান্দিন রাজার মেয়ে। যতদূর জানা আছে আমার, এমনি কোনো রাজাই নেই আজকাল।'

তুরান্দিনা একটু হেসে বলল—'তোমাকে আমি সত্যি কথাই বলেছি। এখন, তোমার সব লোক বিশ্বাস করুন বা না করুন। তুমি তো বিশ্বাস করেছ, তবেই হ'ল আমার। আর, তুমি যদি আমাকে বিশ্বাস ক'রে থাকো, তবে তুমি আমাকে সমস্ত রকম অন্যায় ও দুঃখকষ্ট থেকেও প্রাণ দিয়ে রক্ষা করবে। কারণ, সৎলোক তুমি ; তোমার জীবন-নীতিই হ'ল সত্যকে জাগিয়ে তোলা, দুর্বলকে রক্ষা করা।'

পিতার ঘাড় কোঁচকালেন—ব্যাপার মন্দ নয়!

'আপনি যদি ঐ এক কথাই বলতে থাকেন তবে বেশ, আমিও আপনার সব ব্যাপার থেকেই সরে দাঁড়াচ্ছি। যাই হ'ক না কেন, আমাকে শেষে দায়ী করতে পারবেন না, আমার কোনো দোষ নেই। আপনাকে এখন অবশ্যি আমার সঙ্গেই নিয়ে যাচ্ছি বাড়িতে ; আরো ভালো জায়গা খুঁজে না পাওয়া পর্যন্ত সেখানে থাকতে পাবেন, আমার যথাসাধ্য সাহায্যও পাবেন। কিন্তু দেখুন, আমি নিজে আইনবিদ হিসেবেও আপনাকে আবার বিশেষ করে বলছি, আপনার প্রকৃত পরিচয়টি গোপন করবেন না।'

তুরান্দিনা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাসিমুখে শুনছে শুধু। পিতার থামলে, বলল সে—'কোনো ভাবনা কোরো না তুমি, সব ঠিক হয়ে যাবে। তুমি যদি আমাকে ভালোবেসে দরদ দিয়ে দেখো, তবে সুখে ভরে উঠবে তোমার ঘর। আমার প্রকৃত নাম-ধাম নিয়ে কখনো আর কোনো কথা বলতে যেয়ো না। তোমার কাছে সত্যিকথাই বলেছি আমি। এর চেয়ে বেশি কিছু বলব না তোমাকে, কারণ সব কথা বলতে বারণ। তোমার সঙ্গে নিয়ে চলো আমাকে। রাত হয়ে এলো যে! অনেকদূর থেকে এসেছি আমি ; সত্যিসত্যিই এখন আমার বিশ্রাম দরকার।'

পিতার তখনি মোলায়েম করে বললেন—'সত্যিই ক্ষমা করবেন আমাকে। আমি খুবি দুঃখিত। এমন বেয়াড়া জায়গা, একটা গাড়িঘোড়াও খুঁজে পাওয়া ভার।'

পিতার তার বাড়ির মুখে চলতে লাগলেন, তার পিছু পিছু। ক্লান্ত কোনো মানুষের মতো হাঁটছিল না সে মোটেই। পথে পথে শুকনো মাটি আর পাথর; কিন্তু তুরন্দিনার দুটি পা যেন মাটি স্পর্শ করছিল না। ভিজে ঘাস ও কাদায় ভরা পথে চলতে গিয়েও এক ফোঁটা দাগ লাগছিল না তার দুটি পায়ে।

এবারে পৌঁছল এসে তারা নদীটার উঁচু পাড়ে,—দূরে দেখা যাচ্ছে গ্রামের বাড়িগুলি। পিতার এবার তার সঙ্গিনীর দিকে তাকালেন কেমন এক অস্বস্তি নিয়েই, এবং কেমন বে-সামাল ভাবেই বললেন—'দেখুন, তুরান্দিনা দেবী…'

তুরান্দিনা ভুরু দুটি উপরে তুলে তার দিকে তাকাল, এবং পিতারের কথা শেষ না হতেই রাগের স্বরে বলে উঠল:

'বেশ তো! তুমি কি ভুলেই গেলে আমি কে, কি আমার নাম। আমি তুরান্দিনা, তোমার ঐ তুরান্দিনা দেবী নয়। তুরান্দিন রাজার মেয়ে আমি।'

'কিন্তু দেখুন, ক্ষমা করবেন শ্রীমতী তুরান্দিনা দেবী,—সত্যিই নামটা আপনার চমৎকার! অবশ্যি আজকাল বড়ো একটা চলে না আর—হ্যাঁ আপনাকে একটা কথা বলব আমি।'

'তা, তুমি অমন করে বলছ কেন?'—তুরান্দিনা আবার তাকে থামিয়ে দেয়—'তোমাদের পরিচিত মহিলাদের সামনে যেমন করে বলো সেভাবে বলছ কেন? তুমিই বলবে আমাকে; আমাকে ডাক দেবে—ঠিক প্রাচীন দিনের বীর যেন ডাকছে তার প্রিয়াকে।'

তুরান্দিনা কথা বলছিল এমন আবদার ও অধিকার নিয়ে যে পিতার তা আর না মেনে করেন কী! এবারে তিনি তুরান্দিনার মুখের দিকে ফিরে আপন জনের মতোই কথা বলতে লাগলেন, আর সবই যেন তাঁর কাছে হয়ে উঠল সহজ স্বাভাবিক।

'তুরান্দিনা, তোমার তো পর্যাপ্ত পোশাকও নেই। আমাদের ওখানকার সবাই তোমার যথোচিত পোশাক দেখতে না পেলে—'

তুরান্দিনা আবারো একটু হেসে বলল—

'সে আমি জানিনে তো! কেন, এই পোশাকটাই কি যথেষ্ট নয়? আমাকে

তারা বলে দিয়েছে : মানুষের রাজ্যে-যা-কিছু দরকার সবই পাবো এই ব্যাগটার মধ্যে। এটা নিয়ে একবার ভেতরটা দেখো তো, খুব সম্ভব ওতেই পেয়ে যাবে।' —এই বলে সে তার ছোট ব্যাগটি এগিয়ে দিল তাঁর দিকে। পিতার বাঁধন-মুখের ফিতেটা খুলতে খুলতে ভাবছিলেন—কেউ যদি কোনরকম একটা ফ্রকও এর ভিতর দিয়ে থাকে তো ভালোই।

ব্যাগের মধ্যে হাত ঢোকাতে কি যেন নরম একটা হাতে লাগল, টেনে বার করে দেখেন—একটা পার্শেল, এত ছোট যে তুরান্দিনা বোধ হয় তা মুঠোর মধ্যেই ধরতে পারে। পার্শেলটা খুলেই দেখতে পেলেন—ঠিক যা ভেবেছেন তাই। নতুন তরুণী মেয়েরা তখনকার কালে যেমনটা পরত ঠিক তেমনি।

তুরান্দিনাকে জামাটা পরতে সাহায্য করলেন তিনি, বোতাম পরিয়ে দিলেন—সেগুলি ছিল অবশ্যি পিঠের দিকেই।

'এবারে ঠিক হ'ল তো?' জিজ্ঞেস করল তুরান্দিনা।

পিতার করুণ চোখে তাকিয়ে রইলেন ব্যাগটার দিকে,—এত ছোট্ট ব্যাগে কি আর একজোড়া জুতো থাকবে? হাতটা ভিতরে ঢুকোতে গিয়ে ভাবছিলেন, —এক জোড়া স্যাণ্ডাল থাকলে বেশ হত।

তাঁর আঙুলে লাগল যেন স্যাণ্ডালের ফিতে; এবারও তুলে দেখেন সোনালি কাজকরা একজোড়া স্যাণ্ডাল। পিতার তুরান্দিনার সুন্দর পা দুটি মুছিয়ে দিয়ে স্যাণ্ডাল পরালেন, ফিতেগুলি বেঁধে দিলেন।

'এবার তো ঠিক হ'ল সব?'—আবারো বলল তুরান্দিনা; তার কথা বলার ভঙ্গীতে, তার কণ্ঠস্বরে এমন ভীরু নম্রতা!

পিতার দেখে শুনে বেশ খুশিই, একে বেশ সহজেই সামলানো যাবে—ভাবছিলেন তিনি। কাজেই বললেন—'বেশ হ'ল, একটা টুপি? তা পরে নিলেই হবে!'

॥ ৪ ॥

এমনি করে এক মর্তের মানুষের জীবনে নেমে এল এক রূপকথা। অবশ্যি মাঝে মাঝে মনে হ'ত যে এই তরুণ আইনজীবীর জীবনে এমন ঘটনা ঠিক খাপ খাচ্ছে না। তাঁর আত্মীয়-স্বজন তো কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছিল না এই তরুণীটির জীবন-বৃত্তান্ত, এমন কি পিতারেরও সন্দেহ ছিল যথেষ্টই। কতবার যে তিনি তুরান্দিনাকে একান্তভাবেই অনুরোধ করেছেন তার নামটা

বলতে,—অনেক ফন্দিও খাটিয়েছেন হঠাৎ এক ফাঁকে মিথ্যা কথাটা ধরে ফেলবার জন্যে। কিন্তু তুরান্দিনা তার এই জবরদস্তি সত্বেও রাগেনি একটুও। তার মুখে সরল একটি মিষ্টি-হাসি ফুটে থাকত শুধু, এবং আশ্চর্য ধৈর্যের সঙ্গে প্রত্যেক-বারই বলত সে,—'আমি তোমায় সত্যি কথাই বলেছি।'

'কিন্তু তুরান্দিন রাজার দেশটা কোথায়?'—পিতার জিজ্ঞেস করে বসতেন।

'সে অনেক দূরে!'—তুরান্দিনা বলতে থাকে, 'কিন্তু তোমার যদি সাধ হয় তো এই হাতের কাছেই সেই দেশ; তবে সেখানে তোমরা কেউ যেতে পারো না। শুধু আমরা যারা তুরান্দিন রাজার রাজ্যে জন্মেছি, তারাই যেতে পারি সেই দেশে।'

'কিন্তু কোন্ পথে সেখানে যায় বলতে পারো?'

'না, তা বলতে পারব না।'—বলে তুরান্দিনা।

'কিন্তু তুমি নিজে গিয়ে আবার ফিরে আসতে পার তো?'—পিতার আবার জানতে চায়।

'না, এখন আর পারি না; বাবা যখন আবার ডাকবেন, তখনি ফিরে যাব।'

সেই মায়াপুরী থেকে নির্বাসনের কথা বলার সময় তার গলায় কিন্তু ফুটে ওঠেনি কোনো আশঙ্কার ভাব, কিংবা তার মুখের উপরেও পড়েনি কোনো ব্যথার ছায়া! কোনো আনন্দের আভাসও নেই সেখানে। সব সময়েই তার স্বর এত শান্ত এত কোমল! সবকিছুর দিকেই সে এমন উৎসুক ভাবে তাকিয়ে থাকে যেন সবি দেখছে সে—এই প্রথমবার! তবু, একটুও চঞ্চলতা নেই তার। যেন সে ঠিকই জানে, দিনে দিনে সে পরিচিত হয়ে যাবে সবকিছুর সঙ্গেই—সবি চিনবে একে একে। একবার একটা জিনিসের নাম শিখলে কখনো সে আর ভুল করে না, বা অন্যকিছুর সঙ্গেও গোল পাকিয়ে ফেলে না। সবাই তাকে আচার-ব্যবহার বা রীতি-নীতি যেমনটা শিখিয়েছে বা সে নিজে নিজেই দেখে শিখেছে,—তার সবকিছুই সে আপনার করে নিয়েছে অতি সহজে, একান্ত স্বাভাবিক ভাবে। ছেলেবেলা থেকেই যেন সে এখানকারি মানুষ! পরিচিত লোকের নাম বা তাদের মুখ একবার চিনলে সে ভোলে না আর।

তুরান্দিনা কখনোই কারো সঙ্গে ঝগড়া করে না, কখনো জানে না কাকে বলে মিছেকথা। তাকে যখন পরামর্শ দেওয়া হ'ল ঘরসংসার করতে গেলে দু' একটা কথা ঢেকে বলতে হয়, মাথা নেড়ে সে বলেছে—'মিছে কথা বলা কারুরই

উচিত নয়। পৃথিবী যে কান পেতে শুনছে সব।'

বাড়ির আপন জন বা বাইরের লোকের সঙ্গে তুরান্দিনার আচরণ এমন সংযত-সুন্দর, এমন মর্যাদা-মধুর! রূপকথায় যারা বিশ্বাস করে তারা সবাই মনে করত: রূপকথার রাজকন্যাই নেমে এসেছে তাদের সামনে—মস্ত বড় এক দয়ালু রাজার কন্যা যে রাজকন্যা।

কিন্তু তরুণ ব্যবহারজীবীর জীবনের সঙ্গে এবং দশজনের দৈনন্দিন জীবনের মধ্যে রূপকথার মিল মেলানো খুবি দুঃসাধ্য ব্যাপার। সব সময়েই যেন এই দুই দেশের মধ্যে একটা নিরন্তর দ্বন্দ্ব। ফলে, এ থেকেই অনেক অসুবিধের ব্যাপার হয়ে দাঁড়াল।

॥ ৫ ॥

তুরান্দিনা পিতারের সঙ্গে এসেছে মাত্র কয়েক দিন হ'ল। এর মধ্যেই একদিন এক অফিসার এসে বাড়ির চাকরটাকে বলল—'শুনতে পাচ্ছি একটি তরুণী মহিলা এসেছেন এখানে, তাঁর পাসপোর্টখানায় সই করিয়ে আনা উচিত।'

চাকরটা ডাকল তার মাইজীকে। মাইজী এসে তার স্বামীকে অর্থাৎ কিনা পিতারের ভাইপোকে জানাল, ভাইপো গিয়ে পিতারকে জিজ্ঞেস করল তুরান্দিনার ছাড়পত্রের কথা। তুরান্দিনাকে জিজ্ঞেস না করে পিতারই বা বলবেন কী? তুরান্দিনা তখন বারান্দায় বসে চমৎকার একটা বইয়ের ভিতর ডুবে আছে। তুরান্দিনার কাছে এসে পিতার ডাকলেন—'পুলিশ এসে তোমার পাসপোর্ট দেখতে চাইছে। সেটা সই করিয়ে আনা দরকার।'

তুরান্দিনা মুখ তুলে মনোযোগ দিয়ে শুনল পিতার কি বলছে, তারপর বলল—'পাসপোর্ট কি জিনিস?'

'আঃ, পাসপোর্ট,—জানো না? মানে, তোমার পাসপোর্টটা। একটা কাগজে লেখা থাকবে তোমার নাম-ধাম, বাবার নাম, তোমার পেশা, পদমর্যাদা —এই সব। পাসপোর্ট ছাড়া তুমি বোধ হয় কোথাও থাকতে পারো না।'

'তা দরকার হয় যদি'—তুরান্দিনা শান্তভাবেই বলল, 'তা হ'লে নিশ্চয়ই আমার ঐ ছোট্ট ব্যাগটিতেই থাকা উচিত। এই নাও আমার ব্যাগ, চেয়ে দেখো ভিতরে আছে কিনা।'

এবং সেই আশ্চর্য ব্যাগটির মধ্যে সত্যিসত্যিই একটা পাসপোর্ট,—ছোট্ট একটি বইয়ের মতো, ধূসর-রঙ্ যার মলাট। পাসপোর্টটা দেওয়া হয়েছে অভ্রাখান

প্রদেশ থেকে। ভিতরে স্পষ্ট অক্ষরে লেখা: নাম রাজকুমারী তামারা তিমোফিভানা তুরান্দিনা, বয়স সতেরো, কুমারী। সবকিছুই রয়েছে যেমনটা ঠিক-ঠিক চাই: শীলমোহর, অফিস-সংক্রান্ত সই, রাজকন্যার নিজের সই, স-ব —পাস্‌পোর্টে যেমনটা থাকে ঠিক।

পিতার তুরান্দিনার দিকে হাসিমুখে তাকিয়ে থেকে বললেন—'ও, তবে এই হ'ল তোমার পরিচয়। রাজকন্যা তুমি, তামারা তোমারি নাম।'

তুরান্দিনা কিন্তু ধীরে ধীরে মাথা নাড়ছিল,—'না, কেউ তো আমাকে তামারা ব'লে ডাকেনি কোনোদিন। পাস্‌পোর্টে সত্যি কথা লেখে না; ও শুধু পুলিশের জন্যেই। যারা সত্যি জানতে চায় না বা জানতে পারে না তাদের জন্যেই ও সব। আমি তুরান্দিনা, তুরান্দিন রাজার মেয়ে। আমি এ পৃথিবীতে এসে অবধি বুঝতে পারছি—কেউ এখানে সত্যকে জানতে চায় না। পাস্‌পোর্ট প্রসঙ্গে কিছুই তো জানিনে আমি! ওটা যিনি আমার ব্যাগে রেখেছেন তিনি ভেবেছিলেন আমার ওটা প্রয়োজন হতেও পারে! কিন্তু তোমার কাছে আমার মুখের কথাই তো সব।'

পাস্‌পোর্ট সই হবার পর থেকে তুরান্দিনা পরিচিত হ'ল রাজকন্যা নামে, বা তামারা নামে। তবে, তার নিজের ঘরের লোকে ডাকত তাকে তুরান্দিনা।

॥ ৬ ॥

সকলেই তার আত্মীয়স্বজন;—কারণ এখানে তারাই এখন তুরান্দিনার আত্মীয়-স্বজন! স্বপ্নরাজ্য থেকে রূপকথা নেমে এসেছে মানুষের জীবনে। এবার, রূপকথায় যেমনটা হয় প্রায়ই, এখানেও হ'ল তাই। পিতার বুক ভরে ভালোবাসল তুরান্দিনাকে, তুরান্দিনাও পিতারকে। পিতার ঠিক করল বিয়ে করবে ওকে। আর, এই নিয়েই ব্যাপারটা একটু জটিল হয়ে দাঁড়াল।

শিক্ষক ভাইপো ও তার স্ত্রী বলল পিতারকে,—'মেয়েটি কে, কোথাকার, কিছুই জানা নেই! নিজের বংশপরিচয় সে কিছুতেই খুলে বলবে না—জিদ্ ধ'রে আছে। তা হ'লেও তুরান্দিনা মেয়ে ভালোই, যেমন রূপ তেমনি গুণ! মনে হয় ভালো বংশেরই মেয়ে! কিন্তু তা হ'লেও তোমার খেয়াল রাখা উচিত পকেট তোমার গড়ের মাঠ! এবং মেয়েটিরও তাই। তোমার বাবা যা টাকা পাঠান তাতে পিটার্সবুর্গের মতো শহরে দু'জনের থাকা খুবই কঠিন—বিশেষ ক'রে এক রাজকন্যাকে নিয়ে,—এবং তোমার এটাও খেয়াল থাকা উচিত যে

স্বভাব-চরিত্র তার নম্র হ'লেও সম্ভবত সে আদরে আবদারে থাকতেই অভ্যস্ত হ'য়ে এসেছে। হ্যাঁ, ছোট্ট হাত দুটিতে তার কী লক্ষ্মী-শ্রী! সত্যিই, মেয়েটা রয়েছেও এখানে মাটির মতো, এমন নম্র শান্ত! আর তুমি নিজেই তো বলেছ, প্রথম যখন দেখলে স্যাণ্ডালও ছিল না তার পায়ে, গায়েও ছিল না উপযুক্ত জামা! তা নয় বুঝলাম, কিন্তু এই মেয়েই আবার শহরে পা দিয়ে কি রকম পোশাকের বায়না ধরবে তা আগে থাকতেই বলি কি ক'রে?'

পিতার তো প্রথমে মুষড়েই পড়লেন। কিন্তু এবারে হঠাৎ মনে পড়ল তুরান্দিনার সেই ছোট্ট ব্যাগটি; ওতেই তো পোশাকটা পেয়েছিলেন। কেমন বল-ভরসা জেগে উঠল তাঁর মনে, হাসিমুখেই বললেন তিনি—

'তুরান্দিনার ঘরোয়া ফ্রকটা তো তার ছোট্ট ব্যাগেই পেয়েছি, হয়তো খুঁজে দেখলে একটা বিয়ের পোশাকও পাওয়া যেতে পারে।'

কিন্তু শিক্ষকের স্ত্রীর মনটা ছিল খুব দরদী, ঘরসংসারের বুদ্ধিও ছিল খুব; সে বলল—'সবচেয়ে ভালো হয় তুমি যদি কিছু টাকা জোগাড় করতে পারো। মেয়েটির হাতে যদি পাঁচশ রুবলও থাকত, তা হ'লেও টেনেটুনে একটা ব্যবস্থা করে নিতাম।'

'কিন্তু রাজকন্যার যৌতুক যে! লাখ রুবলের কমে কি আর চলে!'—হাসতে হাসতেই বলছিলেন পিতার।

'তা, হাজার রুবলই দেখে কে?'—পিতারের ভাইপোও হাসিমুখে জবাব দেয়।

তুরান্দিনা ঠিক তখনি ধীরে ধীরে আসছিল বাগানের দিক থেকে। পিতার জিজ্ঞেস করলেন—'আচ্ছা তুরান্দিনা, তোমার ছোট্ট ব্যাগটা আনো তো একটিবার! ভিতরে যদি লাখখানেক থাকে তো—!'

তুরান্দিনা তার ছোট্ট ব্যাগটি এগিয়ে দিয়ে বলল—'যদি দরকার হয়, নিশ্চয়ই পাবে ওখানে।'

পিতার আবারো ব্যাগের মধ্যে হাতটা পুরে মস্ত বড় একতাড়া নোট বার করেই গুণতে লাগলেন, আগেই স্পষ্ট দেখছেন যথেষ্টই রয়েছে ওখানে।

॥ ৭ ॥

এমনি করে সুন্দর রূপকথা নেমে এল এক যুবকের নবীন জীবনে। রূপকথার আসন সেখানে ঠিক মানানসই না হ'লেও, জুড়ে গেঁথে রইল তবু। রূপকথা

তাঁর জীবনে বিছিয়ে দিল এক বিশিষ্টতা—রূপকথারি আপন মহিমায় আর তার ঐন্দ্রজালিক ব্যাগটির ধনদৌলতের ছটায়!

তুরান্দিনা ও তরুণ এ্যাড্‌ভোকেটের বিয়ে হ'ল এবার। প্রথমে একটি ছেলে হ'ল তুরান্দিনার, তারপর একটি মেয়ে। ছেলেটি হ'ল ঠিক তার মায়ের মতো; দিনে দিনে হয়ে উঠল সে নম্র ও স্বপ্নালু! আর মেয়েটি তার বাবার মতোই,—চালাক চতুর, হাসিখুশি!

এমনি করে কেটে গেল কয়েক বছর। কিন্তু প্রত্যেকবারেই বসন্ত এলে এক বিচিত্র বেদনার ছায়া পড়ত তুরান্দিনার চোখে মুখে। তখন ভোরে ভোরে উঠে গিয়ে সে দাঁড়িয়ে থাকত বনের কিনারায়, শুনত বসে সেখানকার বিচিত্র ভাষা-গুঞ্জন। কিছু পরে সে ঘরে ফিরে আসত ধীরে ধীরে।

তারপর একদিন। দুপুর বেলায় সে দাঁড়িয়ে আছে সেই বনের পাশে; সহসা কানে এল এক ব্যাকুল আহ্বান! ডাক এসেছে তার—'তুরান্দিনা, ফিরে এসো; তোমার বাবা ক্ষমা করেছেন তোমাকে!'

সে চলে গেল, ফিরল না আর। তখন তার ছেলেটির বয়স সাত, আর ছোট্ট মেয়েটির তিন।

এমনি করে রূপকথা হারিয়ে গেল এই জীবন থেকে, আর ফিরে এল না কখনো। কিন্তু তুরান্দিনার ছোট্ট ছেলেটির বুকে জেগে রইল তার মায়ের স্মৃতিটুকু।

মাঝে মাঝে একা একা ঘুরে বেড়াত সে মনভোলা নিরালায়; বাড়ি ফিরে এলেই তার মুখের উপর দেখা যেত এমন একটি নরম-মধুর মায়া! শিক্ষকটির স্ত্রী তা দেখে চুপি চুপি তার স্বামীকে বলত—

'দেখলে তো, ছেলেটা তুরান্দিনার কাছ থেকেই এল!'

## ॥ ধ্বংস হও, দস্যুদল ॥

ঈশ্বর-প্রতীক রোমীয় সম্রাট সিজারের উদ্দেশে প্রণত হতে বা তাঁকে পুজো নিবেদন করতে অস্বীকার করেছে যে সব বিদ্রোহী, তাদের কঠিন ঔদ্ধত্য বিজয়-বিক্রমে দমন করে অশ্বারোহী সৈন্যদল ফিরে যাচ্ছে তাঁবুতে। সম্রাট সিজারের শত্রুদের অধিকাংশকেই হত্যা করা হয়েছে, রক্তে রক্তে ভেসে গেছে দেশ। ক্লান্ত সৈন্যদল তাঁবুতে ফিরবার সানন্দ মুহূর্ত্তটির প্রতীক্ষা করছে অধীর ঔৎসুক্যে। বিদ্রোহী গ্রাম থেকে যে সব মহিলা ও কুমারীদের তাঁবুতে ছিনিয়ে আনা হয়েছে তারা তো এখন ওদেরি সম্পত্তি!

স্বামী ও পিতাদের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই এইসব মহিলা ও কুমারীরা যখন তাদের ঘরে ঘরে আগুন জ্বালিয়ে দিচ্ছিল—তক্ষুনি তাদের ধরে বেঁধে গাড়ীতে ফেলে, পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে সোজা তাঁবুতে—বিজয়ের অগ্রিম লাভ-স্বরূপ!

অশ্বারোহী সৈন্যদল ফিরে চলেছে বাঁকা পথে। কারণ, কতকগুলি বিদ্রোহী গ্রামবাসী পালিয়ে রয়েছে গুপ্ত বনাঞ্চলে, সেনাপতি সেঞ্চুরিয়ন তাদেরকেও সাবাড় করে যেতে চান। সৈনিকদের তলোয়ার স্নান করে উঠেছে অজস্র রক্তে, ঘায়ে ঘায়ে ভোঁতা হয়ে গেছে বর্শা—তবু রোমীয় সৈন্যের ক্ষুধা লুব্ধ হয়ে আছে নতুন রক্তধারার জন্যে!

গুমোট গরম, চারদিকে অপরাহ্নের স্তব্ধতা। মেঘমুক্ত আকাশে নিষ্ঠুর দীপ্তি। আকাশের জ্বলন্ত অগ্নিরাক্ষস দিগন্তহীন ক্লান্ত শূন্যতার বুকে ছুঁড়ে মারছে ক্রোধান্ধ রশ্মির বর্শা। শুষ্কঘাস জ্বলন্ত সূর্যের তাপে এলিয়ে পড়ছে—তৃষ্ণায় আধমরা মাটির উপর।

অশ্বের খুর থেকে উৎক্ষিপ্ত হচ্ছে ধূমায়িত ধূলি, স্তব্ধ বাতাসে ঝুলে রয়েছে মেঘের মতো আস্তরণ। ধূলিমেঘের মধ্যে দিয়ে পেছনের গ্রামগুলি দেখা যাচ্ছে বিষণ্ণ স্তব্ধ, যেন কোন অমঙ্গল ইঙ্গিত!

হিংস্র দেবতার ক্রুদ্ধ চোখে দগ্ধ হয়ে অশ্বখুরের নিচে সমস্ত মাঠ পড়ে আছে বিধ্বস্তের মতো। লৌহখুরের দৃপ্ত আঘাতে কেঁপে কেঁপে বারবার গোঙানি দিয়ে উঠছে সমস্ত পথ। ক্বচিৎ সামনে পড়ছে কোনো দরিদ্র পল্লী—কয়েকটি

জীর্ণ কুটীর! রৌদ্রশ্রান্ত সেঞ্চুরিয়ন নিবৃত্ত হলেন পলাতকদের অনুসন্ধানে। অশ্বের গতির তালে তালে জিনের উপর দুলতে দুলতে তিনি ভাবছিলেন শুধু পথপ্রান্তের কথা,—এই রৌদ্র থেকে বিশ্রাম, শান্তিময় তাঁবু, রাত্রির নদী, রাত্রির নতুন সঙ্গিনী।

এক তরুণ সৈন্য হঠাৎ তার চিন্তাধারায় বাধা দেয়—'ঐ যে রাস্তার পাশে একদল লোক! সেনাপতি সেঞ্চুরিয়ন, আদেশ করুন ঝঞ্ঝার মতো ঝাঁপিয়ে পড়ে ওদের ছত্রভঙ্গ করে দিই। অশ্বের বেগে যে হাওয়া বয়ে যাবে, তাতেই চলে যাবে আমাদের এই গুমোট ভাব, মুছে যাবে আপনার ও আমাদের দেহের ধুলো দেহের ক্লান্তি!'

সেঞ্চুরিয়ন তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন সেইদিকে—'না, লুসিলাস!'—হাসিমুখে বলেন তিনি—'ওরা তো একদল শিশু, রাস্তার পাশে খেলছে; ধাওয়া করবার মতো জীব নয়, তারচে বরং ওরা চেয়ে চেয়ে দেখুক আমাদের এই চমৎকার অশ্বশ্রেণী, আমাদের বীর সৈন্যদল। এই অল্প বয়সেই মনের মধ্যে অঙ্কিত হয়ে থাক—রোমীয় সৈন্যবাহিনীর বিরাট বীরত্ব, আর ঈশ্বরতুল্য অজেয় সিজার-সম্রাটের অতুল বিজয়-গৌরব কাহিনী।

সেঞ্চুরিয়নের কথার উপর কথা বলতে সাহস পায় না তরুণ লুসিলাস, কিন্তু রাগে অন্ধকার হয়ে আসে তার মুখ। সে তার নির্দিষ্ট স্থানে পিছিয়ে এসে আর একটি তরুণ সৈন্যকে ফিস্‌ফিস্ করে বলে—

'ঐ শিশুরাও সম্ভবত বিদ্রোহীদেরই সন্তান। সোল্লাসে ওদের কেটে ফেলতে ইচ্ছে হচ্ছে। আমাদের সেঞ্চুরিয়নের মন দুর্বল হয়ে পড়েছে—রোমীয় সৈনিকের উদ্ধত বীরত্ব হারিয়ে ফেলছেন তিনি।'

কিন্তু সঙ্গীটি অপ্রীতির সঙ্গেই উত্তর দেয়—'ছেলেদের সঙ্গে যুদ্ধ করে লাভ কি, কী বা গৌরব! যারা আত্মরক্ষা করতে পারে তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করলেই হবে।'

লুসিলাস লাল হয়ে ওঠে, চুপ করে থাকে। শিশুদের কাছাকাছি এসে গেছে সৈন্যদল। ছোটরা খেলা ছেড়ে রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সৈন্যদের দিকে বিস্মিত চোখে মেলে চেয়ে চেয়ে দেখছে—দেখেছে তাদের সুন্দর অশ্বদল, উজ্জ্বল অস্ত্রশস্ত্র, রৌদ্রদগ্ধ মুখগুলি। তারা অবাক হয়ে যায়, অপলক চোখে তাকিয়ে থাকে—বিস্মিত বিহ্বল চোখে।

হঠাৎ লিন নামে সুন্দর একটি ছেলে অপ্রত্যাশিত ভাবেই চীৎকার করে

ওঠে, তার কালো চোখ দুটিতে ঝলকে ওঠে প্রদীপ্ত ঘৃণা—'দস্যু, দস্যুদল!'

সে তার ছোট্ট হাতখানি দিয়ে দেখিয়ে দেয় সেঞ্চুরিয়ণকে, ছেলেটির কথা শুনতে না পেয়ে তিনি অবশ্যি চলেই যাচ্ছিলেন নীরবে।

ছেলেরা লিনের কথায় ভয় পেয়ে তাকে ঘিরে ধরে, অনুরোধ করে অমন কথা আর না বলতে। নিজেরা ফিস্‌ফিস্‌ করে বলাবলি করতে থাকে—

'চলো ছুটে যাই, নইলে মেরে ফেলবে আমাদের!' মেয়েরা কেঁদে ওঠে! কিন্তু ফুটফুটে ছেলে লিন সঙ্গীদের ভিড ছাড়িয়ে এগিয়ে গিয়ে সৈন্যদের দিকে ঘুষি উঁচিয়ে বলতে থাকে আবারো—

'খুনী! খুনীর দল! নিরীহ লোকদের উপর তোমরা জঘন্য অত্যাচার করেছ!'

তার কালো চোখ ঝলসে ওঠে ক্রোধে,—বারবার সে চীৎকার করে বলতে থাকে,—'ঐ খুনী দল, ঐ ঐ দস্যুদল!'

শিশুরা মিলে হৈ চৈ করে ওঠে, তার কথা ডুবিয়ে দিতে চেষ্টা করে; কেউ কেউ তার হাত ধরে টেনে আনে, কিন্তু লিন তাদের ছাড়িয়ে এসে সম্রাটের সৈন্যদলকে আবারো অভিশাপ দিতে থাকে।

অশ্বদল থমকে দাঁড়ায়, তরুণ সৈনিকটি গর্জে ওঠে—'বিদ্রোহী কাফেরের দল! এদের বুকেও জ্বলে উঠেছে বিদ্রোহের স্ফুলিঙ্গ, এদেরো ধ্বংস করতে হবে সদলে। রোমীয় সৈনিককে অপমান করে পৃথিবীতে কেউ বাঁচতে পারে না।'

এমন কি প্রৌঢ় সৈনিকেরাও সেঞ্চুরিয়ণের কাছে অভিযোগ জানায়—'এই শয়তানদের চাই নির্মম শাস্তি। আদেশ করুন, এক্ষুনি ওদের হত্যা করে ফেলি। এই কাফেরদের কচি থাকতেই ধ্বংস করা দরকার, বড় হ'লে ওরাই দল বেঁধে যথেষ্ট ক্ষতি করবে।'

'যাও, হত্যা করো। যারা আমাদের লক্ষ্য করে বলেছে, তাদের সবাইকেই হত্যা করো। অন্য সবাইকে এমন শাস্তি দিয়ে ছেড়ে দাও, চিরদিন যাতে মনে থাকে রোমীয় সৈনিককে অপমান করা কী ভয়ানক!'

সেঞ্চুরিয়ন ও অশ্বারোহী সৈন্যদল ধূলি-ঝাপটার মধ্য দিয়ে ঝড়ের মতো ঘোড়া ছুটিয়ে দিল সেই শিশুদের দিকে।

সৈন্যদের আসতে দেখে লিন তার সঙ্গীদের চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলল,—'চলে যাও, শিগ্‌গির চলে যাও সবাই; আমাকে তোমরা বাঁচাতে পারবে না। আমিও যদি তোমাদের সঙ্গে ছুটি তো এই পাষণ্ডেরা—এই দস্যুরা আমাদের সবাইকেই

খুন করে ফেলবে। আমি যাব না,—এরকম হীন অত্যাচারের মাঝে বাঁচতেও ইচ্ছা হয় না আমার।'

লিন বীরের মতো শক্ত হয়ে দাঁড়ায়। ভীত ও ক্লান্ত সঙ্গীরা তাকে টেনেও নাড়াতে পারে না। সঙ্গীরাও চারদিকে দাঁড়িয়ে থাকে হতভম্বের মতো। নিমেষের মধ্যেই সৈন্যদল এসে ঘিরে ফেলে তাদের।

উদ্যত তলোয়ারগুলি ঝিকমিক করে উঠল প্রখর সূর্যালোকে। শিশুরা কাঁপতে কাঁপতে কেঁদে উঠল, জড়সড় হয়ে দাঁড়াল।

জ্বলন্ত রুদ্রদেব সৈন্যদের রক্ত গরম করে তুললেন,—জাগিয়ে তুললেন নরহত্যার উন্মাদ পিপাসা।···লিন কিন্তু বীরদর্পে শিশুদের ভিড় থেকে এগিয়ে গেল, সেঞ্চুরিয়নকে লক্ষ্য করে বলল—

'শোনো বৃদ্ধ, আমিই তোমাদের সৈন্যদলকে বলেছি খুনী, বলেছি দস্যু! এ আমার কথা নয়, ভগবানের অভিশাপ! তোমাদের দুর্বৃত্ত সৈন্যদল এই সব ছেলেমেয়েদের খুন করবে,—এদের বাবা-মাকেও হত্যা করবে,—তাই এরা ভয়ে মরছে, তোমাদের কাছে তারা মাথা নত করে আছে। কাজেই, তোমাদের রক্ত পিপাসা যদি এখনো মিটে না থাকে তো আমাকে হত্যা করো তোমরা। আমি তোমাদের ভয় করি না, আমি ঘৃণা করি তোমাদের। থুথু দিই তোমাদের তলোয়ারের উপর, পদাঘাত করি তোমাদের এই অন্যায় বিজয়কে। তোমাদের দুর্বৃত্ত সেনাবাহিনী আমাদের দেশে যথেচ্ছ উৎপীড়ন করেছে, এদেশে বাঁচতে চাই না আমি। এখনো ছোট আমি, তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করার মতো বড় হইনি, তা না হ'লে সমানে যুদ্ধ করতাম আজ। কাজেই এখন সুযোগ পেয়েছ—বেশ, হত্যা করো আমাকে।'

খানিকটা বিমূঢ় হয়ে পড়েন সেঞ্চুরিয়ণ, কিন্তু তক্ষুনি গর্জে ওঠেন—

'না, শয়তানের বাচ্চা! তোর ইচ্ছা নয়, আমাদের ইচ্ছাই মানতে হবে। এক্ষুনি সাবাড় হবি তুই, তবে একমাত্র তুইই নস্।'—এই বলেই সৈন্যদের আদেশ করলেন:

'হত্যা করো, নির্মম ভাবে হত্যা করো। এই সাপের বাচ্চাদের সবংশে ধ্বংস করো—একটাও যেন বেঁচে না থাকে। তা না হ'লে, এই বীর বালকের কথা সকলের প্রাণে জ্বলতে থাকবে শিখার মতো। সবাইকেই হত্যা করো, নির্মমভাবে ধ্বংস করো,—ছোট, বড়, শিশু—সব!'

সৈন্যরা ঝাঁপিয়ে পড়ে নৃশংস অস্ত্রাঘাতে খণ্ডবিখণ্ড করে ফেলল সমস্ত শিশুদের।

বিষণ্ণ প্রান্তর, ধূলি-ধূসরিত পথ বার বার প্রতিধ্বনিত হতে লাগল শিশুদের মরণ-চীৎকারে। ঝাপসা দিগন্ত দু-তুবার আর্তনাদ করে নীরব হয়ে রইল। অশ্বদল নাক ঝাড়তে ঝাড়তে তাজা রক্তের ঘ্রাণ নিচ্ছিল, আর লৌহ খুরে পিষে দিচ্ছিল হতভাগ্য দেহগুলি।

হিংস্র হাসি হাসতে হাসতে সৈন্যদল ফিরে এল নিজেদের পথে; খুশিভরে কথাবার্তা বলতে বলতে তাড়াতাড়ি ছুটে চলল তাঁবুর দিকে।

কিন্তু সামনে বারবার শুধু ঝিলমিল করে উঠছে রুদ্রের রুষ্ট নয়নে দগ্ধ—ধূলি-ধূসরিত পথ। নেমে এসেছে সন্ধ্যার কালো যবনিকা, রুদ্রদেব হারিয়ে গেলেন অন্ধকারের মধ্যে। সন্ধ্যার শান্তি কিন্তু নামেনি তখনো। ভয়ে থমকে আছে স্তব্ধ বাতাস। রুদ্রদেব অন্ধকারে অদৃশ্য হতে হতে সেঞ্চুরিয়ণের চোখে তাকিয়ে রইলেন, হাসলেন এক ভয়ঙ্কর-শান্ত হাসি। চারদিকে ক্লান্ত-স্তব্ধ আবছা অন্ধকার। তালে তালে বেজে উঠছে অশ্বখুরের অস্ফুট ধ্বনি। বিষণ্ণ সেঞ্চুরিয়ণ।

খুরের অবিশ্রাম আওয়াজের মধ্য দিয়ে বিষণ্ণ-ধূসর নিশ্চল ধূলি-মেঘের মধ্য দিয়ে এগোচ্ছে তারা। এ পথের যেন আর শেষ নেই। রাত্রি ঘনতর হয়ে আসতে ক্রমেই দীর্ঘতর হয়ে উঠল পথ। তাদের মনে হতে লাগল একান্ত নিঃসঙ্গ এই স্তব্ধ প্রান্তরের সুদূরে ধ্বনিত হচ্ছে ধাবন্ত খুরের ফাঁপা শব্দ। কেমন একটা আশঙ্কা ঘিরে ধরল তাদের। এই ভয় ও ক্লান্তি বড় ভয়ঙ্কর, বড় ভীষণ।

দূরে কোথা থেকে আসছে কেমন শব্দ! কী দ্রুত ছুটে আসছে তাদের দিকেই। এবার স্পষ্ট শোনা যায় একটি ছেলের কান্নার আওয়াজ।

সেঞ্চুরিয়ণ সৈন্যদের দিকে একবার তাকিয়ে দেখেন। তাদের অবনত মুখে ঘনিয়ে রয়েছে রাত্রির কালো ছায়া। ধূলিতে ধূসরিত, ক্লান্তিতে চুপসানো মুখ,—আর তারি উপরে এসে পড়েছে এক বিমূঢ় আশঙ্কার ছাপ!

লুসিলাসের শুষ্ক ওষ্ঠ নড়তে থাকে—'তাঁবুটা দেখা যেত একবার!'

'কি বলছ, লুসিলাস?'—তরুণ সৈনিকটির মুখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন সেঞ্চুরিয়ণ।

লুসিলাস ফিস্‌ফিস্ করে উত্তর দেয়—'ভয় হচ্ছে আমার!' ভয়ের কথা স্বীকার করায় লজ্জিত হয়ে সঙ্গে সঙ্গেই সে উচ্চস্বরে বলে ওঠে—'যা গরম পড়েছে!'

কিন্তু আবারো সে কেঁপে ওঠে, বলে—'ঐ ভয়ঙ্কর ছেলেটি আমার মন জুড়ে রয়েছে, আমাকে ধাওয়া করছে সে। ডাইনীদের সঙ্গে নিশ্চয়ই ষড়যন্ত্র আছে

ওর, আমরা তাকে কেটেছিই শুধু, ধ্বংস করতে পারিনি, মন্ত্রপূত ও……'

সেঞ্চুরিয়ণ তার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ঘুরিয়ে নিলেন সমস্ত কালো প্রান্তরের উপর দিয়ে ; কাছে বা দূরে কোথাও চিহ্ন নেই কোনো জনপ্রাণীর।

'কার্থেজের বুড়ো পুরুতের কাছ থেকে যে কবচটা পেয়েছিলে, সঙ্গে আছে তো সেটা? সে কবচ যে পরে ভূত বা প্রেতরা তাকে স্পর্শও করতে পারে না।'' —বলেন সেঞ্চুরিয়ণ।

'সঙ্গেই রয়েছে।'—লুসিলাস বলে—'কিন্তু, আমার বুকের ভেতরটা যেন তা পুড়িয়ে দিচ্ছে। আমাদের পিছু ধাওয়া করছে পৃথিবীর সব অপদেবতারাই,. মাটি থেকে তারা যে উঠে আসছে তাও শুনতে পাচ্ছি আমি।'

'ভুল করছ তুমি!'—যুক্তি দিয়ে সেঞ্চুরিয়ণ তাকে আশ্বস্ত করতে চান— 'তাদের জন্যে আজ আমরা বিরাট এক ভোজের ব্যবস্থা করে দিয়েছি, তারা বরং আমাদের উপর খুশিই। তা যাই হ'ক, বীর সৈনিকদের বুকের নিচে ভয়ের লেশ মাত্রও থাকা উচিত নয়,—এমন কি নির্জন প্রান্তরে অপদেবতার কান্না শুনেও নয়।'

'ওরে বাবা, একি ভয়!'—লুসিলাস চীৎকার করে ওঠে—'ঐ, ঐ যে, সেই আশ্চর্য শিশুটি চীৎকার করে আমাদের ধাওয়া করছে।'

হঠাৎ স্তব্ধ রাত্রির বুক চিরে ধ্বনিত হয়ে উঠল একটা গোঙানি—'ধ্বংস হও, ……ধ্বংস হও, খুনীর দল! নৃশংস সৈন্যদল, তোদের রক্ষা নেই!'

সৈন্যরা ছুটে চলে অশ্বদের চাবুকের পর চাবুক মেরে। কিন্তু সেঞ্চুরিয়ণ ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠেন, উচ্চস্বরে ভর্ৎসনা করেন সবাইকে,—'তোমাদের লজ্জিত হওয়া উচিত। কাকে ভয় করো তোমরা? ঈশ্বর-তুল্য মহান সিজারের সৈন্যদল কিনা ছায়া দেখেও ডরায়? কাকে দেখে পালাচ্ছ তোমরা? তোমাদের হাতেই নিহত এক বালককে দেখে? অপবিত্র অশুভ শক্তিতেই পুনর্জীবিত একটি মৃতদেহকে দেখে? মাথা উঁচু করে রাখো, মনে রাখবে রোমীয় সৈন্যবাহিনী শত্রুকে শুধু ধ্বংসই করে না,—শত্রুর মিথ্যা মন্ত্রশক্তিকেও ধ্বংস করে।'

সৈন্যগণ লজ্জিত হয়। সেঞ্চুরিয়ণের আদেশে থমকে দাঁড়ায় সবাই। নিস্পন্দ নির্বাক হয়ে তারা শুনতে থাকে রাত্রিকালীন সাড়াশব্দ। স্পষ্টতই এই পথে কে যেন তাদের ধাওয়া করে আসছে,—বার বার অভিশাপ দিচ্ছে। অন্ধকারের মধ্যে বা প্রান্তরের আবছা ছায়ায় কিছুই দেখা যায় না, কিন্তু বার বার ধ্বনিত হয়ে উঠছে একটি শিশুর তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর।

'চলো, দেখে আসি কে সে ?'—একজন সৈন্য এই কথা বলতেই সকলে অশ্ব ছুটিয়ে দিল ঐ আওয়াজ লক্ষ্য ক'রে। রাস্তা থেকে বহুদূরে এসে হঠাৎ তারা দেখতে পেল : অদ্ভুত একটি ছেলে ছুটে যাচ্ছে প্রান্তরের মধ্যে দিয়ে! ছেঁড়া তার জামা, মাথার চুল রক্তে ভিজা। ছুটতে ছুটতে তার গা থেকে ঝরছে রক্তের ধারা—সে চীৎকার করে ভয় দেখাচ্ছে, আর এক হাত উপরে তুলে অভিশাপ দিচ্ছে—'ধ্বংস হও, খুনীর দল!'

ক্ষ্যাপা ক্রোধে সৈন্যদল তলোয়ার উচিয়ে তুলে ঝাঁপিয়ে পড়ল ছেলেটির উপর। তাকে হত্যা করল, ছিন্নভিন্ন করে ফেলল,—অশ্বের খুরে খুরে মাড়িয়ে দিল সেই মাংসস্তূপ, ছুঁড়ে ছুঁড়ে মারল উত্তরে দক্ষিণে, পূবে পশ্চিমে দিগ্বিদিকে!

এবার তারা মাংসের উপর তলোয়ার মুছে নিয়ে ঘোড়ার পিঠে লাফিয়ে উঠে অর্ধচক্রাকার পথে তাঁবুর দিকে ছুটিয়ে দেয় ঘোড়া। কিন্তু যাত্রা সুরু করতেই চারদিকের অন্ধকার আবারো দ্বিখণ্ডিত হয়ে গেল সেই ভীষণ চীৎকারে—'দস্যু, খুনী!'—অদৃশ্য বালকের নিদারুণ অভিশাপ!

ক্রোধে ও ভয়ে তারা ঘোড়ার মুখ ফিরিয়ে, খুঁজতে লাগল সেই মৃত শিশুকে; আবারো দেখতে পেল তাকে—তার সর্বাঙ্গ দিয়েই ঝরে পড়ছে রক্ত। আবারো তাকে খণ্ড-বিখণ্ড করে ফেলল, পদাঘাত করল তার দেহের উপর এবং দেহের এক এক অংশ এক এক দিকে ছুঁড়ে ফেলে, চলল ঘোড়া ছুটিয়ে।

তবু আবারো সেই ভয়ংকর শিশুর চীৎকার। ক্রোধে শঙ্কায় অন্ধ হয়ে সৈন্যদল হারিয়ে ফেলল তাঁবুর পথ, বার বার শুধু ঘুরতে থাকল সেই শিশুহত্যার ভয়ঙ্কর প্রান্তরে। প্রান্তরে পরিব্যাপ্ত রাত্রির গম্ভীর সৌন্দর্য, ঊর্ধ্বদেশে তারাদের নির্মল দৃষ্টি পৃথিবীর দিকে প্রসারিত।

সৈন্যদল চলেছে তাঁবুর উদ্দেশে; কিন্তু সেই শিশুর চীৎকার-ধ্বনি ভয়ঙ্কর বজ্রগর্জনের মতোই আচ্ছন্ন করে ফেলেছে তাদের সমস্ত সত্তা। বারবার ঘূর্ণাবর্তের মতো ঘুরে ঘুরে উন্মত্ত ক্রোধে তারা বার বার হত্যা করল সেই ভয়ঙ্কর শিশুকে,—তবু, তবুও হত্যা করতে পারল না!

সূর্যোদয়ের আগেই ক্রোধান্ধ সৈন্যদল অশ্ব ছুটিয়ে দিল ভয়ঙ্কর সমুদ্রের দিকে—অশ্বের উন্মত্ত লম্ফনে ঘূর্ণী-ফেনিল হয়ে উঠল সমুদ্রের তরঙ্গ-দল।

ধ্বংস হ'ল পথ-ভ্রান্ত রোমীয় সৈন্যদল, ধ্বংস হ'ল তাদের দলপতি দস্যুরাজ সেঞ্চুরিয়ণ মার্সেলাস!......'

## ❋ শ্রীমতী এস্তাফিয়েভা ❋

এই গল্প সংগ্রহ-গ্রন্থে একমাত্র লেখিকা হলেন শ্রীমতী এস্তাফিয়েভা ; এজন্যেও সমস্ত পুরুষ-লেখকদের মধ্যে গল্পের আসরে এঁকে সাদরে ডেকে আনা দরকার ছিল। আরো বিশেষত, এঁর 'সৎমায়ের সৎছেলে' এই সংগ্রহে একটি বিশেষ ভালো গল্পই নয়, একটু নতুন বিষয়ে এক আবেদন-মূলক রচনা। পারিবারিক জীবনে আদর্শ-ছেলের যে চরিত্র এখানে চিত্রিত হয়েছে তা বাস্তববোধে ও আদর্শচেতনার কল্যাণদীপ্তিতে বড়ই সহৃদয়-সুন্দর। কিশোর ভানিয়া পিতার মৃত্যুর পরে ভেঙ্গে-পড়া সংসারের বেদনাতুর ও বিরূপ সম্পর্কের মধ্যে আনন্দ ও বিশ্বাসকে প্রতিষ্ঠিত করেছে—সুনিশ্চিত ভবিষ্যৎ রচনার দিকে। আন্না-মায়ের অবহেলা ও রুক্ষ ব্যবহারে সে আহত হয়েছে ভিতরে ভিতরে, কিন্তু সব বিরূপতাকেই জয় করেছে নিজের স্থির বুদ্ধি, সজাগ কল্যাণচেতনা, অটল ভালোবাসা ও কঠিন শ্রমের গুণে। পারিবারিক জীবনে তিন বোন ও সৎমায়ের একান্ত প্রিয় হয়েছে সে আপন চরিত্র-বলেই।

দুঃখের বিষয়, এই সুন্দর গল্পটির লেখিকার জীবন ও সাহিত্য-পরিচিতি সম্পর্কে বহুমুখী সন্ধান সত্ত্বেও কিছুই জানা সম্ভব হয়নি —এমনকি জন্মকাল বা মৃত্যুকালও নয়। তবে, লেখিকা কুপ্রিনের সমকালীন মনে হয়। তাই সেভাবেই ধারাক্রম রক্ষার চেষ্টা করলাম। জে. হ্যামার্টন সম্পাদিত 'দি মাস্টারপিস লাইব্রেরী অব শর্ট স্টরিজ' গ্রন্থমালার ( বিশখণ্ডই দশটি গ্রন্থে বাঁধানো ; এককালীন প্রকাশক 'স্ট্যাণ্ডার্ড লিটেরেচার,' কলিকাতা ) বৃহদাকার রুশ গ্রন্থভাগ থেকে গল্পটি ( মূলনাম 'ভানিয়া' ) গৃহীত হয়েছে। সেখানে জানা যায় লেখিকার পদবীমাত্র, এমনকি মূলনামও নয় ( আশ্চর্য বটে ! ), এবং পদবীর আগে লেখা আছে 'মাদমায়েজাল' অর্থাৎ কুমারী বা শ্রীমতী ; গ্রন্থ-ভূমিকায়ও কুপ্রিন-এর পরিচিতির পর অন্যান্য লেখকদের মধ্যে নামটি অর্থাৎ পদবীটা মাত্রই বর্তমান। এই সংগ্রহ-গ্রন্থের গল্পটিতেই লেখিকা উপস্থিত—জীবন ও সাহিত্য-পরিচিতিতে, বা ছবিতেও নয়।

## ॥ সৎমায়ের সৎছেলে ॥

মিলচ্কা তার ফুটফুটে মুখখানি বালিশে লুকিয়ে অঝোরে কাঁদছে শুধু,—তার এই কুমারী-জীবনে সবচেয়ে মর্মান্তিক আঘাতই আজ পেয়েছে সে। কতদিন থেকে অধীরভাবে প্রতীক্ষা করেছে—কবে পূর্ণ হবে ষোলো বছর, কবে হয়ে উঠবে নিটোল তরুণী, কবে পরতে পারবে শাদা মসলিনের গাউন, যেতে পাবে বড়দিনের নাচের আসরে।

কতদিন থেকে সে এই দিনটিরই স্বপ্ন দেখেছে! কিন্তু সেই শুভ প্রভাতেই তার মা বলে দিল কিনা—বড়দিনের পোশাকও পাবে না সে, নাচের আসরের কথা তো ভাবাই বাহুল্য! অত খরচ কুলিয়ে ওঠা তাদের পক্ষে সম্ভব নয়।

বেচারী মিলচ্কার উপরে এ যেন নিদারুণ আঘাত। ছেলেবেলা থেকেই ঘরের আদুরে, কিছু চেয়ে না পাওয়ার দুঃখ যে কি জানেনি কোনোদিন। এই কিছুদিন আগেও তারা ছিল সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে। বাবার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই সুখের জীবন যে চিরদিনের মতোই শেষ হয়ে গেল—একথা কিছুতেই যেন তার মন মানছে না। বাবার হঠাৎ মৃত্যুর পরে, এই দেড় বছরের মধ্যে জমানো কয়েক হাজার টাকা খরচ হয়ে গেছে জলের মতো, এবার তাদের শুরু করতে হয়েছে নতুন রকমের জীবন—আলাদা ধরণের জীবনযাত্রা।

বড়দিনের ছুটিতে মিলচ্কা বাড়ী এসেছে স্কুল-বোর্ডিং থেকে। মনের মধ্যে সব সময়ই উঁকি মারছে প্রথম নাচের ছবি। আর আজ কিনা জন্মের মতোই ভেঙে গেল সেই স্বপ্ন। সত্যিই কী মর্মান্তিক!

বড়দিনের উৎসবের আয়োজন চলছে বাড়ীতে; কিন্তু আপন দুঃখে সে ভেঙে পড়েছে; কোনোদিকেই আর উৎসাহ নেই। মাঝে মাঝে সে তার অশ্রুভিজা মুখখানি তুলে দাদা ভানিয়ার কাছে ব্যথাভরে বলছিল বার বার,—'বুঝলে দাদা, এই দিনটাই ছিল আমার স্বপ্ন, আমার প্রাণের মধুর স্বপ্ন!' কয়েক পলক নিজের দুঃখ ভুলে বলে যায় সে—'শোনো, আমি আর ভানিয়া—ভানিয়াকে মনে আছে না? সোনালি চুলের সেই ছুঁড়ি মেয়েটা?'

ভানিয়া মাথা নেড়ে সায় দেয়।

'আমি আর ভানিয়া সব সময়েই আমাদের প্রথম নাচের আসরের কথা বলাবলি করতাম। আমরা ঠিক করেছিলাম সে পরবে গোলাপী রঙের গাউন, আমি পরব শাদা রঙের। কিন্তু মা আজ বলে দিল—আমার পোশাক থাকলেও নাচে যাওয়া হবে না। মায়ের নিজেরও কোনো ভালো পোশাক নেই, সব ক'টি সুন্দর গাউনই বিক্রী ক'রে ফেলা হয়েছে। আমি আমার জীবনের প্রথম নাচের আসরে যেতে পারব না, আমার সেই সাধের বলনাচে!' —অশ্রু-ভাঙা স্বরে বলতে বলতেই আবারো বালিশে মুখ গুঁজে নতুন করে কান্নায় ভেঙে পড়ে মিলচ্‌কা। ভানিয়া বোনের দিকে চেয়ে গম্ভীর ভাবে কী ভাবতে ভাবতে হঠাৎ চলে এল বারান্দার দিকে। আন্নার অর্থাৎ সৎমার ঘরটা আলগোছে পেরিয়ে তাড়াতাড়ি সে কেটে পড়ছিল বাইরে।

'আঃ, বিরক্ত করিস না আমাকে'!—আন্না-মার গলা শোনা যাচ্ছিল—'আমি তো হাজারবার ক'রে বলেছি, এবারে 'খ্রীষ্টমাস ট্রি' হবে না। এখনো যদি কান্না না থামাও তো ঘর থেকেই বার ক'রে দেব।'

কিন্তু এই ভয় দেখানোতে দৃশ্যতই কোনো কাজ হচ্ছিল না। কারণ, কিছু পরেই আন্না-মা আরো জোরে খেঁকিয়ে উঠল,—'তা, এমনি করেই বুঝি মায়ের কথা মানা হচ্ছে; যাও, উঠানে যাও।' আন্না একটি পাঁচ বছরের খুকীকে রাগে রাগে ঠেলে দেয় সামনে, আর সে চেঁচাতে থাকে গলা ফাটিয়ে।

'বলি, যাওয়া হচ্ছে কোথায়?'—আন্না-মা অপ্রীতির ভঙ্গীতে দিকে ঘুরে দাঁড়ায়। ভানিয়ার গায়ে বাইরে যাবার পোশাক, হাতে টুপি! নজর ক'রে দেখে সে।

'আমি—আমি ফিরছি এক্ষুনি।'—ভানিয়া অস্থির কণ্ঠে বলে, মায়ের দৃষ্টি এড়িয়ে অন্যদিকে তাকিয়ে বলে।

'সব সময়েই তোমার পাড়া-বেড়ানো পছন্দ করিনে আমি।'—আন্না তার সৎছেলের দিকে তাকিয়ে থাকে কঠিন দৃষ্টিতে,—অনেকটা শত্রুপক্ষীয় লোকের মতোই। বলতে থাকে—'সব সময়ে কোথায় থাকো তুমি? এই দু'মাস থেকে খাবার সময়েই শুধু বাড়ীতে উদয় হচ্ছ। কোথায় যাও আমাকে বলাটাও দরকার মনে করো না। অথচ তুমি জানো যে, তোমার সমস্ত দায়িত্বটা আমারি ঘাড়ের উপরে। লোকে শেষে বলবে, আসলে মা-ই ভালো নয়।'

'কিন্তু মা, সত্যি বলছি আমি—কোনো অন্যায় করছি না, আমি পড়তে যাচ্ছি।'

'আজ বাড়ী থাকলে পড়া ভেসে যেত না, এই পর্বের মুখে ঘরে কত কাজ! কিছুটা তো মাকে সাহায্যও করতে পারো। হ্যাঁ ভালো কথা, কিছুদিন থেকে তোমার ঘরটা তালাবন্ধ রাখছ কেন?'

ভানিয়া থতমত খেয়ে যায়, লাল হয়ে ওঠে, 'ওখানে আমার—মানে ভয় হয়—সোনিয়া বা মিতিয়া হয়তো আমার বইখাতা ছিঁড়ে ফেলবে—'

'আঃ, কি বিবেচক ছেলে আমার। কবে থেকে বইখাতার উপর এমন দরদ দেখা দিয়েছে?' মা বাঁকাভাবেই প্রশ্ন করে এবং হঠাৎ ঘ্যানঘ্যানে ছেলেটাকে কোলে তুলে চলে যায় রান্নাঘরের দিকে।

ভানিয়া মায়ের দিকে তাকিয়ে থাকে কয়েক পলক, তারপর টুপিটা ভুরু পর্যন্ত টেনে নামিয়ে বাড়ী থেকে বেরিয়ে পড়ে।

খাবার হলঘরে বসে মিলচ্‌কা কাঁদছে তখনো। ছোটোদের ঘরে রয়েছে মিতিয়া ও সোনিয়া। সেই কবে একবার তাদের মস্ত বড় একটা 'খ্রীষ্টমাস ট্রি' হয়েছিল—সেই কথাই তারা পাল্লা দিয়ে বর্ণনা করছিল তাদের ধাইমার কাছে। তারা দুঃখ করে বলছিল যে, ভগবান তাদের বাবাকে নিয়ে গেছেন,—তাই মা এখন বলছে, কোনোদিনই আর তাদের 'খ্রীষ্টমাস-ট্রি' হবে না।

বুড়ী ধাই-মা বাচ্চাদের সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করে, তাদের সোনালী চুলে হাত বুলোতে বুলোতে বলতে থাকে আশ্চর্য এক শিশুর কথা। কত শত বছর আগে সে জন্মেছিল আস্তাবলের একটা গামলার মধ্যে। সেদিন আকাশে দেখা দিয়েছিল মস্ত বড় এক উজ্জ্বল তারা—রাখালদের ও জ্ঞানী-জনদের পথ দেখিয়ে এনেছিল সেই শিশুদেবতার কাছে। ধাই-মা সেই আশ্চর্য শিশুর কথা দরদ ভরে বলে যায়, আর শিশুরা তাকে ঘিরে বসে কত ঔৎসুক্যে কত আনন্দে, শুনতে শুনতে ভুলে যায় তাদের নিজেদের দুঃখ!

আন্না এদিকে এলোমেলো বিছানার উপরেই বসে আছে মাথা গুঁজে। কতস্মৃতির জোয়ারে ডুবে গেছে তার মন। একে একে মনে পড়ছে তার সেই হাসিখুশি শিশুকাল, কিশোরী জীবন, বান্ধবীদের সাথে কলেজের সেই দিনগুলি! তারপর এল চিরবাঞ্ছিত সেই ষোল বছর। মধুর ভবিষ্যতের কথা ভাবতেই অধীর সুখে কাঁপত তার বুক। তারপর মাত্র সতের বছর বয়সেই বিয়ে হ'ল এক যুবকের সাথে। ভদ্রলোকের প্রথম-বৌ মরে গেছে এক বছরের

একটা বাচ্চা রেখে।

আন্না তার স্বামীকে বুক ভরে' ভালোবাসল—বিবাহিত জীবনে সুখীই হ'ল সে। মাঝে মাঝে একটুখানি যা ঝগড়াঝাটি হয়েছে—তা ঐ ভানিয়াকে নিয়েই। একটা কথা ভেবে আন্না কিছুতেই নিজের মনকে মানাতে পারছিল না, আর একটি নারীও তার স্বামীকে ভালোবেসেছিল এবং ভালোবাসা ফিরে পেয়েছিল কিছুদিন আগেই, এবং সেই নারীটিই তাদের মিলিত ভালোবাসার বাঁধন অটুট রেখে গেছে একটি শিশুর মধ্যে। সেই শিশুটিই ছিল তার বাবার আদরের দুলাল। ছেলেটা চঞ্চল, একরোখা। সব সময়েই আন্নাকে সে অবিশ্বাসের চোখে দেখে, বড় বড় কালো চোখ মেলে কেমনভাবে চেয়ে থাকে! ছেলেটা তার বাবাকে বুক ভ'রে ভালোবাসে, উৎফুল্ল হ'য়ে ওঠে তার কথায়। ছেলেটা তার স্বামীর প্রাণেরই একটা দিক কেড়ে নিয়েছে আন্নার অধিকার থেকে। আন্নার তো তাই মনে হয়। তাদের স্বামীস্ত্রীর সুখের জীবনে সেই তো মনোমালিন্যের সৃষ্টি করেছে। ছেলেটাকে পছন্দ করে না আন্না এবং এই কথাটা চেপে রাখতে তাকে বিশেষ বেগ পেতে হয়। আজ সে সৎ-ছেলের প্রতি তার কঠিন-রূঢ় ব্যবহারকে অন্যায়-কিছু বলে মনে করতে পারল না। সে শুধু তার নিজের সন্তানদের চিন্তা-ভাবনায় মগ্ন। ভয়ানক দৈন্য তাদের শাসিয়ে ফিরছে, সেই তার একমাত্র দুশ্চিন্তা। আর, নিজের কথাও সে ভাবছিল—তার নিজের দুর্ভাগ্যের কথা।

তার মনে পড়ছে, কতো বছর আগে সে ছিল ঐশ্বর্যের কোলে লালিতা সুন্দরী এক তরুণী, প্রণয়ী স্বামীর আদর ও ভালোবাসা চারদিক থেকেই ঘিরে রেখেছিল তাকে, কত ছিল তাদের প্রিয়জন। তারা দু'জনেই বিশ্বাস রাখত স্বামী-স্ত্রীর সমান সমান অধিকারে। আন্নার স্থির বিশ্বাস ছিল পারিবারিক অত্যাচারের বর্বর-যুগ চলে গেছে অনেকদিন আগেই,—যে যুগে স্ত্রী ছিল স্বামীর ঘাড়ে-বোঝা! এখন, পারিবারিক জীবনে স্ত্রীরও দায়িত্ব রয়েছে স্বামীর মতোই, বরং স্ত্রী বা মায়ের দায়িত্বটা স্বামীর দায়িত্বের চেয়েও বড়।

আন্না তিক্তভাবে হাসে একটু—'হ্যাঁ!'

সে আপন মনে ফিসফিস করে বলে—'আমি আমার স্বাধীনতা ও সমান-অধিকারটুকুই বজায় রেখেছি,—তা ছাড়া সবই শেষ হয়ে গেছে কবরের তলায়।'

বয়স তার পঁয়ত্রিশ,—এখনো দেখতে সে সুন্দরী তরুণীর মতোই; কিন্তু

স্বামীর মৃত্যুর সঙ্গেসঙ্গেই নিজেকে সে বুড়িয়ে গেছে মনে করে। এখন তার জীবনের একমাত্র কাজই হ'ল সন্তানদের মানুষ করা, অভাব অভিযোগের ঝড়ঝাপট থেকে তাদের বাঁচিয়ে রাখা। নিজেকে সে বিসর্জন দিয়েছে, নিজেকে সে ভুলে গেছে একেবারেই!

প্রিয় স্বামীর জন্যে বেদনা আর ছেলেদের ভবিষ্যতের ভাবনা তার সমস্ত সত্তাকে চিরতরেই আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। দিনে দিনেই তার বুকে জেগে উঠছে একটা নিঃসঙ্গতা, একটা আশঙ্কা। তার মনে পড়ছে: স্বামী জীবিত থাকতে তারা বড়দিনের উৎসব উদ্‌যাপন করত কত সমারোহে, কত সাজ-সজ্জায়, কত অতিথি-অভ্যাগতের আদর-আপ্যায়নে। বড় ব্যথায় তার বুক যেন আজ ভেঙে যাচ্ছে, গভীর একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে চোখের জল মুছে নিয়ে ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ায়।

টেবিলে এখন খাবার সাজিয়ে রাখার সময়। রাত হয়ে গেছে। অন্ধকার আকাশে দেখা দিয়েছে দু'একটি নিঃসঙ্গ তারা, ছড়িয়ে দিচ্ছে নরম রূপোলি আলো।

'ভানিয়া গেল কোথায়? আবারো বাইরে?'—আন্না টেবিলের পাশে বসে জিজ্ঞাসা করে। মিতিয়া ও সোনিয়া তাদের আগেকার সবচেয়ে ভালো পোশাকে সেজেগুজে বসে আছে আগেই। মিলচ্‌কাও আছে,—এখনো তার মুখখানি ভারী, কেঁদে কেঁদে চোখ দুটি লাল!

'সব সময়ই ওর বাইরে বাইরে?'—বাচ্চাদের খাবার দিতে দিতে মা বলে কঠিন স্বরেই।

মা চটে আছে দেখে ছোটরা খেয়ে যায় নিঃশব্দে। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ছোট্ট খাবার-ঘরটি একেবারেই নীরব, মাঝে মাঝে শুধু কাঁটা-চামচের আওয়াজ। এবার সেই শব্দও থেমে গেল। সবাই চুপ ক'রে ব'সে, আপন মনে ভাবছে। গোলাপের মতো লাল গাল নিয়ে মিতিয়ার মুখখানি ঘরের এদিক ওদিক ঘুরছে খালি—কিছু যেন খুঁজছে। শেষে সে একটা চেয়ারের পেছনে এসে ধাইমাকে জিজ্ঞেস করে ফিস্‌ফিস স্বরে—'ঠাকুমা, স্বর্গের পরীরা কি এখন ফিরে এসেছে?'

'হ্যাঁ, এসেছে, সবাই ফিরে এসেছে, খুকুমণি! তোমাদের যেমন বলেছি তেমনি ভালো হও; নইলে কিন্তু উড়ে যাবে তারা, তাদের সঙ্গে সঙ্গে উড়ে যাবে বড়দিনের গল্প।'

আন্না হঠাৎ তীক্ষ্ণ স্বরে বলে ওঠে—'দেখো, অন্য সময় তুমি ওসব রূপকথা

বলবে, খাবার সময় নয়।'

'কিন্তু রূপকথা বলছি না তো আমি, শুধু বলেছি ভালো না হ'লে ওরা খ্রীষ্টমাস-ট্রি পাবে না।'

'ওরা পাক বা না পাক, সে আমি দেখব। স্বর্গের পরীদের চোখে আর ঘুম নেই তো!'

'সে কি কথা!'—বুড়ী ধাইমা খুবই আহত হয়,—'নিশ্চয়ই, একশোবার দরকার আছে পরীদের। সবাই জানে, বড়দিনের সন্ধ্যায় স্বর্গের পরীরা ঘুরে ঘুরে পুরস্কার বিলিয়ে দিয়ে যায় সৎলোকদের কাছে!"

'মা, মা, দাদা এসেছে!'—সোনিয়ার গলা খুশিতে উছলে পড়ে, সেই তার দাদাকে বারান্দা দিয়ে কেটে পড়তে দেখেছিল।

'এসেছে তো এসেছে! তুমি চেঁচাচ্ছ কেন?'—আন্না খিট্‌খিটে হয়ে ওঠে। সৎছেলের দিকে ফিরে কঠিন স্বরে কৈফিয়ৎ চায়,—'বলি, কোথায় ছিলে?' এবং উত্তরের অপেক্ষা না করেই বলে যায়—'উৎসবের দিনটায় অন্তত একটু ভদ্র-ভাবে সেজে বেরুতে পারতে! কোনো অতিথি-অভ্যাগত নেই সত্যি, তবু একটু সাজসজ্জা করলে ক্ষতি হয় না বোধ হয়। কি রকম দেখাচ্ছে—একবার নিজের চেহারাখানাই দেখো না!' এবং সঙ্গেসঙ্গেই সে ভানিয়ার গায়ের কোটটার উপরকার অসংখ্য দাগ দেখিয়ে দেয়। ভানিয়া লাল হয়ে ওঠে।

'এর চেয়ে ভালো কোনো পোশাক নেই আমার—সব জামাই ছিঁড়ে গেছে।'—নিজের খাবার প্লেটটার দিকে তাকাতে তাকাতে বলে ভানিয়া।

'কেন, তোমার ছাত্র পড়ানো আছে; মাসে তুমি বিশ টাকার বেশী পাচ্ছ।'

'কিন্তু সবটাই তো তোমার হাতে তুলে দিই।'—ভানিয়া তার সৎমার দিকে তিরস্কারের দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে বলে ধীরে ধীরে।

আন্না ব্যথিত হয়। আর একটি কথাও না বলে সে বাচ্চাদের দিকে মনোযোগ দেয়।

ব্যথা-নম্র নীরবতার মাঝখানে হঠাৎ বেজে উঠে সোনিয়ার স্বর—'ভানিয়া দাদার ঘরে দেখেছি—মস্ত বড় একটা ছবি। মেজেতে রেখে দাদা রঙীন-পেন্সিল দিয়ে কী যেন আঁকছিল। এত্ত তো বড় ছবি!' তারপর লাল ওষ্ঠ ফুলিয়ে সে বলে—'দাদা আমাকে দেখলেই দরজা বন্ধ ক'রে দেয়। কিছুতেই ঘরে ঢুকতে দেবে না। তবে, আমিও দেখেছি সবি।'

'ভানিয়া, এসব কি শুনছি? ছবি নিয়ে বাঁদরামো হ'চ্ছে। বাঃ, চমৎকার

ছেলে! সামনেই পরীক্ষা,—স্কুলের শেষ পরীক্ষা। আর এদিকে চমৎকার খেলা হ'চ্ছে বসে!'—আন্না বিদ্রূপ করে।

ভানিয়া উত্তর দেয় না, খাবার থালাটার উপরে তার মাথাটা আরো ঝুঁকে পড়ে।

সৎমার রুক্ষ ব্যবহারে সে ইতিমধ্যেই অভ্যস্ত হ'য়ে গেছে,—কিন্তু তার বাক্যবাণ এখনো অসহ ঠেকে। যে খুশিমন নিয়ে সে বাড়ী ফিরেছিল এক নিমিষেই তা মিলিয়ে যায় কোথায়। তার চোখের সামনে একে একে ভেসে ওঠে শৈশব ও কৈশোরের অসহ দুঃখের ছবি, প্রাণটা কুঁকড়ে আসে ব্যাথার চাপে। ভানিয়া কখনো মায়ের আদর পায়নি,—নিজেদের বাড়ীতে থাকে সে বিদেশীর মতো! বাবা ভালোবাসতেন খুবই, কিন্তু তিনি ছিলেন এঞ্জিনীয়ার,—ঘরসংসারের দিকে মনোযোগ দেবার মতো যথেষ্ট সময় ছিল না তাঁর। কঠিন প্রকৃতির মানুষ, সব সময়েই কোনো না কোনো কাজে ব্যস্ত থাকতেন, ছেলে-মেয়েদের 'নাই' দিয়ে মাথায় তোলেননি,—না, কাউকেই নয়! ভানিয়ার সঙ্গেও অন্য সন্তানদের মতোই ব্যবহার করেছেন শান্ত-সংযতভাবে,—সৎমায়ের কোনো দুর্ব্যবহার দেখলে ভানিয়াকে আদর করেছেন, সান্ত্বনা দিয়েছেন। ভানিয়ার বুক তখন আহ্লাদে ভঁরে উঠেছে। কিন্তু এমনটি ঘটেছে খুব কমই। এবং এমনি করেই ধীরে ধীরে ভানিয়া শৈশবের দুঃখ স'য়ে স'য়ে আজ হয়ে উঠেছে তরুণ যুবক। আজ সে তার নিজের অবস্থাটা ভালোভাবেই বুঝতে পারে। সৎমার সঙ্গে তার সম্পর্কের দিকটার কিছুমাত্রও উন্নতি হয়নি; ভানিয়া অবশ্যি কোনোদিক থেকেই তার সৎমাকে অখুশি রাখতে চেষ্টা করেনি, ভদ্র ও শান্ত-ভাবেই তার সৎমার বদ-মেজাজ সহ্য করে গেছে—কিন্তু, তাতেই সে চটেছে আরো বেশী!

তারপর হঠাৎ বাবার মৃত্যু হ'লে ভানিয়ার জীবনধারায়—এবং সমস্ত পারি-বারিক জীবনের ভিত্তিমূলেই ভাঙন ধরল। চারদিকের ঐশ্বর্য-আসবাব, বন্ধু-বান্ধবের দল, খুশি-উচ্ছল স্বাধীন জীবনের সবকিছুই অন্তর্হিত হ'ল ইন্দ্রজালের মতো! বাবা প্রচুর আয় করলেও কিছুই জমিয়ে রেখে যেতে পারেননি; এখন সমস্ত পরিবারটি নির্দিষ্ট-সংখ্যক পেন্‌সনের টাকার উপর বাঁচতে গিয়ে বাঁচবার পথই খুঁজে পায় না—দুর্দিন শাসিয়ে ফেরে চারদিক থেকেই।

প্রাসাদোপম বড় বাড়ীটা থেকে সমস্ত পরিবারকেই সরে আসতে হ'ল দুটো কোঠার মধ্যে, এবং এখানেই শুরু হ'ল চুলচেরা হিসেব-নিকেশের দরিদ্র

জীবন। ভানিয়ার বয়স তখন পুরো আঠেরো।

ঘরের দুর্দশা দেখে নিজেই সে একটা কাজ জুটিয়ে নিল। স্কুলের মাইনে ও পড়ার ঘরটার ভাড়াটা তাতেই চলে যাবে।

প্রথমে তো আন্না তার দেওয়া টাকা নিতে একদম নারাজ, কিন্তু শেষে অনিচ্ছাভরেই অপ্রিয় সৎছেলের এই সাহায্যটুকু নিতে রাজি হ'ল।

ভানিয়া তার ছোট ভাইবোনদের প্রাণ দিয়ে ভালোবাসে; লেখাপড়ায় সে খুব উৎসাহী, খুব পরিশ্রমী,—কবে পাশ করে সে টেক্‌নিকাল-স্কুলে ঢুকবে তারই প্রতীক্ষা করছে প্রতিদিন। বাবার পদাঙ্ক অনুসরণ করার স্বপ্ন দেখে—বাবার মতোই এঞ্জিনীয়ার হবে। বাবার অকালমৃত্যুতে তাদের সংসারের সুখশান্তিতে যে ভাঙন ধরেছে তাই আবার সে ভ'রে তুলবে। সৎমা তাকে ঘৃণা করে, কিন্তু ভানিয়া তাকেই জয় করবে নিজের চরিত্রবলে, এতো বছর ধরে যে অত্যাচার সে সহ্য করে আসছে তার অবসান ঘটাবে।

আজ মার কাছ থেকে অযথা অন্যায় ভৎর্সনা শুনে ভারী দুঃখ লেগেছে; তবে এই আঘাত ও অপমানের কথা কিছুই সে প্রকাশ করল না; বরং প্রতিদিনকার মতোই খেয়ে উঠে মার আশীর্বাদ চেয়ে চলে এল নিজের ঘরে।

ভানিয়ার দিকে চেয়ে থেকে আন্না ঘাড় কোঁচকায়, উঠে দাঁড়ায় টেবিল থেকে। মিলি একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলে সোফায় এসে বসে; বৃদ্ধা ধাত্রী শিশুদের কাছে ফিসফিস করে কি বলতে বলতে তাদের নিয়ে আসে ছোটদের শোবার ঘরে।

অসহ্য দুঃখে ছেয়ে যায় আন্নার বুক। অনেকক্ষণ ধরে সে তার ঘরে পায়চারি করতে থাকে। চাকরটা টেবিল পরিষ্কার করে দিয়ে যায়, মিলি সোফায় বসে থাকে পাষাণ-মূর্তির মতো। কিন্তু কোনোদিকেই লক্ষ্য নেই আন্নার।

আবারো তার চিন্তাধারা বয়ে চলেছে সুদূর অতীতের মুখে—তার ইচ্ছের বিরুদ্ধেই। স্বামীর সঙ্গে সেই স্বাধীন সুখের জীবনের ছবি একে একে জেগে ওঠে তার সামনে।

কী ভয়ানক কর্মভারে ব্যস্ত থাকতেন তিনি, তবু ছিলেন কী হাসি-খুশি, কী ভালোমানুষ! তাঁর চারপাশের লোকজনের প্রাণেও তিনি ছড়িয়ে দিতেন আনন্দ।

'বাবা ও ছেলেতে কী আশ্চর্য অমিল!'—একরোখা অসামাজিক ছেলে

ভানিয়ার দিকে চেয়ে চেয়ে ভাবে আন্না। 'ছেলেটা নিশ্চয়ই তার মায়ের মতোই হয়ে থাকবে।'—বহুদিনের ঈর্ষার জ্বালা আবারো তার বুকের মধ্যটা পুড়িয়ে দিতে থাকে; নিজের ঘরে চলে আসার জন্যে পা বাড়ায় সে। হঠাৎ শোনা যায় ভানিয়ার তীক্ষ্ণ স্বর—

'মা, মিলি! আমার ঘরে এসো একবার। ছোটদের জন্যে একটা মজার জিনিস তৈরী করেছি। সোনাকে ও মিতুকে ডাকো আগে, ওদের ছুটে আসতে বলো!' এবং হঠাৎ সে লাল হয়ে ওঠে, বলে—'ওদের জন্যে ছোট্ট একটা খ্রীষ্টমাস-ট্রি বানিয়েছি, আলোগুলি জ্বালিয়ে রেখেছি অনেক আগেই!'

'তুমি? ছোটদের জন্যে খ্রীষ্টমাস-ট্রি?' আন্না বিস্ময়-ভরে ভানিয়ার দিকে তাকিয়ে থাকে, নিজের কানকেই তার বিশ্বাস হয় না।

ভানিয়া মায়ের মুখের দিকে চেয়ে অপরাধীর মতোই হাসে, আলগোছে বলে, —'হ্যাঁ, তোমার কাছ থেকে লুকিয়ে রেখেছি, ছোটদের হঠাৎ চমক লাগিয়ে দেব বলে।'

আন্না যেন কিছুতেই বিশ্বাস করে উঠতে পারছে না,—এই গম্ভীর বেপরোয়া যুবকটি, যাকে সে মনে করেছে সংসারের প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন—সেই তাদের সবাইকে আজ এমনভাবে অবাক ক'রে দিতে পারে!

ভানিয়া এদিকে ছোটদের ঘরে এসে চেঁচাতে থাকে—'সোনিয়া, মিতিয়া! শিগগির আমার ঘরে এসো—ভগবান তোমাদের জন্যে কেমন সুন্দর একটি খ্রীষ্টমাস-ট্রি পাঠিয়ে দিয়েছেন দেখো এসে!'—সেখান থেকে সে ছুটে আসে মা ও বোনের কাছে; তারাও ইতিমধ্যেই এসে হাজির হয়েছে ভানিয়ার ঘরের দোরে।

ভানিয়া এই ঘটনাটির জন্যেই তার ঘরটি আগে থেকেই সাফ-সাফাই করে রেখেছে। টেবিল ও চেয়ার ঠেলে রাখা হয়েছে দেয়ালের গায়ে। ঘরের ঠিক মধ্যখানে আলো-ঝলমল 'খ্রীষ্টমাস-ট্রি' কী সুন্দরই না দেখাচ্ছে! ছোটরা তো আহ্লাদে আটখানা, তারা দেখে আর হাততালি দেয়—'ভগবান পাঠিয়ে দিয়েছেন! ভগবান খুব ভালো!'

মিলচ্‌কা নিজের দুঃখ ভুলে গিয়ে খুশিভরে ভাইয়ের কাছে ছুটে আসে, অধীর-উৎসুক গলায় জিজ্ঞেস করে শুধু—'দাদা, দুষ্টু ছেলে! ঠিক সময়টি বুঝে কী করে জোগাড় করলে সব?'

'তোমার জন্যেও আছে, মা!'—ভানিয়া বিব্রতভাবেই বলে—'সোমালি,

খুকুমণি! এইটে তোমার!' খুকুর হাতে সে ঝলমলে পোশাক পরা সোনালি চুলওয়ালা চমৎকার একটি পুতুল এগিয়ে দেয়। সোনিয়া তো আহ্লাদে নাচতে থাকে। 'আর, এইটে তোমার!'—মিতিয়াকে দেয় সে চাকাওয়ালা মস্ত একটা ঘোড়া। খোকন তো লাফিয়ে গিয়ে তার পিঠে চেপে বসে, দিদির দিকে ঘাড় বাঁকিয়ে গর্বের ভঙ্গীতে তাকায়, আর চাবুক লাগায় ঘোড়াকে।

'সাবধান সোনালি, বেশী কাছে এসো না—ঘোড়া কিন্তু তোমার পিঠের উপর দিয়েই চলে যাবে!'—ভানিয়া সরে গিয়ে দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়ায়, সত্যিই যেন ভয় হচ্ছে তার!

আন্না সৎছেলের দিকে হাসিমুখে তাকায়, নিজের অজ্ঞাতেই কেমন দরদী দৃষ্টি ফুটে ওঠে তার চোখে-মুখে। সে চেয়ে চেয়ে দেখে ভানিয়ার আনন্দ-উজ্জ্বল মুখখানি, তার নিবিড় আঁখি-পালকের মধ্য দিয়ে বিচ্ছুরিত উজ্জ্বল দৃষ্টি! ছেলের মধ্যেই সে খুঁজে পায় তার মৃত স্বামীর সঙ্গে এক অপূর্ব সাদৃশ্য।

'আগে কোনোদিন লক্ষ্য করে দেখিনি তো!'—মনে মনে সে নিজেকেই ভৎর্সনা করে; এই পরিবর্তিত-রূপ যুবকটির দিকে তাকায় সে নিবিড় স্নেহে।

সাধারণত, ভানিয়ার মুখে সবাই একরোখা কেমন একটা বিষণ্ণ ভাব দেখতেই অভ্যস্ত হয়ে এসেছে, অথচ তার মুখের আজকার এই ভাবটি তা থেকে কত আলাদা!

আন্নার প্রাণে এত বছর ধরে চাপা ছিল এক পাষাণ-ভার, আজ বসন্ত-প্রভাতের এক ঝলক আলো এসে যেন খুলে দিয়ে গেল সেই স্নেহঝর্ণার রুদ্ধ দ্বার! অন্তরের নিভৃত অতল থেকে মাতৃস্নেহের মতো কেমন এক কোমল দরদ উৎসারিত হ'ল তার এতদিনকার অপ্রিয় ছেলের উদ্দেশে।

'মা, তোমার জন্যে এটা এনেছি, মা!'—ভীরু হাতেই মার কাছে এগিয়ে দেয় একটা মখমলের বাক্স।

অধীর আগ্রহে মা বাক্সটা খোলে, বুক কাঁপতে থাকে।

বাক্সটার মধ্যে লাল মখমলের গদি, তার উপরে বহু-বাঞ্ছিত সোনার একটি ব্রোচ। ব্রোচের উপরে খচিত তার মৃত স্বামীর একটি ক্ষুদ্রাকার মূর্তি!

আন্না তার ছেলের আনত মস্তকে এঁকে দেয় একটি আশিস-চুম্বন। আঠারো বছরের মধ্যে এই প্রথমবার! ভানিয়া তার মার আদরে সাড়া দেয়, মায়ের পায়ে প্রণাম করে সে; এবার টেবিলে এসে আর একটা প্যাকেট খোলে।

'আঃ!'—টেবিলের কাছে ছুটে আসে মিলচ্‌কা। ভানিয়া তার সামনে

তুলে ধরে চমৎকার শাদা মসলিনের গাউন।

মিলচ্‌কা যে নিজের চোখকেই বিশ্বাস করতে পারছে না! এ যে একেবারেই অভাবিত উপহার!

'আর, এই যে মার গাউনের কাপড়!'—আর একটা প্যাকেট খুলে বার করে ধূসর রঙের ঝলমলে রেশমী কাপড়।

'এবারে মাকে নিয়ে নাচের আসরে যেতে পারবে—নতুন বছরের প্রথম দিনে।'—মিলিকে ব'লে হাসে সে মিষ্টি হাসি। বোনের মুখেও হাসি ফুটে উঠতে দেখে সে বলে, 'এখন আর নিশ্চয়ই কাঁদবে না। কেমন, ঠিক তো মিলি?'

'দাদা, দাদা আমাদের সোনার ছেলে!' মিলি দুই বাহু দিয়ে ভাইয়ের গলা জড়িয়ে ধরে আবেগ ভরে বলতে থাকে—'এত ভালো ছেলে তুমি, তোমাকে আমি ভালোবাসি, খুব ভালোবাসি।'

হাত থেকে প্যাকেটটা প'ড়ে যায় নিচে, কিন্তু সেদিকে খেয়াল নেই। সে তার ভাইকে দুই বাহু দিয়ে আরো নিবিড় করে জড়িয়ে ধরে বারবার বলতে থাকে,—'দাদা—আমি ভালোবাসি তোমাকে, তোমাকে ভালোবাসি—'

আম্মা মা-ও এগিয়ে আসে কাছে—

'একাই ভানিয়াকে আগলে রেখো না। আমাকেও ভাগ দাও কিছুটা!' মিলিকে ঠাট্টা করে বলে সে—'আমাকেও আদর করতে দাও, আজকের দিনে খ্রীষ্টমাস ট্রি-র জন্যে আনন্দ জানাতে দাও।' মেয়েকে হাত দিয়ে একপাশে সরিয়ে দিয়ে ভানিয়াকে কাছে টেনে আনে নিবিড় স্নেহে, তাকিয়ে থাকে তার চোখ দুটির দিকে, আর আস্তে আস্তে বলে—'ভানিয়া, আজকের দিনে তুমি আমাদের বুকভরা আনন্দ দিয়েছ। আমিও আমার প্রাণের আশীর্বাদ জানাচ্ছি তোমাকে—সোনার ছেলে আমার!'

জীবনে এই প্রথমবারই সে তাকে 'সোনার ছেলে' বলে সম্বোধন করল। আজকের মতো এমন নির্মল দরদ আর কোনোদিনই ফুটে ওঠেনি তার কণ্ঠে। আম্মা-মায়ের বড়-বড় কালো চোখের মায়াময় ছায়ায় ভানিয়া ভুলে যায় তার আশৈশব নিঃসঙ্গতা ও বেদনা, ভুলে যায় এত বছরের দুর্ব্যবহার ও পুঞ্জীভূত তিক্ততার ইতিহাস! তার স্নেহ-তৃষিত প্রাণ মায়ের আদরে সাড়া দেয়, অতীতের সব গ্লানি মার্জনা ক'রে সে মায়ের মুখে তাকিয়ে থাকে পরম বিশ্বাসে। মায়ের চোখেও ফুটে ওঠে সত্যিকার ভালোবাসা, সত্যিকার দরদ!

তারা দু'জনে এ-ওর গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে থাকে। প্রিয়তম স্বামীর অকাল-

মৃত্যুতে এই নারীটির সারা জীবনই ব্যর্থ হয়েছিল নির্মমভাবে। কিন্তু আজ আবার সে এই তরুণ কর্মঠ যুবকটির দিকে আশা ভরে ফিরে তাকায়,—সে এসে দাঁড়াবে আম্মারই পাশে।

মিতু ও সোনা আহ্লাদে নাচতে থাকে 'খ্রীষ্ট-মাস ট্রি'-র চারপাশে, লুব্ধচোখে দেখে সেই গাছে ঝুলানো নানা খাবার! মিলি তার উপহারটির দিকে হাসিমুখে তাকিয়ে থেকে গুনগুন্ সুর ভাঁজে আপন মনে। বুড়ী ধাইমা বারান্দায় দাঁড়িয়ে হাসিমুখে শিশুদের আমোদ-আহ্লাদ দেখে, আর বলে—'ভগবান সবার মঙ্গল করুন। এবারে আমাদের 'খ্রীষ্টমাস-ট্রি' হয়েছে দেখবার মতোই।'

কিছু পরেই ভানিয়াকে টেনে এনে নিজের পাশে বসিয়ে মা বলে—'কিন্তু সব খুলে বলো দেখি, ছোটদের জন্যে এসব করবার ইচ্ছে কী করে তোমার মনে জাগল? টাকাই বা পেলে কোথায়?'

'অনেক আগে থেকেই ভেবে রেখেছিলাম আমি—'সারা বছরটাই একথা ভেবেছি আমি। সংসার চালানো এমনিতেই তোমার পক্ষে শক্ত, দিনে দিনেই হয়ে উঠছে আরো শক্ত। তাই দেখে আমি ছাত্র পড়ানো ছাড়া আরো কিছু করবার চেষ্টা করছিলাম। আমার বাবার এক বন্ধু হলেন সরকারী ঠিকাদার, তিনি আমাকে কয়েকটা প্ল্যান আঁকতে দিয়েছিলেন—'

'ও, সোনিয়া যাকে ছবি বলছিল?' —আম্মা আবেগভরে জিজ্ঞেস করে।

'হ্যাঁ সেটাই!'—ভানিয়া বলতে থাকে,—'এই তিন মাস ধরে প্রায় সারা রাত জেগে জেগে আমি ঐ কাজ করেছি। একটা খ্রীষ্টমাস ট্রি কিনতে পারি এমন টাকা আয় করতে চেয়েছি, ছোটরা উৎসবের দিনটায় মুখ কালো না করে থাকে তাই। ওদের খুশিতে তুমিও খুশি হবে ভেবেছি আমি। এরপর থেকে আমার বাড়তি আয় সবটাই তোমার হাতে তুলে দিতে পারব, তোমারও কষ্ট কমবে। আজ—' ছেলেটি এক নিশ্বাসে এমনভাবে বলে যায় যেন বলার সময় ফুরিয়ে যাবে এক্ষুনি—'আজ মিলির চোখে জল দেখে আমি আর সামলাতে পারলাম না, তক্ষুনি গিয়ে সেই ঠিকাদারের কাছ থেকে টাকাটা ধার চেয়ে আনলাম। এর পরে কাজ করে ক্রমে শোধ করে দেব।' আনন্দে ও উত্তেজনায় ছেলেটির মুখখানা রাঙা হয়ে ওঠে।

'কিন্তু ভানিয়া, এত ভয়ানক পরিশ্রম করলে তোমার শরীর ভেঙে পড়বে যে!'—আম্মা যেন ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে—'এ যে ভয়ানক খাটুনি! তোমাকে আমি কিছুতেই তা করতে দেব না। আমি কিছুতেই—'

'না মা, এ বিশেষ কিছু নয়।'—তাড়াতাড়ি বাধা দেয় ভানিয়া—'আমার জন্যে ভেবো না তুমি। আমার গায়ে যথেষ্ট শক্তি আছে, বহু কাজ করতে পারি আমি। আমি বাবার মতো। আমার একমাত্র আশা, আমি পাশ করা পর্যন্ত তুমি ভাইবোনদের নিয়ে একরকম করে চালিয়ে নেবে। তারপর বাবার সময়কার মতোই আবার সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে থাকব আমরা।' খুশিভরে বলতে বলতে সে মাথার চুল হাত দিয়ে পিছনে সরিয়ে দেয়—'তাই না, মিলচ্‌কা?'—এবং উত্তরের অপেক্ষা না করেই চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠে সে ছোট্ট বোনটির কাছে ছুটে আসে। সোনিয়া খিলখিল হাসিতে ফেটে পড়ে, চেপে বসে ভানিয়া-দাদার কাঁধে। ভানিয়া ঘোড়ার মতো শব্দ ক'রে ছুটে চলে আগে আগে—সোনিয়াকে ঘাড়ে করে খ্রীষ্টমাস ট্রির পাশে ঘুরে ঘুরে মিতিয়াকে ধরতে যায়।

'ঠিক ওর বাবার মতো!'—আন্না তার সৎছেলের খুশিভরা উজ্জ্বল মুখখানির দিকে চেয়ে চেয়ে ভাবে। সেই খুশির কলকোলাহল ছাপিয়ে আন্না শুনতে পায় ভানিয়ার দৃঢ় কণ্ঠ—'বহু কাজ করিতে পারি, আমি ঠিক বাবার মতো!'

আনন্দের মধুর অনুভূতিতে ভরে ওঠে আন্নার বুক, জীবনের উপর তার আগের সেই বিরক্তি ও বিদ্বেষ একেবারেই মুছে যায় আজ। নিজের প্রাণের অসহ্য দুঃখের কথা, ছেলেমেয়েদের ভবিষ্যতের কথা ভেবে ভেবে নিরন্তর যে আশঙ্কা হ'ত, আজ তা মিলিয়ে যায় কোথায়,—সূর্যোদয়ের মুখে পলাতক কুয়াশার মতো।

আন্না সামনেই দেখতে পায় ভানিয়ার বলিষ্ঠ চেহারা, তার বাবার পদাঙ্কই অনুসরণ করছে যেন সে দৃঢ় পদক্ষেপে। আন্না দেখতে পায় তার দিকেই বাড়ানো রয়েছে শক্তিশালী একটি বাহু, এবং আবারো শুনতে পায় সে—'বলিষ্ঠ আমি, আমি ঠিক বাবার মতো!'

# আলেকজান্দ্‌র কুপ্রিন

১৮৭০—১৯৩৮ খ্রী.

১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে রুশদেশে সুরু হয় নবজীবন-চেতনা ও নবজাগরণ—মার্কসবাদ নিয়ে আসে বিপ্লবের বাণী—সমাজ-বিবর্তনের মূলমন্ত্র। আর, বলশেভিক নামে রাজনৈতিক দল মহানায়ক লেনিনের নেতৃত্বে শুরু করে বিপ্লবমুখী আন্দোলন। জার-শাসনের অবসান ঘটে ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দের মহাবিপ্লবে। কুপ্রিন এই সময়কার মানুষ —কিন্তু কুপ্রিন বিপ্লবের পক্ষে দাঁড়াননি বা তাঁব লেখনীও চালনা করেননি সেইদিকে। কুপ্রিন অনেকটাই ছিলেন পুরানোপন্থী,—

মাক্সিম গোর্কীর মতো তিনি সাহিত্য ও সমাজের নবজাগৃতির আদর্শকে বরণ করেননি, বরং বিরোধিতাই করেছেন। শ্বেতফৌজদলের পরাজয়ে এবং লালফৌজের মহাবিজয়ে কুপ্রিন স্বদেশ ত্যাগ করে চলে যান সুদূর ফ্রান্সে—স্পষ্টতই বলশেভিক-বিরোধী ভূমিকায়। সোভিয়েত আমলে কিছু পরে আবার ফিরে আসেন স্বদেশে এবং সাহিত্যিকরূপে ফিরে পান সম্মান ও জনপ্রিয়তা।

আলেকজান্দর কুপ্রিনের জন্ম হয়েছে ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে—গোর্কীর



১৫

ছ'বছর পরে। শিক্ষা পেয়েছেন মস্কৌ শহরে গির্জা-বিদ্যালয়ে, তারপর ১৮৯০-১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত সাত বৎসর সরকারী সৈন্যবিভাগে কাজ করেন, এবং এই সময়কার সৈন্যজীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই রচনা করেন তাঁর প্রথম গল্প-সংগ্রহ, প্রকাশ-কাল ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দ। সৈনিক-জীবনে তুষ্ট থাকেননি কুপ্রিন। সেই জীবন ত্যাগ করে সাহিত্য-সাধনায় মন দেন—একে একে রচনা করেন অসংখ্য ছোটগল্প, ( এবং তার অনেক গল্পই ভালো )—প্রকাশিত হয় চৌদ্দ খণ্ডে; রচনা করেন কয়েকখানি উপন্যাস। 'দ্বন্দ্বযুদ্ধ' ( ডুয়েল ) তাঁর প্রথম উপন্যাস এবং এই বই থেকেই কুপ্রিন সাহিত্য-মহলে উচ্চ আসন লাভ করেন; অন্যান্য কয়েকটি উপন্যাস 'শাশা'; 'জীবন-নদী'; 'এক স্লাভ আত্মা' এবং 'ইয়ামা'—এসবের মধ্যে একমাত্র 'ইয়ামা' হ'ল লেখকের বিশ্বখ্যাত উপন্যাস। কুপ্রিনের মৃত্যু হয় ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে—গোর্কির দুবছর পরে।

কুপ্রিন তাঁর গল্পরাজির জন্যে বিশ্বখ্যাত হয়ে আছেন এবং থাকবেনও। অন্যায়ের ও মিথ্যা শিক্ষাসংস্কৃতির উপরে তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ-সমালোচনা দেখা যায় তাঁর শ্রেষ্ঠগল্পে: যেমন—'স্বতঃবৃত্ত ন্যায়বিধান যন্ত্র'; 'শেষকথা'; 'এবার তা হলে নাচো'। [ এই গল্পগুলি বহুপূর্বেই প্রকাশিত হয়েছিল আমার 'পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ গল্প, ১ম-২য় খণ্ডে'; কিন্তু এদের মধ্যে অগ্রসর কিশোর-কিশোরীদের জন্যে যোগ্য মনে করেছি একমাত্র শেষোক্তটি ]। আর এই গল্পের সঙ্গেই আর একটি গল্প নিয়েছি একেবারেই নতুন জাতের, অতুলনীয় দরদী গল্প: খুকীর অসুখ (মূলনাম 'হাতী') [ সম্প্রতি 'মস্কো প্রগতি প্রকাশনী' প্রকাশ করেছে তার বাংলা অনুবাদ-বই ]। আমি ঐ গল্পটি কুপ্রিনের গল্প-সংগ্রহ থেকে পড়ে মুগ্ধ হয়েছিলাম—এবং বাংলায় সর্বপ্রথম প্রকাশ করার সৌভাগ্য হয়েছিল বহুকাল পূর্বে ( দ্র. হাতী, শিশুসাথী, মাঘ, ১২৬০; ইং ১৯৫৪ )।

## ॥ খুকীর অসুখ ॥

খুকীর অসুখ করেছে। রোজই ডাক্তারবাবু তাকে দেখতে আসেন। কতো দিন থেকে এই ডাক্তাবাবুকে ও দেখে আসছে। কখনো বা এই ডাক্তারবাবুর সঙ্গে আসেন আরো দুজন ডাক্তার,—তাঁদের চেনে না খুকী। খুকীকে তাঁরা উল্‌টে পাল্‌টে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখেন, পেটের উপরে কান চেপে কি যেন শোনেন, চোখের নিচু দিককার পাতা টেনে ধরে চেয়ে থাকেন। কেমন ভারিক্কী লোক তাঁরা, কেমন গম্ভীর! তাঁরা যে ভাষায় পরস্পর কথা বলেন, খুকী তা বুঝে উঠতে পারে না।

ডাক্তারবাবুরা রোগীর ঘর থেকে চলে আসেন বৈঠকখানায়,—মা সেখানে তাঁদের জন্যে বসে থাকেন। বড় ডাক্তারবাবুর চেহারাটা ঠিক দৈত্যের মতো বড়ো। বাদামী তাঁর চুলের রঙ, চোখে সোনার চশমা। তিনি মার সঙ্গে অনেকক্ষণ ধরে কথা বলেন। বৈঠকখানার খোলা দোর দিয়ে খুকী শুয়ে শুয়েই দেখতে পায়, শুনতে পায় সব। অনেক কথাই বোঝে না সে, তবে জানে তার কথাই হচ্ছে। মা তাঁর অশ্রু-ভিজা ক্লান্ত চোখ দুটি তুলে ডাক্তারের দিকে চেয়ে থাকেন। সঙ্গী ডাক্তার দুজন চলে গেলে বড় ডাক্তারবাবু তখন প্রকাশ্যেই বলেন—'একটা বিষয়ে সবচেয়ে বেশী নজর রাখবেন,—কখনো যেন ও মনমরা হয়ে না থাকে; যা যখন চায় এনে দেবেন।'

'কিন্তু ডাক্তারবাবু, ও যে কিছুই চায় না।'

'তা, আমি কি করে বলে দেই বলুন···ভেবে দেখুন, অসুখ হবার আগে কি-কি ভালোবাসত···পুতুল চকোলেট মিষ্টি খাবার···'

'না ডাক্তারবাবু, একদম কিছুই চায় না ও।'

'তা, চেষ্টা করে দেখুন, কিছু-একটা এনে লোভ দেখান···যে জিনিসই হ'ক না······আপনাকে আমি কথা দিচ্ছি—ওকে যদি হাসিখুশি রাখতে পারেন, আমোদ-আহ্লাদে ভুলিয়ে রাখতে পারেন তো যে-কোনো ওষুধের চেয়েই ভালো ফল হবে। বুঝছেন না, আপনার মেয়ের অসুখটা হ'ল জীবনের উপর বিতৃষ্ণা—জীবনের উপর ঔদাসীন্য—আর কিছু নয়···আচ্ছা, আসি তা হ'লে।'

॥ ২ ॥

'খুকু খুকুমণি!'—মা ডাকেন, 'কিছুই কি খেতে ইচ্ছে করে না, বলো খুকু!' 'তোমার পুতুলগুলি বিছানার উপরে এনে সাজিয়ে রাখি, কেমন? পুতুলের আরাম-কেদারা, সোফা, ছোট্ট-বিছানা, চায়ের সরঞ্জাম—সব এনে সাজিয়ে রাখি? পুতুলেরা চা খাবে ব'সে, জানতে চাইবে তোমার ঘরকন্নার কথা, ছেলেপুলেদের শরীরের কথা!'

'না মা-মণি ও চাইনে আমি, ও আমার ভালো লাগে না……'

'আচ্ছা বেশ খুকু, পুতুল চাইনে আমরা। তবে, তোমার বন্ধু কাতিয়া বা ঝিনোকা-কে যদি এসে দেখা করে যেতে বলি? তুমি তো তাদের খুবি ভালোবাসো!'

'না মা, ওদের চাইনে আমি, কিছুই চাই নে মা, কিছু না। এত খারাপ লাগে আমার!'

'কয়েকটা চকোলেট এনে দেব?'

খুকী জবাব দেয় না, করুণ চোখে তাকিয়ে থাকে ছাতের দিকে।

খুকীর দেহে কোনো জ্বালা-যন্ত্রণা নেই, জ্বরও নেই। তবুও সে দিনে দিনে শুকিয়ে শুকিয়ে কাহিল হয়ে পড়েছে। তাকে নিয়ে তুমি যাই-খুশি করো না কেন, কোনোই আপত্তি জানায় না। সবই সমান তার কাছে। কোনো কিছুর জন্যেই তার আগ্রহ নেই। দিনরাত সে পড়ে থাকে একেবারে একলাটি —একটি ব্যাথার ছবির যেন! কখনো বা আধঘণ্টাখানেক ঝিমুতে থাকে, স্বপ্নে দেখতে থাকে কি যেন একটা—বেশ বড়, ধূসর রঙের, ঝাপসা বর্ষার মতো!

রোগীর ঘর ও বৈঠকখানার মাঝের দোর বা বাবার ঘরের দোরটা খোলা থাকলে খুকী তার বাবাকে দেখতে পায়। বাবা নিঃশব্দে ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে করতে ধূমপান করেন। কখনো বা খুকীর বিছানার পাশে এসে বসেন, ধীরে ধীরে তার গায়ে হাত বুলোতে থাকেন, তারপর হঠাৎ চলে আসেন জানালায়, শিস দিতে দিতে তাকিয়ে থাকেন রাস্তার দিকে। আর, গা তাঁর কাঁপতে থাকে, চোখে জল আসে কেমন আশঙ্কায়। রুমালে চোখ মুছে ফেলেন তাড়াতাড়ি, দ্রুত পায়ে চলে আসেন পড়ার ঘরে। আবারো শুরু হয় পায়চারি আর ধূমপান। চুরুটের ধুঁয়োয় পড়ার ঘরটা দেখায় কেমন নীলাভ।

## ॥ ৩ ॥

সেদিন ভোরবেলা খুকী জেগে উঠল। তাকে অন্যদিনের চেয়ে কিছুটা যেন তাজাই দেখাচ্ছিল। একটা স্বপ্ন দেখেছে সে, কিন্তু সঠিক মনে করে আনতে পারছে না। অনেকক্ষণ ধরে সে মার মুখের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল।

'কি আনব খুকী, কি?'—মা জিজ্ঞেস করেন। খুকীর হঠাৎ মনে হয় তার স্বপ্নের কথা, গোপন কথার মতোই ফিস্‌ফিস করে বলে,—'মা…পেতাম যদি… একটা হাতী! ছবিতে আঁকা হাতী নয়…না, না, তা নয়।'

'খুকুমণি, মা আমার! এক্ষুণি এনে দিচ্ছি।'

মা পড়ার ঘরে গিয়ে খুকীর বাবাকে বলেন, মেয়ে হাতী চায় একটা।

বাবা সঙ্গে সঙ্গেই হ্যাট্‌কোট পরে বেরিয়ে যান। আধঘণ্টার মধ্যেই তিনি সুন্দর একটা দামী পুতুল কিনে নিয়ে আসেন। মস্ত বড় একটা ধূসর রঙের হাতী, মাথা নাড়তে পারে কেমন সুন্দর। পিঠের উপরে রাঙা জিন, তার উপরে তাঁবু, তার ভেতরে বসে আছে তিনটি লোক। খুকী কিন্তু এই পুতুলের দিকে ফিরেও তাকায় না একটিবার, দেয়ালের দিকেই শূন্যদৃষ্টিতে চেয়ে থাকে, ব্যথাতুর ক্ষীণ স্বরে বলে—'না, না, ও চাইনে আমি। একটা সত্যি সত্যি হাতী চাই। ওটা তো মরা!'

'কিন্তু, আগে তুমি দেখোই না একবার, খুকুমণি লক্ষী মা আমার!'—মা মিনতি করে—'চাবি দিয়ে দেখো, এটাই হবে ঠিক যেমনটি চাও তুমি,—একেবারে সত্যিসত্যি হাতীর মতো।'

হাতীটাকে চাবি দেওয়া হ'ল, হাতীটা মাথা ও লেজ নাড়তে নাড়তে টেবিলের উপর দিয়ে হেঁটে চলল ধীরে ধীরে; কিন্তু খুকীর এসব মোটেই মনে ধরে না, বরং বিরক্তিই লাগে। তবে বাবার মনে আঘাত না লাগে, তাই সে নম্রস্বরে ধীরে ধীরে বলতে থাকে—'বাবা, সত্যি তুমি খুব ভালো…এমন সুন্দর পুতুল আর কেউ পায়নি।…কিন্তু……বাবা……তুমি মনে করে দেখো… অনেকদিন আগে তুমি একবার আমাকে চিড়িয়াখানায় নিয়ে গিয়ে বলেছিলে—সত্যিকার একটা হাতী দেবে…তুমি এখনো দাওনি তো……'

'খুকী, কথা শোনো লক্ষী খুকুমণি, সে কি সম্ভব? তুমি বুঝতে পারছ না —হাতী হ'ল মস্ত বড়, ছাত অবধি উঁচু! কি করে তাকে ঘরের মধ্যে ঢোকাব?

আর তা ছাড়া,—তা ছাড়া পাবই বা কোথায়?'

'বাবা, অত বড় চাইনে আমি···আমার জন্যে তুমি খুব ছোট্ট দেখেই এনো, হাতী হলেই হবে। এই, এতোটা বড়,—বাচ্চা হাতী একটা!'

'খুকু, তোমাকে কিছু দিতে পারলে আমাদেরো কত আনন্দ হয়, কিন্তু এ যে একেবারেই অসম্ভব। এ যেন হঠাৎ আমাকে বলে বসলে—'বাবা, ঐ আকাশ থেকে চাঁদটা পেড়ে দাও না!'

খুকী করুণ ভাবে হাসে একটু—'কী যে বলছ তুমি, বাবা! আমি যেন কিছু বুঝিই না! চাঁদকে পেড়ে আনা যায় না, চাঁদ তো কতো দূরে থাকে, সূর্যকেও আনা যায় না! তা নয়। শুধু একটা ছোট্ট হাতী পেতাম যদি, সত্যি সত্যি একটা।'

আর, ধীরে ধীরে চোখ বোঁজে সে, ফিস্‌ফিস্ করে বলে—'বড্ড ক্লান্ত লাগছে; বাবা, রাগ করো না তুমি।'

বাবা দু'হাতে মাথা আঁকড়ে ধরে ছুটে আসেন পড়ার ঘরে, কিছুক্ষণ ধরে শুধু পায়চারী করতে থাকেন। তারপর অসমাপ্ত চুরুটটা হঠাৎ ছুঁড়ে ফেলে দেন মেজের উপর। এই হাতীর কথা নিয়ে খুকীর মাও দিনরাত খুঁতখুঁত করছে খালি! ঝিকে ডাকলেন তিনি,—'ওল্‌গা, আমার হ্যাট্‌কোট নিয়ে এসো তো!' খুকীর মা সেই হলঘরে এসে জিজ্ঞেস করেন—'কোথায় বেরুচ্ছো তুমি।'

কোটে বোতাম পরাতে পরাতে গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলেন খুকীর বাবা বলেন, —'আমি নিজেই জানি না কোথায় যে যাচ্ছি। একবার শুধু ভেবে দেখো, আজ সন্ধ্যায়ই সত্যিকারের একটা হাতী এনে তুলতে হবে এখানে—এই ঘরের মধ্যে!'

খুকীর মা উদ্বিগ্নভাবে তাকিয়ে থাকেন স্বামীর মুখের দিকে—'এ কি বলছো তুমি! তোমার শরীর ভালো আছে তো? মাথা ধরছে? কালরাতে ভালো ঘুম হয়নি?'

'আবার ঘুমও!'—ক্রুদ্ধভাবেই জবাব দেন খুকীর বাবা,—'ও, তুমি বুঝি জানতে চাইছ আমার মাথা ঠিক আছে কিনা? এখনো খারাপ হয়নি বটে! তবে, আজ সন্ধ্যে পর্যন্ত অপেক্ষা করলেই টের পাবে।'

দড়াম্ করে দরজাটা বন্ধ করে তিনি বেরিয়ে পড়েন সোজা।

॥ ৪ ॥

ঘণ্টা দুইয়ের মধ্যেই খুকীর বাবা এসে বসলেন সার্কাসে সামনের আসনে। পরিচালকের নির্দেশমতো শিক্ষিত জানোয়ারগুলি কত রকম খেলাই না দেখাতে লাগল। ডানপিটে কুকুরেরা লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে উলটিপালটি খেয়ে খেয়ে নাচ দেখাল, বাজনার সঙ্গে সঙ্গে গান গাইল, কার্ড-বোর্ডের অক্ষর দিয়ে শব্দ তৈরী করে করে কত লিখল। লাল গাউন-পরা এক বানরী আর তার সঙ্গী নীল-রঙের নিকারবোকার-পরা এক বানর সরু দড়ির উপর দিয়ে হেঁটে হেঁটে বসল গিয়ে একটা কুকুরের পিঠে! মস্ত বড় একটা সিংহ এক লাফে ছুটে গেল জলন্ত আগুনের মধ্যে দিয়ে। কদাকার একটা শীল-মাছ এগিয়ে এসে ছুঁড়ে মারল পিস্তল! এবার, হাতী! তিনটে হাতী—একটা বড়, দুটো ছোট ও বেঁটে, তা হ'লেও ঘোড়ার চেয়ে বড়। কী প্রকাণ্ড দেহ তার, কী কদাকার! তবু সেই জীবগুলি যে কী ক'রে অমন অপূর্ব কৌশলে নানা চাতুরী দেখাতে লাগল, সত্যি সে এক অভাবনীয় ব্যাপার। সুচতুর মানুষের পক্ষেও তো তেমনটা করা শক্ত! বিশেষ বাহাদুরী দেখিয়েছে অবশ্যি বড় হাতীটাই। প্রথমে পেছন-পায়ে ভর করে দাঁড়িয়ে থেকে বসে পড়ল,—তারপর মাথার উপর দাঁড়িয়ে পা তুলে দিল শূন্যে; হাঁটল সরু-একটা গাছের গুড়ির উপর দিয়ে, হাঁটল গড়িয়ে-চলা পিপের উপরে! মস্ত বড় একটা বইয়ের পৃষ্ঠা উলটাল লেজ দিয়ে, এবং সবশেষে একটা টেবিলে বসে গলায় তোয়ালে জড়িয়ে নিয়ে—খেতে শুরু করল, ঠিক ভদ্দর লোকটির মতোই!

খেলা দেখানো শেষ হয়েছে। দর্শকেরা চলে গেছে সবাই। বাবা এবার এগিয়ে এলেন কুস্তিবীর জার্মানটির কাছে। এই লোকটিই হ'ল সার্কাসের পরিচালক। সে তখন বসে বসে একটা লম্বা পাইপ টানছিল।

'দেখুন, যদি কিছু মনে না করেন তো'—খুকুর বাবা বলতে থাকেন—'আপনার একটা হাতীকে কিছুক্ষণের জন্যে আমার বাড়ীতে পাঠানো কি সম্ভব হবে?'

জার্মানটির চোখ তো বিস্ময়ে বিসর্গ, মুখখানাও হাঁ! এবং সেই সুযোগে চুরুটটাও পড়ে যায় মাটিতে, মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসে একটা বিস্ময়সূচক আওয়াজ! মাটি থেকে চুরুটটা তুলে মুখে লাগিয়ে বলে সে—'কি পাঠাব? হাতী? আপনার বাড়ীতে? ঠিক বুঝলাম না মশাই।'

তার চাউনি দেখে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছিল, সেও জানতে চায়—ভদ্রলোকটির মাথা ঠিক আছে কিনা……খুকীর বাবা তখন সব বুঝিয়ে বলতে থাকেন : তাঁর মেয়ে হ'ল খুকুমণি, তার এক অদ্ভুত অসুখ করেছে—কোনো ডাক্তারই সারাতে পারছে ন', বুঝতেও পারছে না। একমাস হ'ল সে শয্যাশায়ী, দিন-দিনই শুকিয়ে শুকিয়ে সরু হয়ে যাচ্ছে প্যাকাটির মতো। কোনো কিছুতেই তার আগ্রহ বা উৎসাহ নেই! সব সময়েই সে মনমরা—যেন চলেছে সে মরণের পথেই। ডাক্তাররা বলেছেন, ওকে তাজা করে তুলতে হবে,—কিন্তু কোনো কিছুতেই ওর তো আগ্রহ নেই। তাঁরা বলেছেন, ওর সকল ইচ্ছাই পূরণ করতে হবে, কিন্তু কিছুই তো চায় না ও। আজই শুধু বলেছে, একটা জ্যান্ত হাতী দেখতে চায়। তাকে দেখানো কি সম্ভব হবে? জার্মানটির হাতখানা ধরে তিনি মিনতির স্বরে আরো বলতে থাকেন—'তা আশা হয়, মেয়ে আমার হয়তো সেরে উঠবে। কিন্তু মনে করুন……ভগবান না করুন, হঠাৎ তার অসুখ যদি খারাপের দিকে মোড় নেয়……যদি সে মরে যায়!……তা'হলে ভেবে দেখুন, তার শেষ-ইচ্ছাটি পূরণ করিনি ব'লে আজীবন কি মর্মান্তিক কষ্ট সহ্য করতে হবে না?'

সার্কাসওয়ালাটি কপাল কুঁচকে তুলে ভাবতে থাকে, কড়ে আঙুল দিয়ে চুলকাতে থাকে বাম ভুরুটা। শেষ পর্যন্ত বলে সে—'হুঁ…তা, আপনার মেয়ের বয়স কত?'

'ছ' বছর।'

'হুঁ…আমার লীনারই সমবয়সী। হুঁ, এতে কিন্তু আপনার বেশ কিছুটা খরচ পড়বে জানেন তো? হাতীটাকে নিয়ে যেতে হবে রাতে, এবং পরের দিন রাতের আগে ফিরিয়ে আনাও অসম্ভব। দিনে এরকম ব্যাপার করা যাবে না। তা হ'লে লোক লোকারণ্য হয়ে যাবে, সোরগোল পড়ে যাবে……তার মানে একটা দিন নষ্ট হ'চ্ছে, সেই টাকাটা আপনাকে দিতে হবে কিন্তু।'

'তা তো নিশ্চয়ই…ও নিয়ে চিন্তিত হবেন না।'

'তারপরে, একজনের বাড়ীতে হাতী নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারটা পুলিশে অনুমতি দেবে তো?'

'তারা অনুমতি দেয় তেমন ব্যবস্থা করব আমি।'

'আর একটা প্রশ্ন আছে: আপনার বাড়ীর মালিক কি একটা হাতীকে বাড়ীর ভেতরে ঢুকতে দেবে?'

'তা, আমি নিজেই আমার বাড়ীর মালিক।'

'তা বেশ, সে তো আরো ভালো কথা। তবু আর একটা কথা: কোন্ তলায় থাকেন আপনারা?'

'দোতলায়।'

'উহুঁ, সেটি তো ঠিক হচ্ছে না...আপনাদের সিঁড়ি হওয়া চাই খুব চওড়া, দেয়াল উঁচু, ঘরটা প্রকাণ্ড, দরজাটা খুব বড়, আর মেজে পাথরের মতো শক্ত। এসব ঠিক আছে তো? কারণ, আমার 'টমি' সাড়ে-পাঁচ ফুট লম্বা, সাত ফুট উঁচু, আর ওজন হ'ল পুরো চল্লিশ মন!'

খুকীর বাবা ক্ষণকাল ভেবেচিন্তে বলেন, 'তা, আপনিই আমার সঙ্গে এসে দেখে যান একটিবার! দরকার হ'লে দরজাটা ভেঙ্গে আরো বড় করে দেব।'

'বেশ, চলুন!'—সার্কাসের পরিচালক রাজী হয়ে যায়।

॥ ৫ ॥

সেদিন রাতেই সার্কাসের পরিচালক তাদের হাতীটাকে নিয়ে আসে রুগ্ন মেয়েটিকে দেখাবার জন্যে।

হাতী মহারাজ তো বীরের মতো মার্চ করে চলেছেন রাজপথ জুড়ে, শুঁড়টাকে নিয়ে খেলা করতে করতে চলেছেন। বেশ রাত হ'লেও বহু লোকজনই অনুগমন করছে তার। কিন্তু হাতীর সেদিকে ভ্রূক্ষেপও নেই,—প্রত্যেক দিনই তো সার্কাসে সে হাজার হাজার লোক দেখে থাকে। একবার মাত্র সে একটু বেশ রেগেই উঠেছিল। রাস্তার একটা বকাটে ছোঁড়া তার পায়ের কাছে এসে লোকদের হাসাবার জন্যে তাকে ভেঙ্‌চি কাটছিল!

হাতীও অমনি ছোঁড়াটার টুপিটা আস্তে তুলে নিয়ে ফেলে দিল ছুঁড়ে— পাশের দেয়ালের উপর; টুপিটা নির্বিঘ্নেই ঝুলে রইল দেয়ালের একটা শিকের মাথায়!

পুলিশ এসে রাস্তার লোকদের সরিয়ে দিতে চেষ্টা করছিল, তারা বলছিল, —'দেখুন, আপনাদের চলে যেতে অনুরোধ করছি, নতুন-কিছু একটা ব্যাপার হয়নি এখানে। সত্যিই, আপনাদের কাণ্ড-কারখানা দেখে তাজ্জব বনে যাচ্ছি! পথে-ঘাটে কোনো দিন যেন আর হাতী দেখেননি!'

কিন্তু তারা ভিড় করে আসে খুকুদের বাড়ী পর্যন্তই। বাড়ীর সব জানালা-কবাট আগেই খুলে রাখা হয়েছে। সে যেন এক মহোৎসব আর কি!

কিন্তু সিঁড়ি পর্যন্ত এসেই তো হাতী মহাবীর ভয়ে থমকে দাঁড়ান, আর এগোতে চান না।

'আগে ভালো কিছু খেতে দিন, তবে তো!'—জার্মানটি বলে—'পিঠে দিতে পারেন বা অমনি আর কিছু···টমি! এই যে টমি, টূ টূ!'—জিভ দিয়ে কেমন চক্ চক্ শব্দ করে।

খুকুর বাবা বাড়ীর পাশের ময়রার দোকানে ছুটে গিয়ে কিনে আনেন মস্ত বড় একটা মিষ্টি পাউরুটি। হাতীটা বাক্সশুদ্ধই যেন একগ্রাসে গিলে ফেলবে—তাকিয়ে থাকে এমনভাবে। কিন্তু জার্মানটি এক-এক টুকরো ভেঙে দেয় শুধু। ভয়ানক চালাক লোক! রুটিটা হাতে নিয়ে দেখিয়ে দেখিয়ে এক-এক সিঁড়ি করে উপরে ওঠে,—হাতীটাও শুঁড় এগিয়ে দিয়ে কান খাড়া করে এগোতে থাকে—যেন একান্ত অনিচ্ছায়। আবার দেওয়া হয় আর এক টুকরো।

এইভাবেই তাকে নিয়ে আসা হ'ল খাবার হলঘরে। আগেই সেখান থেকে সমস্ত আসবাবপত্র সরিয়ে নেওয়া হয়েছে, বিছিয়ে রাখা হয়েছে খড়ের গাদা। টমির পায়ে শিকল বেঁধে শিকলের গোড়াটা পুঁতে রাখা হ'ল মেজেতে। টমির সামনে এনে রাখা হ'ল টাটকা কতগুলি বাঁধাকপি আর একঝাড় কলাগাছ।

একটা সোফার উপরে টমির পাশেই জার্মানটি এবার শুয়ে পড়ল। বাতি নিভিয়ে শুতে গেল সবাই।

॥ ৬ ॥

পরদিন খুব ভোরেই জেগে উঠল খুকী, প্রথমেই জিজ্ঞেস করল,—'কৈ, আমার হাতী এসেছে?'

'হ্যাঁ, এসেছে, খুকু!'—মা বলেন—'কিন্তু খুকুমণি, সে বলছে কি জানো? বলছে, খুকুকে প্রথমে চান করে একটু দুধ আর ডিম খেয়ে নিতে হবে।'

'খুব ভালো হাতী, না?'

'হ্যাঁ, গরম জামাটা পরে নাও আগে।'

তাড়াতাড়িই খাওয়া হয়ে গেল ডিম, খাওয়া হয়ে গেল দুধ। খুকুকে ছোট্ট ঠেলাগাড়ীতে করে নিয়ে আসা হ'ল খাবার হলঘরে।

খুকু ছবিতে দেখে যা ভেবেছে হাতী যে তার চেয়ে ঢের ঢের বড়। প্রায় দোরের মাথা-সমান উঁচু। প্রকাণ্ড দেহটা জুড়ে আছে হলঘরের আধখানা। তার মোটা চামড়ায় ভাঁজ পড়েছে; পাগুলি এক একটা থামের মতো! লেজটা

তো ঠিক যেন একটা মোটা কাছি, ঠিক মাথাটিতে ঝুলানো যেন একটা ঝাঁটা! মাথার উপরে বড় বড় কুঁজ। কুলোর মতো কান দুটো, ঝুলে পড়েছে নিচে। চোখ দুটো ক্ষুদে বটে,—তবে দেখতে বেশ চোখা ও স্নেহ-কোমল। দাঁত দুটো কেটে ফেলা হয়েছে। শুঁড়টা যদি সে আগাগোড়াই উঁচিয়ে দেয় তো ঠেকে যাবে তালগাছের মাথায়!

খুকী একটুও ভয় পায়নি। প্রাণীটির বিপুল বপু দেখেই সে অবাক! কিন্তু খুকীদের অল্প-বয়সের ঝিটি তো ভরেই আধমরা!

সার্কাস-পরিচালকটি ঠেলাগাড়ীটার কাছে এসে বলল,—'কেমন আছ, খুকী! ভয় পেও না, কেমন? টম্মি খুব ভালো, ছোটদের খু-উ-ব ভালোবাসে।'

খুকী তার ফ্যাকাশে হাতখানি বাড়িয়ে দেয় লোকটির দিকে। খুকী বলে, —'নমস্কার! না, একটুও ভয় হচ্ছে না আমার। এর নাম কি?'

'টম্মি।'

'এই যে টম্মি, গুড্‌মর্নিং—মানে, সুপ্রভাত!' খুকী মাথা নুইয়ে বলে— 'কাল ঘুম হ'ল কেমন?' হাতখানা সে হাতীর দিকে বাড়িয়ে দেয়।

হাতীও সাবধানে তার হাতখানি ধরে শুঁড়ের মাথার নমনীয় আঙুলটি দিয়ে খুকীর আঙুলগুলিতে একটু চাপ দেয় আলগোছে। ডাক্তারবাবুর চেয়ে অনেক আলগোছে। তারপর সে মাথা নেড়ে নেড়ে, চোখ কুঁচকে হাসতে থাকে যেন!

'এ কি সব-কিছু বোঝে?'—খুকী জিজ্ঞেস করে।

'হ্যাঁ খুকী, স—ব বোঝে।'

'হ্যাঁ, শুধু কথা বলতে পারে না।...ঠিক তোমার মতোই একটি মেয়ে আছে আমার। নাম তার লীনা; টম্মি তার বন্ধু, টম্মির সঙ্গে একেবারে গলায় গলায়-ভাব।'

'শোনো টম্মি, এখনো চা খাওনি?'—খুকু জিজ্ঞেস করে। হাতীট শুঁড় বাড়িয়ে দিয়ে খুকীর মুখে ঝেড়ে এক ঝলক গরম নিশ্বাস, আর খুকীর চুল ফুলে ওঠে দুই দিকে।

খুকু নাচে আর হাততালি দেয়। সার্কাসের পরিচালক জার্মানটি হেসে ওঠে হো-হো ক'রে। জার্মানটি নিজেও ভয়ানক মোটা এবং হাতীর মতোই ভালো! খুকুর মনে হয়, দুজনেই দেখতে ঠিক একই রকম। সম্ভবত, এ-ওর আত্মীয়!

'না খুকী। এখনো চা খায়নি। চিনি-জল খেতে চাইছে, চাইছে পাঁউরুটি—পাঁউরুটি খুবি পছন্দ ওর।'

অমনি নিয়ে আসা হ'ল কতকগুলি পাঁউরুটি। খুকী খান-কয়েক তুলে দেয় অতিথিকে। অবাক কাণ্ড! রুটিটা ধরল সে শুঁড়ের মাথার আঙুলটা বাঁকিয়ে দিয়ে,—তারপর শুঁড়টা গোল করে ঘুরিয়ে নিয়ে রুটিটাকে গুঁজে দিল মুখের ভিতর দিকে কোথায় যেন। সেখানেই ঐ যে দেখা যাচ্ছে তিনকোণা লোমশ চোয়াল, শোনা যাচ্ছে রুটি চিবোনোর খস্‌খস্ শব্দ। টমি একে একে রুটি তুলে নেয়—দুটো, তিনটে, চারটে, পাঁচটা! আর, ক্রমশই গভীর তৃপ্তিতে মাথা নাড়াতে থাকে টমি, ক্ষুদে চোখ দুটি কুঁচকে উঠে হয়ে যায় আরো ছোট। খুকীও হাসতে থাকে গভীর খুশিতে!

সব রুটি খাওয়া হয়ে গেলে খুকু তার পুতুলগুলি এনে দেয় হাতীকে।

'দেখো টমি, এই দেখো, কেমন রঙীন পোশাক-পরা পুতুল! এই হচ্ছে সোনা। খুব ভালো মেয়ে, তবে মাঝে মাঝে দুষ্টুমি করে খুবি, কিচ্ছুটি খেতে চায় না। এই হ'ল নীনা—সোনার মেয়ে। এরই মধ্যে পড়াশোনা শুরু করে দিয়েছে,—পড়তে পারে আ, বে, ভে, গে। আর এই হ'ল মেনি-মা—এ ছিল আমার আগেকার পুতুল। দেখছ টমি—নাক নেই এর, মাথাটা ভেঙে গেছে, চুলও পড়ে গেছে! তা ব'লে একটা বুড়ো মেয়েলোককে তো আর ঘর থেকে তাড়িয়ে দিতে পারি না! বলো টমি, পারি? আগে ছিল সে সোনিয়ার মা, এখন হয়েছে রাঁধুনে। টমি এসো, খেলা করি এবার। তুমি হবে বাবা, আমি হব মা; আর এরা সবাই আমাদের ছেলেপিলে। কেমন?'

টমি সম্মতি জানায়, হাসে; একটা পুতুলের গলা ধরে তাকে পুরে দেয় মুখের মধ্যে। তা অবশ্যি, একটুখানি মজা করার জন্যেই। পুতুলটাকে আলগোছে একটু কামড় দিয়ে খুকীর কোলের উপরে রেখে দেয় টমি। পুতুলটা ভিজে যায়, বেঁকে যায় একটুখানি।

খুকু এবার মস্ত বড় একটা ছবির বই এনে টমিকে বুঝিয়ে দিতে থাকে—'এটা হ'ল ঘোড়া, এটা সারস, আর এটা হ'ল গাড়ী······এই দেখো, খাঁচার মধ্যে পাখী রয়েছে একটা! এই একটা কলসী, এই আয়না, এই আলো, এইটা কোদালি, এইটা পাহাড়······আর এই যে—একটা হাতী! এটা কিন্তু তোমার মতো নয় মোটেই, বলো তোমার মতো? হাতী আবার এতটুকু হয় কখনো?'

টমি ভাবে, সত্যিই এত ছোট হাতী নেই কোথাও! এই ছবি তার ভালো লাগে না। সে শুঁড়ের মাথা দিয়ে তাড়াতাড়ি উল্টে দেয় পৃষ্ঠাটা।

দুপুরের খাবার সময় হ'ল—কিন্তু খুকী তার হাতীর কাছ থেকে যাবে না প্রাণ গেলেও। অগত্যা জার্মানটি এসে ব্যবস্থা করে দেয়—'বেশ, আপনারা অনুমতি দিলে আমি ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। দুজনে একসঙ্গেই খেতে পারবে—খুকী আর হাতী।

হাতীকে বসতে আদেশ করলে একান্ত বাধ্য ছেলেটির মতোই সে বসে পড়ল। অমনি থরথর করে কেঁপে উঠল ঘরের মেজে, ঝং-ঝং বেজে উঠল তাকের চীনাবাসন, ঝুর-ঝুর ছাত থেকে খসে পড়ল গুঁড়ি-গুঁড়ি আস্তর—নিচের তলার ভাড়াটেদের মাথায়!

খুকী বসল এসে হাতীটার মুখোমুখী। মাঝখানে টেবিল। হাতীর গলায় বেঁধে দেওয়া হ'ল তোয়ালে। দুই বন্ধুতে ভোজন-পর্ব শুরু হ'ল এবার। খুকী খাচ্ছে মুরগীর ঝোল, হাতী খাচ্ছে নানারকম শাকসব্জী! খুকীর জন্যে এক গ্লাস সরবৎ, হাতীর জন্যে বড় এক গামলা মদ-মেশানো গরম জল। হাতী এই পানীয়টি শুঁড় দিয়ে টেনে নিতে লাগল গভীর আরামে। খুকীর জন্যে এক পেয়ালা কোকো, হাতীর জন্যে বাদাম। এদিকে জার্মানটিও ইতিমধ্যে খুকীর বাবার সঙ্গে বসে ঠিক ঐ হাতীটার মতোই আরামে পেট বোঝাই করে চলেছে।

খাওয়া-দাওয়া হয়ে গেছে। কিছু পরে কয়েকজন ভদ্রলোক এলেন খুকীর বাবার সঙ্গে দেখা করতে। তাঁদের আগেভাগেই সতর্ক করে দেওয়া হ'ল, হল্‌ঘরে হাতী দেখে হঠাৎ যেন তাঁরা আঁৎকে না ওঠেন।

প্রথমে তো তাঁরা বিশ্বাসই করেননি, কিন্তু টমিকে দেখেই তো চোখ চড়ক-গাছ! সভয়ে জড়াজড়ি করে দোরের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়েন আর কি!

'ভয় নেই, ও খুব ভালো!'—খুকী ভরসা দেয়।

কিন্তু ভদ্রলোকেরা তাড়াহুড়ো করে ছুটে আসেন বৈঠকখানায়, এবং কারো অপেক্ষা না করেই সোজা পালিয়ে বাঁচেন!

সন্ধ্যে হ'ল, ক্রমে রাতও এল ঘনিয়ে। খুকীর এবারে শুতে যাওয়া দরকার, কিন্তু কেউই তাকে হাতীর কাছ থেকে সরিয়ে নিতে পারছে না। খুকী অবশ্যি কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘুমে এলিয়ে পড়ল হাতীর পাশেই! তারপর তাকে নিয়ে যাওয়া হ'ল শোবার ঘরে। জামাজুতো খোলার সময়ও জাগল না খুকী।

সেদিন রাতে খুকু স্বপ্ন দেখল : টমিকে সে খেতে দিচ্ছে বড় বড় রুটি। টমি তাকে শুঁড়ে তুলে দোল দিচ্ছে, আদর করছে !···আর, এদিকে হাতীকে নিয়ে যাওয়া হ'ল তার পশুশালায়, এবং সেও রাতে স্বপ্ন দেখল একটি ফুটফুটে মেয়েকে ! আর দেখল, তাকে খেতে দেওয়া হয়েছে একটা মস্ত বড় রুটির পাহাড়, আর জালার মতো বড় বড় আখরোট···

পরদিন ভোরে খুকী ঘুম থেকে জেগে উঠল সুস্থ সবল, এবং বহুদিনকার আগের মতোই চেঁচিয়ে বলতে লাগল,—'দুধ, দুধ, দুধ আনো আমার !' খুকীর সেই চীৎকারে বেজে ওঠে ঘরবাড়ী।

'আমার দুধ !'

আচমকা সেই চীৎকার শুনে খুকীর মা ঘুম থেকে জেগে ওঠে, শঙ্কা-ভরে ভগবানের নাম নেয়। কিন্তু, খুকীর এবারে মনে পড়েছে কালকের কথা। সে জিজ্ঞেস করে—'আমার হাতী ?'

বাবা-মা দুজনেই এসে তাকে বুঝিয়ে বলেন,—হাতী নেহাৎ ঠেকায় পড়েই হঠাৎ তার বাড়ী চলে গেছে, তার কাচ্চাবাচ্চাদেরও তো একা একা ফেলে রাখা যায় না ! সে অবশ্যি খুকীর কাছে একটা চিঠি লিখে রেখে গেছে : শিগগিরি সেরে উঠে খুকু যেন অবশ্যি অবশ্যি তাকে দেখতে যায়।

খুকী দুষ্টুর মতোই হেসে ওঠে—'টমিকে বলো গে, ভালো হয়ে উঠেছি আমি —আমার অসুখ সেরে গেছে।'

## ॥ এবার তাহ'লে নাচো ॥

সে সময়ে আমরা ছিলাম রিয়াজন এলাকায়, কাছাকাছি রেলস্টেশন থেকে প্রায় শ'খানেক মাইল দূরে,—এমন কি বৃহৎ ব্যবসায়-কেন্দ্র টুমা থেকেও আটাশ মাইল। 'টুমা হ'ল লোহা, আর টুমার লোক পাষাণ !'—স্থানীয় অধিবাসীরা নিজেদের কথায়ই বলে এমনটা। আমরা প'ড়ো একটা প্রাচীন জমিদার বাড়ীতে ছিলাম। আঠোরশ বারো'তে সেখানে তৈরী হয়েছিল কাঠের একটা মস্ত বড় বাড়ী—ফরাসী বন্দীদের জন্যে। বাড়ীটায় আছে অনেকগুলি থাম, চারপাশে একটা বাগান লাইমগাছে ভরা, দেখে ভার্সেলিসের বন্দীদের কথা মনে জাগে।

আমাদের অবস্থাটি ভাবুন একবার। আমাদের জন্যে রয়েছে বিশটা কোঠা, কিন্তু একটিতেই মাত্র ঘর গরম-রাখার জন্যে স্টোভ আছে একটা, এবং যা হ'ক একটু গরম। অবশ্যি সে ঘরেও এত হিম যে খুব ভোরে জল জমাট বেঁধে থাকে —তুষারের পলেস্তারা। সপ্তাহে (তাও অবশ্যি ভাগ্য ভালো হ'লে) একবার মাত্র ডাক আসে—কখনো বা দুমাসে একবার, এবং তাও হঠাৎ এদিকে আগত কোনো কিষাণের মারফৎ। সাধারণত সে হবে বুড়ো, জন্তুর চামড়ার মতো তুষার-ঢাকা তার কোটটার নিচে থাকবে একটা বাণ্ডিল,—ভিজে ভিজে চুপসে গেছে; ঠিকানাগুলির পিঠে ডাকঘরের ছাপ মারা নেই, এবং উৎসুক পোস্ট-মাস্টারদের হাতে কোনো কোনোটা খুলে দেখে আবার আটকানো। আমাদের চারদিকে প্রাচীন বন,—শিকারের খোঁজে ঘোরে ফেরে ভালুক। এমন কি, দিনের আলোতেও ক্ষুধার্ত নেকড়েগুলো ঝাঁপিয়ে পড়ে,—এখান সেখান থেকে আর পাশের রাস্তা থেকে ধ'রে ধ'রে নিয়ে যায় ঘুমন্ত কুকুরগুলোকে—এমন কি দিনদুপুরে পর্যন্ত! স্থানীয় লোকজন যে ভাষায় কথা বলে তার কিচ্ছুই বোঝা যায় না—কখনো গানের মতো টেনে টেনে, কখনো আবার হঠাৎ-কাশির মতো খ্যাক্ খ্যাক্ শব্দ ক'রে; অপ্রসন্ন চোখে তারা আমাদের দিকে তাকিয়ে থাকে অপলক। তাদের নিশ্চিত ধারণা এই বন একমাত্র ভগবানের আর কিষাণ-সরদারের। আর এদিকে কেবল জার্মান দেওয়ানই জানে কত কাঠই যে তারা বন থেকে চুরি করে হরদম। অষ্টাদশ শতকের একটা গ্রন্থাগার আছে, বইগুলি ঝকঝকে বাঁধানো, তবে প্রায়টাই শেষ হয়ে এসেছে উই-ইঁদুরের সৎকাজে। প্রাচীন দিনে একটা চিত্র-প্রদর্শনী ছিল; এখন ছবির ক্যানভাসগুলি নষ্ট হ'য়ে গেছে স্যাঁতসেঁতে ঠাণ্ডায়, আর স্যাঁতলা পড়া ধুলোয় আর ধোঁয়ায়!

একবার ভাবুন: পাশের গাঁ তুষারে ডুবে গেছে, আর সেই অসম্ভব রকম 'গেঁয়োভূত' সিরেজা সাংঘাতিক হিমের মধ্যেও ঘুরে বেড়াচ্ছে প্রায় ন্যাংটা অবস্থায়! পাদ্রীটি উৎসবের আগে উপোষের দিনে ভুলেও তাস ছোঁন না, তবে ব'সে ব'সে স্তারোস্তাকে উপদেশ ঝাড়েন। লোকটা শয়তান, দলবাজ—'ভিক্ষে ক'রে ফেরে। পিটার্সবুর্গের শহুরে কায়দায় তার বিশুদ্ধ সেই গেঁয়ো-ভাষার উচ্চারণ শোনায় কী ভয়ানক!—এই সবকিছুর মধ্যে গিয়ে যদি পড়েন তো বুঝবেন, আমাদের সে কী বিশ্রী একঘেয়ে দশা! ঘের দিয়ে ভালুক-শিকার, খরগোস-ধরা, তিন-তিনটা ঘরের মধ্য দিয়ে পঁচিশ-পা দূরে গুলি ছোঁড়ার খেয়াল, সন্ধ্যেবেলা ব'সে ব'সে রঙ্গ-রসের কবিতা মেলানো—ক্লান্তি ধ'রে গেছে এই সব

কিছুতেই। অবশ্যি ঝগড়াও করতাম আমরা।

হ্যাঁ, আপনারা এক-একজনকে ব্যক্তিগতভাবেই যদি জিজ্ঞেস করতেন—কেন তবে আমরা এখানে এলাম, তবে আমার তো মনে হয়—আমাদের কেউই এ কথার জবাব দিতে পারতাম না। সে সময় আমি ছবি আঁকছি, আলেকজান্দ্র লিখছে রূপক-কবিতা, এবং ভাস্কা মশগুল সুরকার ওয়াগ্নার নিয়ে, মাঝে মাঝে দাবাও খেলছে; আর ইজিয়ু লেগে পড়েছে জীর্ণ ও পুরাণো পিয়ানোটা নিয়ে।

কিন্তু খ্রীষ্টমাস-পর্বের কালে সমস্ত গ্রামই জেগে উঠল এক নতুন চেতনায়। চারপাশের সব বন-সাফাই গাঁয়ে গাঁয়ে কিষাণেরা মদ বানাতে থাকে, সেই মদ এত ঘন যে হাতে মুখে একটু ছোঁয়ামাত্রই দাগ লেগে থাকবে আঠার মতো! আর, কিষাণদের মধ্যে সে কী মদের মহোৎসব, এমন কি পর্বের আগের দিন পর্যন্ত! দাগিলেভাত্ গাঁয়ে তো একটি ছেলে তার বাপের মাথাই দিল ফাটিয়ে, আর এক গাঁয়ে এক বুড়ো মদ খেয়ে খেয়ে ম'রে গেল মদের উপরেই!

কিন্তু আমাদের পক্ষে খ্রীষ্টমাস সত্যিই একটা বৈচিত্র্য। জানাশোনা স্থানীয় সব অফিসার ও কিষাণদের সঙ্গে দেখা করে জানাতে লাগলাম আনন্দ-সম্ভাষণ। প্রথমেই পাদ্রীর কাছে। তারপর গির্জার স্তুতি-গায়ক, তারপরে গির্জার দারোয়ান। তারপরে গেলাম দুজন স্কুল-শিক্ষয়িত্রীর কাছে। শিক্ষয়িত্রীদের থেকে শুরু করে জমে উঠতে লাগল ক্রমেই। ডাক্তারদের ওখানে উঠলাম গিয়ে, তারপর জিলার সরকারী কেরানীবাবুর বাড়ীতে—সেখানে আমাদের প্রতীক্ষায় আছে বিরাট এক ভোজ! তারপর চৌকিদার, ওষুধের কারবারী ও স্থানীয় কিষাণ-সরদার। সরদারটি টাকা করেছে অনেক, অনেক কিষাণকেই মুঠোয় এনেছে; আশেপাশের কাপড়, দড়ি, ফসল, কাঠ—সবই তার দখলে। তারপরে গেলাম আরো কত জায়গায়।

অবশ্যি এটা স্বীকার করতে হয়, প্রায়ই আমাদের ঠেকত কেমন বেখাপ্পা। স্থানীয় জীবন-ধারার সঙ্গে কিছুতেই যেন আমরা মেলাতে পারিনি। সত্যিই, আমরা তার বাইরেই থেকে গেছি। এখানকার জীবনস্রোত যে থেমে গেছে শ্যাওলা প'ড়ে প'ড়ে!

আমাদের প্রীতিকর আলাপ-ব্যবহার ও সহজ চালচলন সত্ত্বেও এটা ঠিকই যে আমরা আর-এক জগতের লোক। তা ছাড়া, দু'পক্ষ থেকেই মূল্যবোধের একটা বৈষম্যও আমাদের মাঝখানে খাড়া হ'য়ে আছে প্রাচীরের মতো: আমরা

দেখছি তাদের অণুবীক্ষণের মধ্য দিয়ে, তারা দেখছে আমাদের দূরবীক্ষণে। আমরা অবশ্যি খাপ খাইয়ে নিতে চেষ্টা করেছি খুবি। একটি কিষাণ-মেয়েছেলে একদিন সন্ধ্যাবেলা গান করছিল, সেদিন আমরাও ঠিক করলাম—তখন যা করা উচিত। সে যেন লজ্জা পেয়ে গেল; চোখ নত ক'রে হাত দুটি বুকের উপর ভাঁজ করে সে গাইছিল—

'আন্দ্রে নিকোলেভিচ্!
এসেছি তোমার কাছে
তোমাকে জ্বালাব ব'লে;
এসেছি চাতুরী ক'রে,
নাও টেনে আরো কাছে—
যারে তুমি ভালোবাসো।'

আর, তখন আমরা সবাই তার ঠিক ওষ্ঠেই চুমো খাবার জন্যে উঠে পড়ে লাগতাম—তার ছল-দেখানো 'উঃ, না!' না-মেনে চুমোই খেতাম। তারপর সবাই মিলে একটা বৃত্তের মতোই তার চারপাশে ঘিরে দাঁড়াতাম। একদিন হ'ল কি, অনেকেই একত্র হলাম আমরা; এক গির্জা-কলেজের চারটি ছেলেও এসেছে ছুটিতে। স্তুতি-গায়ক, কাছের জমিদারের একজন সরকার, দুজন শিক্ষয়িত্রী, দপ্তরীয় পোশাক-পরা এক পুলিশ, স্থানীয় ঘোড়ার ডাক্তার,—আর সেই সঙ্গে আমরা তিনজন সুকুমার-শিল্পী বা সৌন্দর্যের পূজারী। আমরা ঘূর্ণিনাচে মত্ত—গাইছিলাম, হাসছিলাম এদিক ওদিক ঘুরে-ফিরে। আমাদের দলের নেতা ছিল একজন ছাত্র। মাঝখানে দাঁড়িয়ে সে আমাদের নাচের নির্দেশ দিচ্ছিল, এবং নিজেও সোৎসাহে নেচে নেচে দেখাচ্ছিল। নিজের মাথার তালুতে আঙুল বাজিয়ে বাজিয়ে তার সে কী গান:

'রাণী ছিল এক শহর চূড়ায়,—
সেই ছিল এক রাণী;
আর যুবরাজ, ছোট যুবরাজ
নিয়ে গেল তারে টানি'!
পেল যে খুঁজে সে রাজকন্যারে
মনের মতন মেয়ে,
সারা গায়ে তার ঝরে পড়ে রূপ—
ঝরে পড়ে রূপখানি!

সেই যুবরাজ আঙ্গুলে তার
আঙ্‌টি পরাল আনি'।

কিছুকাল পরে নাচের এই চঞ্চল দোলা থামলে আমরা জোড়ায় জোড়ায় একে অন্যের কাছে নিচু পর্দায় গাইতে লাগলাম :

'সিংদরজাটা আগাগোড়া খোলা, রাজা
রাণীর সামনে হ'ল মাথা-নত ;
রাণীও রাজার কাছে অবনত—
মাথা যে নোয়াল রাণীই অনেক বেশী !'

এবং তখনি ঘোড়ার ডাক্তার ও স্তুতি-গায়কের মধ্যে প্রতিযোগিতা লেগে যেত, কে কার কাছে কত বেশী মাথা নোয়াতে পারে।

* * *

আমাদের চিন্‌-পরিচয় চলতে লাগল পুরোদমে এবং সবশেষে তা ইস্কুলে এসে থামল। কেবলমাত্র আমাদের—পিটার্সবুর্গের এই সম্মানিত অতিথিদেরকে অভ্যর্থনার জন্যেই তারা একটা প্রীতি-সম্মেলন আহ্বান করছে এবং ছোটরা মিলে তার মহড়া দিয়ে চলেছে পুরো একমাস ধ'রেই। সাদরেই অভ্যর্থিত হলাম আমরা। খ্রীস্টমাস পর্বের জন্যে একটা গাছকে সাজানো হয়েছে নানা রঙের আলো দিয়ে। বিষয়-সূচীটা সভায় ঢোকার আগেই মুখস্থ হ'য়ে গেছে বহুবার শুনে শুনে, কিন্তু সমস্তটাই শেষ হ'ল বড়ো হতাশভাবে। ছয় বছরের একটি ছেলে, কুকুরের চামড়ার বড়ো একটি টুপি পরেছে মাথায়, তার বাবার দস্তানাটা এসে গেছে কনুই পর্যন্ত! স্বীকার করতেই হবে, এই ছেলেটির অভিনয়টি লেগেছিল চমৎকার! তার গম্ভীর মুখ, ভাঙা-ভাঙা মোটা-গলা—সেই ছোট্ট ছেলেটি সত্যিকার এক শিল্পী বটে—জন্ম থেকেই শিল্পী!

বাকী সব বিশ্রী বিরক্তিকর। তা ছাড়া, সমস্ত কিছুতেই শস্তা ও সজাগ ধরণে কৃত্রিম জনপ্রিয়তার প্রচেষ্টা!

প্রীতি-সম্মেলনে সাধারণত যা-কিছু বিষয়-সূচী থাকে—অনেকদিন থেকেই আমার তা জানাশোনা : ছোট রাশিয়ার গান—অসম্ভব রকম ভুলে-ভরা উচ্চারণ; কবিতা; বাজে যত সব শিল্প-কাজের নমুনা; এখানে একটা 'খ্রীস্টমাস' গাছ, একটা ঘোড়া, ওখানে কিছু খাবার। মাস্টার মশাইটি বেঁটে এক ভদ্রলোক,—এবার তিনি লম্বা এক ফ্রককোট ও কলার-খাড়া একটা শার্ট গায় দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন ও বেহালাটা বাজাতে লাগলেন—লাফঝাঁপ মেরে,

মাঝে মাঝে ছড় দিয়ে তাল ঠুকছিলেন একটা ছেলের মাথার উপরেই!

স্কুলের পৃষ্ঠপোষক হলেন কাছের শহরের একজন উচ্চপদস্থ ব্যক্তি, সমস্ত সময়টাই বসে বসে তিনি সারামুখে শুধু আত্মপ্রসাদ আস্বাদ করছিলেন এবং জিভ দিয়ে ওষ্ঠ চাটছিলেন একান্ত খুশিতে। প্রদর্শনীটা যেন তাঁকেই সম্মান দেখাবার জন্যে!

সবশেষে মাস্টার মশাইটি এবারে এলেন সবচেয়ে দরকারী বিষয়-সূচীতে। এ পর্যন্ত আমরা হেসেছি খুবি, এবার কাঁদার পালা। এগিয়ে এল বারো কি তেরো বছরের ছোট্ট একটি মেয়ে। পাহারাওয়ালার মেয়ে, মুখখানি কিন্তু মোটেই তার বাবার ঘোড়া-মার্কা মুখের মতো নয়। স্কুলের সর্বোচ্চ শ্রেণীর ছাত্রী সে। এবার সে শুরু করল তার ছোট্ট গানটি—

'গঙ্গাফড়িং ছুটোছুটি ক'রে
গ্রীষ্ম কাটাল গানের ঘরে,
একটি বারও তো ভাবেনি কেমনে
থাকবে শীতের ঝড়ে।

তখন ঝাঁকড়া-চুলো সাত বছরের একটি মোটাসোটা ছেলে উঠে দাঁড়াল, তার বাবার টুপি ও মস্তো দস্তানা পরে পাহারাওয়ালার মেয়েকে ডেকে বলল সে—

'সে কী কথা ভাই,
গ্রীষ্মে করেছ কি?'
'করবার কিবা আছে;
সারাক্ষণ গান গাই!'

আমাদের রাশিয়ার চিরস্মরণীয় কর্তব্যবোধটা গেল কোথায়? 'গ্রীষ্মে করেছ কি?'—এই প্রশ্নের উত্তরে গঙ্গাফড়িং শুধু বলতে পারল,—'সারাক্ষণ গান গাই!'

এই উত্তর শুনেই মাস্টার মশাই যুগপৎ তাঁর ছড়ি ও বেহালা নিয়ে দুলতে লাগলেন; শুরু করার এই ইঙ্গিতটা সবাইকেই আজ সন্ধ্যার অনেক আগেই শিখিয়ে রেখেছেন। তখনি রহস্যের মতো চাপা গলায় সকলেই যোগ দিল গানে—

'তোমার গান যে গেয়ে গেছ তুমি,
তাকে তুমি কাজ বলো!

সারাটি গ্রীষ্ম গান গেয়ে গেছ,
সমস্ত শীত নাচো!
তোমার গান তো গেয়ে গেছ তুমি,
ফিরে শীত ভ'রে নাচো।
সমস্ত শীত নেচে চলো ভাই,
সমস্ত শীত নাচো।
তোমার গান তো গেয়ে গেছ তুমি,
এবার তা হ'লে নাচো!'

আমি স্বীকার করছি, সব শুনে আমার মাথার চুল পর্যন্ত খাড়া হয়ে উঠল! তখন আমার মনে হ'ল, এই স্কুলবাড়ী-ভর্তি প্রত্যেকটি শিশু ও কিষাণই আমার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থেকে আবৃত্তি করে যাচ্ছে সেই 'তো—থেকে—চো' পর্যন্ত :

'তোমার গান তো গেয়ে গেছ তুমি,
তাকে তুমি কাজ বলো?
তোমার গান যে গেয়ে গেছ তুমি,
এবার তাহ'লে নাচো!'

বলতে পারব না, দুষ্ট গ্রহের মতো এই গুন-গুনানি এবং ভয়ানক অস্বস্তিকর এই আবৃত্তি চলছিল কতক্ষণ পর্যন্ত। তবে স্পষ্ট মনে আছে আমার —ঐ সময়ে একটা ভয়ানক চিন্তা আলোড়িত হয়ে উঠল আমার মাথার মধ্যে। ভাবছিলাম—'এই তো, এখানে ব'সে আমরা—বুদ্ধিজীবীর দল; এবং আমাদের সামনাসামনি অগণিত অসংখ্য এই কিষাণ-মজুর—দুনিয়ার সবার চেয়ে শ্রেষ্ঠ এবং স্বদেশের সবার চেয়ে অবনমিত অপমানিত বিরাট জন-সমুদ্র! আমাদের সঙ্গে এদের কী যোগ-সূত্র? কিছুই নয়। ভাষা নয়, ধর্মবোধ নয়, নয় শ্রম, নয় রুচিবোধ। এদের কানে আমাদের কল-কবিতা শোনাবে হাস্যকর, অদ্ভুত, অর্থহীন! আমাদের সূক্ষ্ম রুচি-মার্জিত চিত্র-কলা— তাদের চোখে ঠেকবে অর্থহীন রঙের পিণ্ডমাত্র। দেবতার জন্যে আমাদের সন্ধান ও সাধনা, এমন কি আমাদের দেবতা-সৃষ্টির অহঙ্কার তাদের কাছে বোকামি; আমাদের সঙ্গীত শুধুমাত্র বিশ্রী কী এক গণ্ডগোল! আমাদের বিস্ময়কর বিজ্ঞান তাদের তৃপ্তি দিতে পারবে না, আমাদের জটিল কর্মজীবন তাদের কাছে হাস্যকর এবং করুণ! ভক্ত-মানৎকারীদের মতো ধৈর্যশীল ক্ষেত-

খামারের যত হাজার-হাজার লক্ষ-লক্ষ মজুরের দল! শেষ-বিচারের ভয়ঙ্কর দিনটিতে এই শিশুটির কাছে—এই মূর্খ জীব, বিজ্ঞ মানুষ—এই সব মিলে সৃষ্টির এই কোটি-শির মহা-দেবতার কাছে আমরা কী জবাব দেব? শুধু দুঃখ করে এইটুকুই মাত্র বলতে সক্ষম হব—'করবার কী-বা আছে, সারাক্ষণ গান গাই!'

আর তখন সেও কুটিল এক কিষাণের মতোই বাঁকা হেসে উত্তর দেবে—'যাও, তবে যাও,—এবার তা'হলে নাচো!'

আমি জানি, আমার বন্ধুদের মধ্যেও তখন ঠিক এই একই অনুভূতি। প্রীতি-সম্মেলন শেষ হ'লে আমরা নীরবে চলে এলাম বাইরে, কোনো মতামত পর্যন্ত প্রকাশ করলাম না।

তিনদিন পরে বিদায় নিলাম এবং তখন থেকে আমরা আমাদের কাছেও যেন কঠিন হয়ে গেলাম। হঠাৎ আমাদের বিবেকের মধ্যটা যেন নির্মম-হিম হয়ে গেছে, আমাদের ঢেকে দিয়েছে লজ্জায় অপমানে। ওইসব ঝিমুঝিমু শিশুদের সরল মুখ থেকেই আমাদের উপর যেন নেমে এসেছে অপমৃত্যুর আদেশ। এবং আমি যখন রেলে চেপে কারুলভ্ থেকে গরেলি, গরেলি থেকে কসলভ, কসলভ থেকে জিস্তাব্রভ্ এবং আরো অনেক স্টেশন এগিয়ে যাচ্ছিলাম—সব সময়েই আমার পিছুপিছু ছুটে আসছিল সেই বিদ্রূপ-তীক্ষ্ণ নিষ্ঠুর কথাটা—'এবার তাহলে নাচো!'

...সমস্ত রাত ধরে চলেছি গন্তব্য স্টেশনের মুখে। বার্চগাছের তুষার-ঢাকা শাখার ফাঁকে ফাঁকে তারাদের ঝিকিমিকি,—স্রষ্টা-শিল্পী ঈশ্বর যেন নিজ হাতেই সাজিয়ে রেখেছেন গাছগুলিকে। বারবার ভাবছিলাম, 'বাঃ, কী সুন্দর!'

কিন্তু সেই বিদ্রূপ-তীক্ষ্ণ কথাটা আমাকে ধাওয়া করছে তখনো—

'এবার তা'হলে নাচো!'

Click Here For
More Books>